বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী: ১৯৫২-৭১

শান্তা পত্রনবীশ

সহকারী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৮৬, ২০১৪-১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীঃ ১৯৫২-৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধীন এম.ফিল.
ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর ২০২০

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আশা ইসলাম নাঈম
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষক
শান্তা পত্রনবীশ
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৮৬, ২০১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, শান্তা পত্রনবীশ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম.ফিল. গবেষক। তার গবেষণার শিরোনাম 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীঃ ১৯৫২-৭১'। রচিত ও উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে এটি একটি মৌলিক গবেষণা এবং গবেষক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন।

তার অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে মুদ্রণ বা ডিগ্রির জন্য তিনি উপস্থাপন করেননি।

(ড. আশা ইসলাম নাঈম)
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

‘বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী: ১৯৫২-৭১’ শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব রচনা। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সাময়িকীতে ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি।

শান্তা পত্রনবীশ
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৮৬, ২০১৪-১৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে 'Gender and History' কোর্স পড়ার সময় থেকেই নারীর ইতিহাস চর্চা বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইতিহাস বিভাগে এই কোর্সটির প্রচলন করেছিলেন বাংলাদেশে নারীর ইতিহাস চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন। তিনি এবং অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম এই কোর্সটি আমাদেরকে পড়িয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন মন্তব্য আমাকে নারীর ইতিহাস চর্চায় দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। তাদের উৎসাহ এবং আমার আগ্রহ থেকেই নারীর ইতিহাসকে উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে ইতোমধ্যে কিছু গবেষণা ও লেখালেখি হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অবদান নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। এজন্য বর্তমান গবেষণায় ১৯৫২-১৯৭১ কালপর্বে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মের প্রতিটি পর্যায়ে যার উপদেশ, উৎসাহ ও নির্দেশনা আমার সহায় হয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম। তিনি সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণায় আমাকে উদ্বুদ্ধ ও ঋদ্ধ করেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও গবেষণার সার্বিক বিষয়ে তিনি আমাকে একান্তভাবে সহায়তা করেছেন এবং অভিসন্দর্ভের অধ্যায়গুলো যত্ন সহকারে পড়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার প্রতি তার আস্থা আমাকে স্বাধীনভাবে অভিসন্দর্ভ রচনায় সাহায্য করেছে। তার এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণাকর্মকে সফল রূপ দিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আমি অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে সহযোগিতা পেয়েছি, প্রাণিত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং গবেষণার খোঁজখবর নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি বিশেষভাবে ঋণী প্রিয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মৃত্তিকা সহিতার প্রতি। বিভিন্ন পর্যায়ে তার অভিমত ও নির্দেশনা গবেষণা কর্ম সম্পাদনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। গবেষণা সম্পাদনে বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের উৎসের সন্ধান দিয়ে এবং নিজের সংগৃহীত গ্রন্থ দিয়ে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া গবেষণার প্রয়োজনে যে কোনো সময় তার সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করার সুযোগ প্রদান করে তিনি আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সর্বক্ষণ তাগিদ এবং পরামর্শ দিয়েছেন আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শহিদুল হাসান। তার কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মটি যাদের সহযোগিতা না থাকলে কঠিন হতো তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন লেখক ও গবেষক মামুন সিদ্দিকী। তিনি বিভিন্ন দুর্লভ বই সরবরাহ করে, অনেক মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। অভিসন্দর্ভটির প্রুফ দেখার ক্ষেত্রেও রয়েছে তার অবদান। তার এই উদারতায় আমি একই সাথে মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনে পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি অগ্রজপ্রতিম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহম্মেদ শরীফ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত এর নিকট থেকে। আমি তাদের কাছে গভীরভাবে ঋণী ।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে বিরামহীনভাবে তাগিদ দেয়ার কাজটি নিষ্ঠার সাথে করেছেন দাদা প্রশান্ত পত্রনবীশ এবং বৌদি নীলা দে।

গবেষণার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ভাষা শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি যাদুঘর ও সংগ্রহশালা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গ্রন্থাগার। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই অভিসন্দর্ভ রচনার অন্যতম উৎস সাক্ষাৎকার। যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

এম.ফিল. ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে মো. মাসুদুর রহমান, মো. ফয়সাল আখতার, চন্দন কুমার বিশ্বাস, শৈশব দে-কে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করার মতো কঠিন কাজটি হাসিমুখে সম্পাদন করে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মো. সাইফুল হাসান শামীম। তাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে এই গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপের সহযাত্রী- আমার বন্ধু, জীবনসঙ্গী, সহকর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিঠুন সাহার কথা। তিনি আমাকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা বিষয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করেছেন। তার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। সংসারের যাবতীয় কাজে তার সহযোগিতা আমার গবেষণায় আরও বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উর্ধ্বে। তবে আমি বিশ্বাস করি আমার যে কোনো অর্জন তার জন্য সর্বদাই গর্বের ব্যাপার।

সর্বোপরি ‘বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীঃ ১৯৫২-৭১’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি যদি নারীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সামান্যতম অবদান রাখে এবং শিক্ষার্থী, গবেষক ও পাঠকদের জ্ঞান আহরণে সহায়ক হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

শান্তা পত্রনবীশ
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী: ১৯৫২-৭১

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	১-১০
ভূমিকা	১১-২৬
প্রথম অধ্যায় সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক কাঠামো	২৭-৪২
দ্বিতীয় অধ্যায় ভাষা আন্দোলনে নারী	৪৩-৯২
তৃতীয় অধ্যায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা	৯৩-১৪৫
চতুর্থ অধ্যায় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নারী	১৪৬-১৬৪
পঞ্চম অধ্যায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাংগঠনিক বিকাশে নারী	১৬৫-২১২
ষষ্ঠ অধ্যায় জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে নারী	২১৩-২৪০
উপসংহার	২৪১-২৫২
পরিশিষ্ট	২৫৩-২৮০
গ্রন্থপঞ্জি	২৮১-৩১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

এই অভিসন্দর্ভের আলোচ্য কালপর্বে (১৯৫২-১৯৭১) বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভৌগোলিক অঞ্চলটি আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তাতে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় চারটি প্রদেশকে (পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান) বিলুপ্ত করে পশ্চিম পাকিস্তান নামে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং দাপ্তরিকভাবে পূর্বাঞ্চলীয় খণ্ডটির নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিভাগপূর্ব কাল থেকেই এটি পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাঙলা (ইংরেজিতে East Bengal) নামে অধিক পরিচিত ছিল।[১] এমনকি ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরেও প্রায় এক দশক সরকারি কাগজপত্রে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামকরণে এই প্রদেশটি সাধারণভাবে পূর্ব বাঙলা হিসেবেই উল্লিখিত হয়েছে।[২] যদিও পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তান নামটিরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তবে বর্তমান গবেষণায় 'বাংলাদেশ' শব্দটিকে আলোচ্য কালপর্বের (১৯৫২-১৯৭১) জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাভাষী প্রদেশ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি একই অঞ্চল বোঝাতে 'পূর্ব বাংলা' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটিও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত বর্তমান গবেষণাটি বিস্তৃত। একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বিধায় সেই তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিয়েই বর্তমান গবেষণায় আলোচ্য কালপর্বের (১৯৫২-৭১) জন্য 'বাংলাদেশ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই পূর্ব বাংলা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। ক্রমান্বয়ে পূর্ব বাংলার ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ১৯৫২ সালের আন্দোলনের সময় আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলন থেকে সূচিত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ধাপে ধাপে সংস্কৃতি চেতনার যে বিস্তার ঘটেছিল, সে চেতনাই এ ভূখণ্ডের মানুষকে পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্ত করে তোলে। সেই মোহমুক্তি থেকেই ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বের বদলে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎসারণ ঘটে।[৩] প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের নিরলস প্রয়াসে যে প্রগতিশীল সংস্কৃতি চেতনার জন্ম হয় তাই ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধের পাটাতন নির্মাণে সহায়ক শক্তি হয়েছিল। তাই বলা যায় মুক্তিযুদ্ধকে আপাতদৃষ্টিতে একটি রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনা বলে মনে হলেও এর আদি উৎস মূলত সাংস্কৃতিক।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন দুটো পরস্পর সম্পৃক্ত। ১৯৫২-১৯৭১ কালপর্বে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানি শাসনকালে জাতিগত নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির জাগরণের যে দিন এসেছিল তার মূলে ছিল সংস্কৃতি সচেতনতা। পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, অন্তিমে একে অন্যকে প্রেরণা যুগিয়েছে। যে কারণে একটা সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ ছিল না। আর যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যখন সাংস্কৃতিক আন্দোলন যুক্ত হয় তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তি জোরালো হয় এবং আন্দোলন সফল পরিণতির দিকে যায়। এ প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠা আন্দোলনসমূহের কথা উল্লেখ করা যায়। তাই বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে সাংস্কৃতিক আন্দোলন খুব গুরুত্ব বহন করে।

পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগণিত নারীও যুক্ত ছিলেন। তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথিতযশা বরেণ্য শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অনেকেই এখনও পর্যন্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জনরুচি গড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। ছায়ানট, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, তুলি-কলম-কণ্ঠ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনে কর্মরত নারী লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, অভিনেতা, কথক, আবৃত্তিকারদের কর্মকাণ্ড একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্মাণে অবদান রেখেও নারী ইতিহাসে, সাহিত্যে, স্বীকৃতিতে অদৃশ্য রয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর বিচিত্র অবদানকে দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসার প্রয়াস পেয়েছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সত্য উপলব্ধি করেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনাপর্ব ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপাদান, গতি প্রকৃতি এবং বিশেষ করে এই সকল কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা এবং অবদান সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক গবেষণা করাই এই অভিসন্দর্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া এই গবেষণার অন্যান্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে :

ক. ভাষা আন্দোলনে নারীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিরূপণ করা।

খ. সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্রমবিকাশে নারীর অবদান চিহ্নিত করা।

গ. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা।

ঘ. নারীর রচিত সাহিত্য কীভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে ভূমিকা পালন করেছিল তার বিশ্লেষণ করা।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্কোয়াডে কর্মরত নারী লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, অভিনেতা, কথক, আবৃত্তিকারদের কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

চ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদানকে দৃষ্টিগোচর করা।

ছ. নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা।

গবেষণার পরিধি

গবেষণার বিষয়বস্তু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী, কিন্তু দেখা যায় সেই সময় দেশের রাজধানী হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মূলত ঢাকা। তবে ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলনগুলোও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকার বাইরে যে সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে ছিল প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ (চট্টগ্রাম), প্রগতি মজলিশ (কুমিল্লা), সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় (খুলনা), করতোয়া শিল্পী গোষ্ঠী (বগুড়া)। তবে ঢাকাকে কেন্দ্র করেই মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটেছে। তাই ঢাকাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো বিচার বিশ্লেষণ করা এবং এই সকল আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকাকে গবেষণার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

বর্তমান গবেষণায় ১৯৫২-১৯৭১ কালপর্বে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ দুটি সালই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সাল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল যা ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম একটি প্রতীক শহিদ মিনার। তাছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' এই অমর গানটি আমাদের সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনসহ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েই একুশে ফেব্রুয়ারি এবং এই বিশেষ গানটি জনমনে চেতনার সঞ্চার করেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি অধ্যায়ের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে এবং 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা

পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে ইতোমধ্যে কিছু গবেষণা ও লেখালেখি হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অবদান নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কোনো কোনো লেখক তাদের গ্রন্থের কোনো একটি অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে নারীর সাংস্কৃতিক অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করলেও, সেখান থেকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অবদানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া অসম্ভব।

সাঈদ উর রহমানের *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩) গ্রন্থটিকে সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ বলা হয়। এ বইটিতে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও সংগঠনগুলোর সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। লেখকের এ গ্রন্থটিকে একই ধারায় সম্প্রসারিত করে নতুন দুটি অধ্যায় সংযুক্ত করে *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০১) নামে প্রকাশিত হয়েছে। একই লেখকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০১)। আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। এ বইটিতে পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কাব্যচর্চা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাহার ঘটেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি কবিতার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তার কোনো গ্রন্থেই পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অবদানের চিত্র ফুটে উঠেনি।

রেজোয়ান সিদ্দিকী রচিত *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬) একটি তথ্য সমৃদ্ধ পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়ে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি চিত্র এ গবেষণাগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লেখক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে চিহ্নিত করে সেগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা না থাকায় এই চিত্রটিও অপূর্ণাঙ্গ।

রোজিনা কাদের রচিত *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০৪) গ্রন্থটি লেখকের এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ ভিত্তিক প্রকাশনা। শিরোনামই বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আলোচনা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ

ইতিহাস নয়, একটি অংশমাত্র। এছাড়া তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চালিকা শক্তি হিসেবে শুধু ঢাকার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পরিচয় ও লক্ষ্য-আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তবে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত এই গ্রন্থের কোনো অধ্যায়েই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র নেই।

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জীর *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩) গ্রন্থটি তথ্য সমৃদ্ধ পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত এই গ্রন্থে বিভাগপূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন মাধ্যম তথা উপাদান হিসেবে গণসঙ্গীত, নাটক, নৃত্যনাট্য, চলচ্চিত্র এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিষয়ে আলাদা করে আলোচনা করেছেন। তবে তিনি এ গ্রন্থে সুন্দরভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চিত্র ফুটিয়ে তুললেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের বিস্তারিত চিত্র এখানেও অনুপস্থিত।

এই গবেষণামূলক গ্রন্থগুলোর বাইরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ তথা চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিষয়ে জানার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মাহবুব হাসান সম্পাদিত *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা* (চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১)। মূলত স্মৃতিচারণধর্মী এই গ্রন্থটি থেকে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল আন্দোলন বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্মৃতিচারণা থেকে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেলেও নেই কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপাদান বিশেষ করে গণসঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও নাটক বিষয়ে কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সুকুমার বিশ্বাসের *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণ ঘোষের *গণসঙ্গীত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), সাইম রানার *বাংলাদেশের গণসঙ্গীত: বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৯), সৈয়দা খালেদা জাহান রচিত *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), খন্দকার মাহমুদুল হাসান রচিত *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১১), কামাল লোহানীর *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬) ; *লড়াইয়ের গান* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮) এবং সেলিম রেজা সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এগুলো থেকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ উপাদান সম্পর্কে জানা গেলেও নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য এবং অবদান পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে কিছু গ্রন্থ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে সন্জীদা খাতুন রচিত *স্বাধীনতার অভিযাত্রা: ভাষা আন্দোলন নববর্ষ ছায়ানট মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪), কামাল লোহানী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *উদীচী বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার* (ঢাকা: বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ২০০৯), বেলাল মোহাম্মদের *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭) এবং কামাল লোহানী রচিত *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার* (ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬)। এই গ্রন্থগুলো নির্দিষ্ট কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনকে উপজীব্য করে লেখা হয়েছে। গ্রন্থসমূহ থেকে ঐ সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত নারীদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও বিস্তারিত কোনো বিবরণ নেই।

বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ নিয়েও রচিত হয়েছে গ্রন্থ। মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির রচিত *ভাষা আন্দোলন ও নারী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪) গ্রন্থটি একটি তথ্য সমৃদ্ধ এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ। নারী ভাষাসংগ্রামীদের সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য দ্বৈতয়িক উৎসের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি প্রণীত। এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের ভাষা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু জেলা বা মহকুমা পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র রয়েছে উপেক্ষিত। এছাড়া তুষার আবদুল্লাহ রচিত *ভাষাকন্যা* (ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১৯) গ্রন্থে কয়েকজন নির্বাচিত ভাষাসংগ্রামী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং খুব সীমিত পরিসরে বরিশাল, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহীর ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলন ও নারী বিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ রীতা ভৌমিকের *২৪ জন ভাষাসংগ্রামীর জীবন কথা* (ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০০২)। গ্রন্থের শিরোনাম থেকেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া এই বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে ফরিদা ইয়াসমীন রচিত *ভাষা আন্দোলন ও নারী* (ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৯), জামিল আখতার বীনুর *ভাষা আন্দোলনে নারী* (ঢাকা: গণপ্রকাশনী, ২০১১) এবং সুপা সাদিয়ার *৫২'র বায়ান্ন নারী* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১)। তবে এই বিষয়ক রচিত গ্রন্থসমূহে সাধারণত ভাষা আন্দোলনে বিভাগীয় শহরগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত কয়েকজন ভাষাসংগ্রামী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আঞ্চলিক বা জেলা পর্যায়ের ভাষা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা এখনো অন্তরালে। তাই উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় না।

মালেকা বেগম *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯) গ্রন্থে নারী জাগরণ এবং নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিষয়টি এখানে উপেক্ষিত। লেখকের অপর গ্রন্থ *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (ঢাকা: প্রথমা, ২০১১) গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমুখী অবদানকে উপজীব্য করে প্রণীত। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সশস্ত্র ও গেরিলা যোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধার মা এবং যুদ্ধাহত হিসেবে নারীর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটির কোনো অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্কোয়াডে কর্মরত নারী লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, অভিনেতা, কথক বা আবৃত্তিকারদের কর্মকাণ্ড বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায় না।

রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী প্রণীত *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬) গ্রন্থে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর সংগ্রামী ভূমিকা এবং মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমুখী ভূমিকা চিত্রায়িত করেছেন। গ্রন্থে সাংস্কৃতিক প্রণোদকের ভূমিকায় নারী এই অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু একটি মাত্র অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। তাছাড়া শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধে নারীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর সার্বিক ভূমিকার মূল্যায়নও সম্ভব নয়।

শাহনাজ পারভিন রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭) গ্রন্থটি মূলত লেখকের পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। গ্রন্থটিতে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলের বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর অবদান উল্লেখপূর্বক মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ের একটি অংশে সীমিত পরিসরে মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ থাকলেও নেই কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এতে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা না থাকায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না।

আলোচিত গবেষণা গ্রন্থগুলো ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা, সাময়িকী ও গ্রন্থে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোর অধিকাংশই বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের স্মৃতিচারণধর্মী রচনা। প্রবন্ধগুলোতে সমকালীন সাংগঠনিক তৎপরতা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ব্যক্তি বিশেষের অবদান ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। এসব প্রবন্ধ থেকে সুনির্দিষ্ট দু-একটি বিশেষ বিষয়ে বা সমকালীন নির্দিষ্ট কোনো ইস্যু সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকার সামগ্রিক চিত্র দুর্লভ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়ে বিশদ গবেষণার সুযোগ বিদ্যমান, তাই এই অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস পেয়েছি।

গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস

বর্তমান গবেষণায় বিবরণ ও বিশ্লেষণ দুইই স্থান পেয়েছে। প্রধানত এটি তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস

গবেষণাকর্মে প্রাথমিক উৎস হিসেবে সমকালীন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রতিবেদন, সাময়িকী, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রচারপত্র, স্মরণিকা, দলিলপত্র, সনদ, চিঠিপত্র, দিনলিপি, আদমশুমারি প্রতিবেদন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে আরও ব্যবহার করা হয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক ও শিল্পীদের সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা ও আত্মকথা এবং আন্দোলনে ব্যবহৃত গণসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদির অডিও ও ভিডিও সিডি।

তবে এটি যেহেতু সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা তাই এক্ষেত্রে অতি প্রচলিত ঐতিহাসিক সূত্রের স্বল্প ব্যবহার রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সময়ে নারীর ইতিহাস পুনর্গঠনে উল্লিখিত উৎসসমূহের ভূমিকা গৌণ।

দ্বৈতয়িক উৎস

দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গ্রন্থ এবং ওয়েবসাইট।

গবেষণার রূপরেখা/অধ্যায় বিভাজন

এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে যৌক্তিক শৃঙ্খলার মধ্যে রূপ দেয়ার জন্য ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথমেই রয়েছে ভূমিকা। পাকিস্তান আমলে সমাজে নারীদের অবস্থানগত দুর্বলতা, পশ্চাৎপদতা, শোষণ, অমর্যাদা ও অধিকারহীনতা সত্ত্বেও নারীসমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অধীনে থেকে, বিভিন্ন নারী সংগঠন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে প্রতিটি আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই সমস্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের প্রগতিমনা, সাধারণ নারীরা যুক্ত ছিলেন। কোন আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অবস্থায় নারীরা এই আন্দোলনসমূহে যুক্ত হয়েছিলেন তা বোঝার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরতেই এই ভূমিকার অবতারণা।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক কাঠামো। এই অধ্যায়ে সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পৃক্ততা বিষয়েও আলোচনা রয়েছে। এই অধ্যায়ে তত্ত্বের সাহায্যে আরও দেখানো হয়েছে একটি জনগোষ্ঠী কেন আন্দোলন করে? কোন পরিস্থিতিতে তাদের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ অপরিহার্য হয়? একই সাথে নারীর ইতিহাস রচনার তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ব বাংলার জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনার পর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। আরও রয়েছে, ঢাকা বিভাগ (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ), ময়মনসিংহ বিভাগ (ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা), চট্টগ্রাম বিভাগ (চট্টগ্রাম, টেকনাফ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, নওঁগা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ), রংপুর বিভাগ (রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়), বরিশাল বিভাগ (বরিশাল, ঝালকাঠি), সিলেট বিভাগ (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ) এবং খুলনা বিভাগে (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর) ভাষা আন্দোলনে নারীর বহুমুখী অংশগ্রহণ। এছাড়াও ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায় পর্যন্ত নারীর বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রযাত্রায় সহযাত্রী হয়েছে। অধ্যায়ের শুরুতেই ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সংস্কৃতি সংসদ কেন্দ্রিক প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাট্য আন্দোলন, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ পালন এবং রবীন্দ্র সংগীত বিতর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ড এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। অধ্যায় শেষে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বহুমুখী অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নারীর অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় বেশ কয়েকটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত এই সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলনসমূহে নারীর অংশগ্রহণ ছিল। এই অধ্যায়ে যে কয়টি সম্মেলনের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা, ১৯৪৮), পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (চট্টগ্রাম, ১৯৫১), পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (কুমিল্লা, ১৯৫২), পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা, ১৯৫৪), কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন (টাঙ্গাইল, ১৯৫৭)। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহে প্রধান অতিথি, বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতি, প্রবন্ধকার, সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, নাট্যশিল্পী হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো সম্মেলনে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বেও ছিলেন নারীরা। তাই বর্তমান অধ্যায়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলনসমূহে নারীর বিচিত্র ও বহুমুখী অবদান দৃশ্যমান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৫২-৭১ পর্যায়ে পূর্ব বাংলার প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং মুক্তিযুদ্ধকালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সাথে নারীর সম্পৃক্ততার যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন বিপরীতমুখী সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব নিরসনে এবং মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক পটভূমি রচনায় এসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সংগঠনের কোনোটির সূচনালগ্ন থেকেই নারীর সম্পৃক্ততা রয়েছে, আবার কোনোটিতে পরবর্তীসময়ে নারীরা সম্পৃক্ত হয়েছেন। এই কালপর্বে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ছায়ানট, বেগম ক্লাব, নজরুল একাডেমী এবং উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী। মুক্তিযুদ্ধকালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মধ্যে রয়েছে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ইত্যাদি। আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, প্রগতি মজলিস, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় এবং করতোয়া শিল্পী গোষ্ঠী। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। এই সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল। এই অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাংগঠনিক বিকাশে নারীর অংশগ্রহণ দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে প্রতিষ্ঠার কালক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে নারীর ভূমিকা। নারী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তাদের লেখনীর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৫২-১৯৭১ পর্বে পূর্ব বাংলার উল্লেখযোগ্য সাময়িক ও সাহিত্যপত্রের মধ্যে *মাহে-নও*, *অনন্যা*, *বান্ধবী*, *ললনা* এবং *বেগম* পত্রিকাতেই মূলত নারীরা নিজেদের লেখা প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছেন। তবে বিশ শতকে *বেগম* পত্রিকা নারীদের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পথকে প্রশস্ত করার পাশাপাশি নারীদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা করেছিল। তাই এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে *বেগম* পত্রিকায় পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে যে সকল নারী কবি, সাহিত্যকরা ১৯৫২-১৯৭১ পর্বে তাদের লেখনীতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকসহ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরেছেন তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার হিসেবে সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ অধ্যায়ে উপস্থিত করা হয়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর প্রকৃত ভূমিকা। এছাড়াও উপস্থাপিত হয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তিসমূহ। পাশাপাশি এই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ কতটুকু সাহসী পদক্ষেপ ছিল এ প্রশ্নের বিশ্লেষণধর্মী উত্তর প্রদান এবং তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে তাদের ভূমিকার মূল্যায়নই এ অধ্যায়ের লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি গবেষণাকর্মের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। বর্তমান গবেষণাকর্মটিও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে রচিত ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পুরুষ তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনায় পুরুষের আধিপত্যই প্রতীয়মান হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নারীর বিচিত্র ও বহুমুখী অবদানও অদৃশ্য থেকে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি দেখা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারী সশস্ত্র যোদ্ধা থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহে বহুমুখী ও বিচিত্র অবদান রাখলেও স্বাধীনতা পরবর্তী রচনায় এবং সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চারুকলা ও নাটকে সাধারণত নারীকে তার গতানুগতিক ভাবমূর্তিতে (যুদ্ধের শিকার, পরিবারের পুরুষকে যুদ্ধে পাঠিয়ে ক্রন্দনরত) উপস্থাপন করা হয়েছে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর ভূমিকারও সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। তাই এ সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা বিরাজমান। সেজন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক এবং শিল্পীদের সাক্ষাৎকার এবং স্মৃতিকথা বা আত্মকথার ওপর। কিন্তু ব্যক্তির বক্তব্য বা লেখায় অতিরঞ্জন, অতিকথন, আত্মপ্রচার বা পক্ষপাতিত্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক বা শিল্পীদের অনেকেই বর্তমানে জীবিত নেই। আবার যারা জীবিত আছেন তাদের অধিকাংশ স্মৃতিভ্রষ্ট অথবা নানা কারণে অনেক কথা গোপন করেছেন বা অস্পষ্ট করে বলেছেন, যা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় অন্তরায়। ফলে গবেষণাকর্মটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বৈতয়িক উৎসের শরণাপন্ন হয়েছে। তবে লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যের মধ্যে সত্যাসত্য যাচাই করে অভিসন্দর্ভটিকে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পরিসর বিস্তৃত। বিস্তৃত পরিসরের কারণে এতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ এবং ঢাকাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই ঢাকার বাইরে অন্যান্য বিভাগীয় শহরের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে আরও গবেষণার সুযোগ বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

১. মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭০)*, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ. ২০।
২. উদাহরণস্বরূপ East Bengal Constitutional Assembly, East Bengal Railway-র কথা বলা যায়।
৩. যতীন সরকার, *সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৬১।

ভূমিকা

এক

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় যে সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার আসে, সেখানে নারীর অবস্থার পরিবর্তনের ইস্যুটি অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। তবে যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নারীর সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থানের ফলে তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের তীব্রতা যতটা বাড়ে ততই নারী বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা গৌণ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় নারী সমস্যার বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয়তাবাদী শক্তির অসম্মতিকেই মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন ঐতিহাসিক পার্থ চ্যাটার্জী। তিনি তার বহুল আলোচিত প্রবন্ধ 'The Nationalist Resolution of the Women's Question' এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[১] তিনি ব্যাখ্যা করেন প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুটো Sphere বা স্তরে দানা বেঁধে উঠেছিল। তিনি এদেরকে Material ও Spiritual (বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক) বা Outer ও Inner (বাহির ও ঘর) স্তর হিসেবে অভিহিত করেন। বস্তুগত বা বাইরের যে স্তর সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন প্রশাসন, অর্থনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্পষ্টতই পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করছিল। অর্থাৎ বস্তুগত বিচারে পাশ্চাত্য জয়ী হয়েছিল। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ববোধের জায়গায় আর কোন ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরুষকুল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাদের এই সংগ্রামকে একটা পর্যায়ে সনাতন, ভারতীয় ও আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শের লড়াই হিসেবে দেখেছিলেন। আর স্বাভাবিকভাবেই এর প্রথম অভিঘাতটা এসে পড়ে অন্তঃপুরের নারীদের ওপরে। তখন জাতীয়তাবাদী শক্তি নারীর সংস্কারের প্রশ্নে ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে কোনোরকম দরকষাকষিতে না যাবার অবস্থানে অনড় থাকে। ফলে এই পর্যায়ে সনাতন জীবনাদর্শ এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী আধুনিকতার সমন্বয়ে এক নতুন ধরনের নারীত্বের নির্মাণ হয়। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের 'Angel in the House'-এর সাথে সঙ্গতি রেখে নারীর নতুন ভাবমূর্তি দাঁড়াল 'কল্যাণী' বা 'গৃহলক্ষী' রূপে। ইতিহাসবিদ সোনিয়া নিশাত আমিন 'কল্যাণী' ও 'গৃহলক্ষী'র ধারণার সারসংক্ষেপ করেছেন এইভাবে, "অবদানকারী, নীড়নির্মাতা, মাতা, অভিভাবক, গৃহীদেবীর সংরক্ষক, জীবনের নিত্য সঙ্গী, এককথায় একজন দেবী–যিনি গৃহিণীরূপে আবির্ভূত।"[২] তবে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা 'কল্যাণী' বা 'গৃহলক্ষী'র বিমূর্ত ধারণাটি গ্রহণ না করে তার প্রতীকী রূপটি আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

বিশ শতকের শুরুতেও অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতা নারীকে বাস্তবে গৃহের পবিত্র অঙ্গনে গৃহবধূ হিসেবই দেখতে চাইতেন। তবে সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত শক্তির সুবিধা এবং যে কোনো কাজে নারীর একাগ্রতার কথা উপলব্ধি করে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা নারীদেরকে ঘরের বাইরে এসে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের উৎসাহ দেন। অন্দরমহলের বাইরের জীবনে এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেই এই প্রথম ভারতীয় নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৪] বিশ শতকে এসে ক্রমান্বয়ে রাজনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজ সংস্কার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রাজনৈতিক, আইনগত, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে বাংলার নারীসমাজ বেশ অগ্রসর হয়।

উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের সৃষ্টি হয়। বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের পূর্বাংশরূপে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত হয়। নতুন এ রাষ্ট্র নারীর জন্য এক সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। নারীর মৌলিক

অধিকার, স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণ মানবসত্তা হিসেবে মর্যাদাবান জীবন লাভের অধিকার পুরোপুরি উপেক্ষিত হতে থাকে। ১৯৪৭ পরবর্তী বেশ কয়েকবছর নারীরা কঠোর অবরোধ, নিরক্ষতা এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়।[৫] নারীর অধিকারগুলো বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করার নিমিত্তে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন সংগঠন। ১৯৪৩ সালে গঠিত 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'কে পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে ১৯৪৯ সালে সুফিয়া কামাল, যুঁইফুল রায় এবং নিবেদিতা নাগের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি'। এই ধারায় পঞ্চাশের দশকে আরও কিছু নারী সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে স্বদেশি আন্দোলনের নেত্রী আশালতা সেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি'। ১৯৫৪ সালে সুফিয়া কামাল এবং লীলা রায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ওয়ারী মহিলা সমিতি'।[৬] এসব সংগঠন প্রথম থেকেই সরকারের বাধার সম্মুখীন হয়। তবে সরকারি নির্দেশে পরিচালিত হয় ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারীর ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালনে নিবেদিত সংগঠন নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির প্রাদেশিক শাখা।

দুই

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ সালের পূর্বে প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসর ব্রাহ্ম ও হিন্দুরা দেশত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় চলে গেলে পূর্ব বাংলার শিক্ষাকার্যক্রমের অবস্থা খুবই সঙিন হয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা কমে যায়। এ অবস্থার সুযোগে সরকার একের পর এক মহিলা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। সিলেট মহিলা কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখন তৎকালীন গভর্নর ফিরোজ খান নুনের সাথে দেখা করে জোবেদা খাতুন চৌধুরী সিলেট মহিলা কলেজ বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ জানান। ফিরোজ খান নুন তাকে এক বছর সময় দিয়ে বলেছিলেন, 'এই সময়ের মধ্যে যথেষ্টসংখ্যক ছাত্রী না হলে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।'[৭] জোবেদা খাতুন চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন সমাজকর্মী বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে কলেজটি চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায় ঢাকার ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলকে একত্র করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। প্রতিবাদস্বরূপ ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রায় ৫০০ ছাত্রী ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ প্রসঙ্গে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, "পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংকট কত দূর চরমে উঠিয়াছে তাহা পনেরই নভেম্বর (১৯৪৮) তারিখে ঢাকার ছাত্রী বিক্ষোভ হইতেই অনুমিত হয়। ছাত্রীদের এত বড় মিছিল ইতিপূর্বে ঢাকায় দেখা যায় নাই। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে যে ছাত্রীরা বাহির হয় নাই এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।" ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ছাত্রী ধর্মঘট চলমান থাকে। তৎকালীন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরে এই বিষয়ে বিবৃতিতে বলেন, "তরুণ মুসলিম ছাত্রীদের রাস্তায় রাস্তায় প্যারেড করিয়া বেড়ানো অত্যন্ত অসম্মানজনক। ইহা মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপন্থী।" এর প্রতিবাদে ছাত্রীসমাজের তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ৬ ডিসেম্বর ধর্মঘটের অবসান ঘটে। তবে পরবর্তীকালে নতুন নতুন দাবিতে ছাত্রীরা ধর্মঘট করে।[৮]

১৯৪৭ উত্তরকালে পূর্ব পকিস্তানে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রক্ষণশীলদের বক্তব্য চলমান থাকলেও শিক্ষার ধারা অগ্রসরমান থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান নারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শামসুন্নাহার মাহমুদ এ বিষয়ে বলেন, "বিভাগ পূর্বকাল থেকেই মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন উদ্দীপনা এসেছিল। বিভাগোত্তর কালে এ উদ্দীপনা আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত নানা দেশাচার ও কুসংস্কার হ্রাস পেতে থাকে।"[৯] ১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭২ জন।[১০] ১৯৪৮ সালে মেডিক্যাল কলেজে দুজন নারী ডাক্তার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ৩ জন মুসলমান নারী সহকারী সার্জন হিসেবে নিযুক্ত হন।[১১] তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, সার্বিকভাবে নারী শিক্ষার চিত্র মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী নারীর সংখ্যা, ১,৯৯,৯৪,৭৫৪ জন, যাদের মধ্যে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ২২,৬০,২৩৩ জন। অর্থাৎ দেখা যায়, মোট নারীর মাত্র

১১.৩ শতাংশ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৫১ সালে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যার পরিসংখ্যানের হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ হার চট্টগ্রাম জেলায় (২২.৪%)।[১২] কিন্তু সেটাও জেলায় বসবাসকারী মোট নারীর ২৫ শতাংশেও পৌঁছাতে পারেনি। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ কিছুটা বেশি হলেও ম্যাট্রিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকেও নারীশিক্ষার খুব একটা সন্তোষজনক চিত্র পাওয়া যায় না। ১৯৬১ সালে পূর্ব পকিস্তানে বসবাসকারী নারীর সংখ্যা ২,৪৪,৯১,৩৯২ জন যাদের মধ্যে শহরে বাস করতেন ১০,৯০,১২০ এবং গ্রামে বাস করতেন ২,৩৪,০১,২২ জন। শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ২১,০৯,৪৪১ জন, যা মোট নারীর সংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। শিক্ষিত নারীদের মধ্যে ১৫,২৩,৪১৫ জন ছিলেন মুসলিম নারী। প্রধান প্রধান জেলা শহরে নারীশিক্ষার হার নিম্নরূপ:

জেলা	মোট নারীর সংখ্যা (৫ বছর এবং তার উর্ধ্ব বয়সী)	সাক্ষর নারীর সংখ্যা	শতকরা হার
ময়মনসিংহ	১৮,৬৯৭	৮,৭৫২	৪৬.৮
বরিশাল	২৩,৩২২	৯,১৯৪	৩৯.৪
রাজশাহী	২১,০১৮	৭,৮০৪	৩৭.১
কুমিল্লা	২০,৩৭৬	৭,৩০৭	৩৫.৮
ঢাকা	১,৮০,৯৬০	৬০,৮৭০	৩৩.৬

Source: *Pakistan Population Census 1961, Volume 1*, Government of Pakistan, Karachi, p. vi-11.

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৬১ সালে নারী শিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রসরমান জেলা ছিল ময়মনসিংহ। সবচেয়ে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও জেলায় বসবাসকারী অর্ধেকেরও বেশি নারী নিরক্ষর ছিলেন। আবার দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর ঢাকাতে বসবাসকারী নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নারী শিক্ষার হার বিবেচনায় ঢাকা অন্যান্য প্রধান প্রধান জেলা শহর থেকে অনগ্রসর।

নিম্নে ১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হলো:

শিক্ষার স্তর	১৯৫১	১৯৬১
অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা	১৪,৭৪,২৮৪ জন	৩,৬৫,৭১৭ জন
প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি	৬,৬২,২২১ জন	১৪,০৮,৮৪১ জন
পঞ্চম-নবম শ্রেণি	১,১২,৭০৬ জন	৩,১৮,৬৫৮ জন
ম্যাট্রিকুলেশন	৯,৫৮২ জন	১১,৭১৭ জন
ইন্টারমিডিয়েট	-	২,৯৭৪ জন
ডিগ্রি	১,২৭০ জন	১,১৭৬ জন
উচ্চতর ডিগ্রি	১৭০ জন	৩৩৪ জন
বিদেশি শিক্ষা	-	২৪ জন
সর্বমোট	২২,৬০,২৩৩ (১১.৩%)	২১,০৯,৪৪১ (৮.৬%)

Source: H. H. Nomani (ed.), *Pakistan Population Census 1951, Volume 3,* Government of Pakistan, Karachi, p. 8-2; A. Rashid (ed.), *Pakistan Population Census 1961, Volume 1,* Government of Pakistan, Karachi, p. iv-24.

১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রী সংখ্যাও। তবে সার্বিকভাবে পূর্বের তুলনায় নারীশিক্ষার হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫১ সালে নারীশিক্ষার হার ছিল ১১.৩ শতাংশ যা ১৯৬১ সালে ৮.৬ শতাংশে নেমে আসে। উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও নারীর মোট সংখ্যার দিক থেকে তা খুবই নগণ্য। পাকিস্তান আমলে নারীর উচ্চশিক্ষার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর প্রবেশকে একটা নমুনা হিসেবে বিবেচনা করলে পূর্ব পাকিস্তানে নারীর উচ্চশিক্ষা বিষয়ে একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

নিম্নের তালিকা থেকে ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের সংখ্যা জানা যাবে।

শিক্ষাবর্ষ	মোট শিক্ষার্থী	নারী শিক্ষার্থী	শতকরা হার (%)
১৯৫২-৫৩	১,২৯৯ জন	৯১ জন	৭.০০
১৯৫৩-৫৪	১,৩৪৩ জন	৯৭ জন	৭.২২
১৯৫৪-৫৫	১,২৬১ জন	১২৬ জন	৯.৯৯
১৯৫৫-৫৬	১,৬৩৩ জন	১৬৭ জন	১০.২৩
১৯৫৬-৫৭	২,৭৫৪ জন	১৭৬ জন	৬.৩৯
১৯৫৭-৫৮	৩,১৫০ জন	২৩৪ জন	৭.৪৩
১৯৫৮-৫৯	৩,৫৩৮ জন	২৫৪ জন	৭.১৮
১৯৫৯-৬০	৩,১৪৩ জন	২৭৫ জন	৮.৭৫
১৯৬০-৬১	৩,১২৪ জন	৩২০ জন	১০.২৪
১৯৬১-৬২	৩,৪৪৯ জন	৩৪৯ জন	১০.১২
১৯৬২-৬৩	৪,১৩৭ জন	৪৬৭ জন	১১.২৯
১৯৬৩-৬৪	৪,৮৫২ জন	৬৪২ জন	১৩.২৩
১৯৬৪-৬৫	৪,৮০৩ জন	৭৪১ জন	১৫.৪৩
১৯৬৫-৬৬	৪,৫৮৯ জন	৭০৮ জন	১৫.৪৩
১৯৬৬-৬৭	৫,২৩৮ জন	১,০২১ জন	১৯.৪৯
১৯৬৭-৬৮	৫,৯০৫ জন	১,২২৮ জন	২০.৭৯
১৯৬৮-৬৯	৬,৬৬৪ জন	১,৪১৬ জন	২১.২৫
১৯৬৯-৭০	৮,১৫১ জন	১,৮০৯ জন	২২.১৯
১৯৭০-৭১	৭,৪০৭ জন	১,৬৪১ জন	২২.১৫
সর্বমোট	৭৬,৪৪০ জন	১১,৭৬২ জন	১৫.৩৯%

উৎস: *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী*, শিক্ষাবর্ষ ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৭০-৭১।

১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে ৭৬,৪৪০ জন যাদের মধ্যে ১১,৭৬২ জন নারী শিক্ষার্থী যা ১৫.৩৯%। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গোটা ষাটের দশক জুড়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছিল। পাকিস্তান আমলের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল ৭০২৮ জন।

এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৮০০, যাদের ৮৫১ জন ছিল রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রী।[১৩] মূলত বিশ শতকের পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। সত্তরের দশকেও তা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে বসবাসকারী নারীর সংখ্যা ৩,৪৩,৬৭,৪৮৪ জন। শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ৩৮,৮৭,৮৪১ জন যা মোট নারীর সংখ্যার ১৩.৭ শতাংশ। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় নারী শিক্ষার হার প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই শিক্ষিত নারীরা পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিন

উনিশ শতককে বাঙালি নারী জাগরণের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও তখনও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদানের বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়নের তাত্ত্বিক যুক্তি সৃষ্টি হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো নারীর যৌনতা ও শ্রমকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য থেকেই নারীকে কখনো একজন স্বতন্ত্র উৎপাদক এবং অর্থনীতিতে অবদানকারী হিসেবে গণ্য করেনি।[১৪] ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে যেমন গৃহবর্হিভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশহ্গ্রহণ বিবেচনায় আসেনি, তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে শিক্ষার স্বীকৃত উদ্দেশ্য হিসেবেও গণ্য করা হয়নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তীসময়ে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তৎকালীন অনুন্নত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর শ্রমদান অপরিহার্য ছিল। তাঁত ও পাট শিল্পে নারী শ্রমিকের সম্পৃক্ততার নিদর্শন পাওয়া যায়। সিল্কের গুটি ও সুতা প্রস্তুতেও নারীরা অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষকতা, চিকিৎসাসেবা, দপ্তর করণিক ইত্যাদি পেশায়ও নারীর প্রবেশ ঘটে, যা অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১,৯৯,৯৪,৭৫৪ জন নারীর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ছিলেন ১০,৫৭,৬৯৯ জন যা মোট নারীর ৫.৩%। অর্থনেতিকভাবে স্বনির্ভর নারীদের মধ্যে বেসামরিক খাতের (Civilian Labour Force)[১৫] সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ৯,৯৯,২৬০ জন যাদের মধ্যে কৃষি খাতে (Agricultural Labour Force)[১৬] ৮,১৬,৪৬১ জন ও কৃষিবহির্ভূত খাতে (Non-Agricultural Civilian Labour Force)[১৭] ১,৮২,৭৯৯ জন এবং বেসামরিক বহির্ভূত খাতে (Not in Civilian Labour Force)[১৮] সম্পৃক্ত ছিলেন ৫৮,৪৩৯ জন নারী। এই জনগণনা অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র নিম্নরূপ:

বিভাগ	মোট নারী	অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর			নির্ভরশীল
		বেসামরিক খাত		বেসামরিক বহির্ভূত খাত	
		কৃষি	কৃষি-বহির্ভূত		
ঢাকা	৭৭,২১,৮৫০ জন	৩,৩৭,৮১২ জন	৬১,৭৭৯ জন	১৮,০৬৫ জন	৭৩,০৪,১৯৪ জন
চট্টগ্রাম	৫৫,৭৯,০৬৩ জন	৩,৬৯,৬৪৭ জন	৬৯,৯৩৮ জন	২৬,১৫৪ জন	৫১,১৩,৩২৪ জন
রাজশাহী	৬৬,৯৩,৮৪১ জন	১,০৯,০০২ জন	৫১,০৮২ জন	১৪,২২০ জন	৬৫,১৯,৫৩৭ জন

Source: H. H. Nomani (ed.), *Pakistan Population Census 1951, Volume 8,* East Bengal Tables, Goverment of Pakistan, Karachi, pp. (1.4-1.9).

ছক অনুযায়ী দেখা যায়, ঢাকায় বসবাসকারী নারীর ৫.৪০%, চট্টগ্রামের ৮.৩৫% এবং রাজশাহীর ২.৬০% নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ছিলেন। তবে তখন থেকেই বিভিন্ন ধরনের পেশায় নারীর প্রবেশ লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালে বিভিন্ন শ্রেণিতে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন ২,৪৩৭ জন নারী।

চিকিৎসক ও সার্জন হিসেবে ৬৫ জন এবং নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে ২,১৪৭ জন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া টেলিফোন অপারেটর, স্টেনো টাইপিস্ট, গ্রন্থাগারিক, দপ্তর করণিক এবং বিভিন্ন অফিসের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন ৬৬৬ জন নারী। তবে স্বনির্ভর নারীদের একটা বিরাট অংশ ছিলেন শ্রমিক। বস্ত্রশিল্প, গ্লাস ও সিরামিক শিল্প এবং পেপার মিলে যথাক্রমে ৩২,৭৮৩ ও ৭,৭৯৭ এবং ৬২ জন নারী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। অন্যের বাড়িতে বিভিন্ন গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন ৩৪,৩৬৪ জন এবং রেলওয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন ১৬০ জন নারী। তবে তখনো সকল ধরনের পেশায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। বিশেষ করে প্রকৌশলী, স্থপতি, পাইলট, নাবিক, পুলিশ এই সকল পেশায় কোনো নারীর যোগদানের তথ্য পাওয়া যায় না।[১৯]

তবে পঞ্চাশের দশক থেকেই ঢাকায় কয়েকজন নারী উদ্যোক্তার আবির্ভাব ঘটে। কিছু সাহসী নারী অপ্রচলিত সেক্টরে ব্যবসা উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঢাকার প্রথম নারী উদ্যোক্তা ছিলেন জোহরা খান।[২০] তিনি ১৯৪৮ সালে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় শঙ্করটোলায়, শ্রীশ দাশ লেনে, 'ইডেন প্রেস' নামে একটি আধুনিক ছাপাখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীসময়ে সেটি আরও বৃহত্তর আকারে হাটখোলায় স্থানান্তরিত হয়। পঞ্চাশের দশকে ঢাকার বিখ্যাত ওষুধের দোকান ছিল আনোয়ারা বেগমের 'করিম ড্রাগ হাউস'। পরে তিনি ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন।[২১] পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার অন্যতম ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল 'লিরা ইন্ডাস্ট্রিজ'। লিলি খান স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের নির্মাণ শিল্পে প্রথম পিভিসি পাইপ ব্যবহারের প্রচলন করে। এছাড়া সেই সময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা হিসেবে নারী উদ্যোক্তারা বুটিক স্থাপনেও আগ্রহী ছিলেন। ১৯৬২ সালে শীলু আবেদ এবং খুরশেদী আলম ধানমন্ডিতে 'জয়া' নামে 'বুটিক ও ফ্যাশন শপ' স্থাপন করেন।[২২]

ষাটের দশকে প্রকাশনা শিল্প এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনে নারীর সম্পৃক্ততা ঘটে। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ১০.৮% নারী বেসামরিক অর্থনৈতিক খাত এবং ৯.৯% নারী কৃষির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।[২৩] এই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন খাত, শিক্ষকতা, সরকারি চাকুরি, চিকিৎসাসেবাসহ নানা পেশায় যোগদান করেন। তবে এক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর ছিলেন শহরে বসবাসকারী নারীরা। ১৯৬১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী গ্রামে বসবাসকারী ২,৩৪,০১,২৭২ জন নারীর মধ্যে ২৫,৮৮,২৮২ জন বেসামরিক বিভিন্ন খাতে উর্পাজনের সাথে জড়িত ছিলেন যা শতকরা হারে ১১.০৬%।[২৪]

অবরোধ প্রথাকে অতিক্রম করে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারীরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কাজেও যোগ দিতে শুরু করে। সমাজের নিম্নস্তরের নিরক্ষর নারীরা ইট ভাঙার কাজ, চা বাগানের শ্রমিকের কাজ এবং পেটে ভাতে বেগার পরিচারিকার কাজেও যোগ দিতে থাকে। সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে নিম্নস্তরের নারীরা অর্থনৈতিক কারণে যে কোনো কাজে যোগদান করতে দ্বিধাহীন ছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত নারীরা অর্থনৈতিক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পরিবারের নিষেধাজ্ঞা, সম্মানজনক চাকরির অভাব এসকল কারণে উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারতেন না। হাসপাতালগুলোতে নার্সের প্রয়োজন দেখা দিলেও সামাজিক নিন্দার কারণে নারীরা এ পেশায় যোদ দিতে দ্বিধা করত। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন মেট্রন আক্তার বানু ১৯৬৪ সালের সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে মহান নার্সিং পেশায় তরুণীদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।[২৫] তবে সার্বিকভাবে পেশা হিসেবে নারীদের অন্যতম প্রধান পছন্দ ছিল শিক্ষকতা। তবে এ সময় নারীশিক্ষার প্রসার এবং সেই ধারাবাহিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের জন্যে তখনও করপোরেট জগত ছিল মরীচিকা সম। করপোরেট জগতে সর্বপ্রথম ঢাকার নারীর অন্তর্ভুক্তি ঘটে ব্যাংকিং সেক্টরে।

১৯৬৬ সালে আনোয়ারা বেগম শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন। একই বছর ঢাকা নগরীর বিভিন্ন ব্যাংকে কিছুসংখ্যক নারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন।[২৬] এভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ষাটের দশকের শেষ এবং সত্তরের দশকের শুরুতে বেসামরিক উপার্জনের বিভিন্ন খাতে নারীর অংশগ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৪ সালে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর মোট নারীর মধ্যে বেসামরিক খাতে ১৮.৭% এবং কৃষির সাথে ৩.৬% নারী যুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ এবং ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন বিভাগে বেসামরিক শ্রমশক্তি এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত নারীর শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হলো:

বিভাগ	বেসামরিক শ্রম শক্তি (Civilian Labour Force)		কৃষি শ্রম শক্তি (Agricultural Labour Force)	
	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৬১	১৯৭৪
রাজশাহী	৩.৯	২৩.১	৩.২	৫.৩
খুলনা	১.৮	১৪.৬	০.৯	১.৫
ঢাকা	৮.৯	১৭.৬	৮.০	৩.৩
চট্টগ্রাম	২৫.৫	১৯.৪	২৪.৪	৩.৯

Source: *Bangladesh Census of Population 1974, Bulletin-1 Provisional Results*, Goverment of the People's Republic of Bangladesh, Dacca, pp. 200-201.

১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যসকল বিভাগ অর্থাৎ ঢাকা, রাজশাহী, খুলনাতে বেসামরিক শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগে কৃষি ক্ষেত্রেও অধিক সংখ্যক নারী যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে কৃষি ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্ততার হার হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ ১৯৬১ সালের (৯.৯%) তুলনায় হ্রাস পেয়ে ১৯৭৪ সালে হয়েছে ৩.৬%। অপরদিকে বেসামরিক খাতে উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত নারীর সংখ্যা ১০.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.৭% (১৯৭৪)। প্রকৃতপক্ষে নারীশিক্ষা প্রসারের ফলে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে নারীরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেশাগত বিদ্যায় (মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা প্রশাসন, হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি) পারদর্শী হয়ে এ সময় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের মোট নারীর তুলনায় সেই সংখ্যাটা খুব সন্তোষজনক ছিল না। গ্রামীণ সিংহভাগ নারীই অর্থনৈতিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং প্রধানত গৃহস্থালির কাজের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন।

চার

পাকিস্তান আমলে রাজনীতিতেও নারীর ভূমিকা লক্ষণীয়। দেশভাগের অব্যবহিত পর থেকে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের ফলে পরিচালিত সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে নারীর ভোটদান পদ্ধতি সংশোধন করা হলে নারীসমাজ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। হালিমা খাতুন, সুফিয়া (লিলি) ইশতিয়াক, মরিয়ম খোন্দকার, আমেনা বেগম, লায়লা সামাদ, লুৎফুন্নেসা প্রমুখের উদ্যোগে সকল স্তরের নারীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য এ সময় নারীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৭] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনীতিতে সক্রিয় নারীকর্মীদের সিংহভাগ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসংযোগ, নির্বাচনী প্রচারণাসহ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয় ছিল। এই নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনেক নারীর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি ঘটে। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিলেন আরতী দত্ত, চিত্রা বিশ্বাস,

লায়লা সামাদ, প্রণতি দাস, হালিমা খাতুন, নূরজাহান মোর্শেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস, মরিয়ম বেগম, লতিকা এন মারাক, রনিলা বানোয়ারী, যাদুমনি হাজং, রওশন হাসিনা, বদরুন্নেসা আহমদ, সালেহা খাতুন, তোফাতুন্নেসা, কাজী আজিজা ইদ্রিস, নীলুফার আহমেদ ডলি, রোকেয়া মাহবুব, সেলিনা বানু, জান্নাতুল ফেরদৌস, হোসনে আরা ইসলাম বেবী, আফতাবুন নাহার, উষা রাণী চক্রবর্তী, নেপিশা বেগম, সাহারা খাতুন, মজিরননেসা, রওশন হাসিনা, ফাতেমা চৌধুরী প্রমুখ।[২৮] ১৯৫৪ এর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে নূরজাহান মুরশিদ, দৌলতননেসা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমেদ, আনোয়ারা খাতুন, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তোফাতুন্নেসা বেগম, মেহেরুন্নেসা খাতুন, আমেনা বেগম, নেলী সেনগুপ্তা, নিবেদিতা মন্ডলসহ ১৪জন নারী আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আইন পরিষদে নারীদের এই প্রতিনিধিত্ব অন্যান্য নারীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে কেন্দ্রীয় লীগ সরকার শঙ্কিত হয়ে ফজলুল হকের মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে ৯২ (ক) ধারা জারি করে। ৯২ (ক) ধারায় জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ বাতিলসহ রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ ও নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের বিধান ছিল। ফলে ব্যাপকভাবে প্রাদেশিক পরিষদের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হতে থাকে। এসময় দৌলতননেছা খাতুন, সেলিনা বানু, জ্যোৎস্না নিয়োগী, নিলুফার ডলিসহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। এছাড়া ৯২ (ক) ধারাবলে নারীদের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ, গান-বাজনা, অভিনয়, কপালে টিপ পরার অধিকার হরণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির সরকারি ছুটিও বাতিল করা হয়। এই ধারার প্রতিবাদে গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, পাক-কৃষ্টি সংসদ, পুরানা পল্টন নারী সংসদ যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে।[২৯]

১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্রীদের মিছিল বের হয়। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীসমাজ ছাত্রীদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এ সময় লবণ, তেলসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নারীরা ঢাকায় রাজপথ অবরোধ করে আন্দোলন করেন। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীরা রাস্তায় মন্ত্রী আতাউর রহমানকে ঘেরাও করেন। পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রথম নারীরা প্রকাশ্য রাজপথ ঘেরাও আন্দোলন করেন। তবে সরকারি দমননীতির ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার, সামাজিক অধিকারের দাবিতে প্রকাশ্যে জোরালো আন্দোলন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার করা হলে নারী সংগঠনগুলো পুনরায় সক্রিয় হয়। এ সময় নারী সমাজের ঐক্যফ্রন্ট গঠন নারী আন্দোলনে নতুন ধারার সূচনা করে। সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীসমাজের অংশগ্রহণ এবং ত্যাগ থাকলেও দেশের সংবিধান থেকে শুরু করে কোথাও নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। এর প্রতিবাদে সাংসদ জাহানারা শাহনেওয়াজের নেতৃত্বে প্রতিবাদী নারী সংগঠনসমূহ নিয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মুরশিদ, রাজিয়া বানু, দৌলতননেছা খাতুনকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।[৩০]

১৯৫৬ সাল থেকে নারী অধিকার কর্মীগণ পারিবারিক আইন প্রণয়ন ও নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার কাজে ব্রতী হন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নারীদের সংরক্ষিত আসনের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়। নারীদের ভোটে নারীদের নির্বাচনের আইন ঘোষিত হয়। নারীরা সাধারণ আসনে একটি এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে একটি অর্থাৎ মোট দুইটি ভোট দেয়ার অধিকার পায়। ১৯৫৬ সালের মে মাস নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে নারী ও শিশুর জীবনহানির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদলীয় মহিলা কর্ম পরিষদ গঠিত হয়। খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিলে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৫৭ সালের ১৫ এপ্রিল সিলেটের মৌলভীবাজারে নারীরা খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করেন। ১০ জুলাই পাবনা শহরে নারীরা ভুখা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে বিভিন্ন সরকারবিরোধী আন্দোলন এবং বিক্ষোভে নারীসমাজ ক্রমাগত সংগঠিত হতে থাকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নারী সংগঠন এবং সক্রিয় নারী কর্মীগণ নারীর বিভিন্ন সামাজিক ও আইনগত অধিকার (বিশেষ করে উত্তরাধিকার, বিবাহ রেজিস্ট্রি, বহুবিবাহ, তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষণ সংক্রান্ত) আদায়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে নারীসমাজ রাজপথের আন্দোলন স্থগিত করতে বাধ্য হয়। তখন কৌশলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। অব্যাহত আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৬১ সালে তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খান মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি করেন। ১৯৬২ সালে শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে, তার প্রতিটি কর্মসূচিতে নারী শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, সেলিনা বানু, রোকেয়া রহমান কবীরসহ আরও অনেকে পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নারীরা দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসেন। তবে রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরুষ নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী ট্রাক মিছিলে নারীদের প্রকাশ্য অংশগ্রহণ বিষয়ে দ্বিধান্বিত হলে রোকেয়া রহমান কবীর এর প্রতিবাদ জানান। তারপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মতিতে নারীরা পেছনের জিপগাড়িতে চড়ে মিছিলে অংশ নেন।[৩১]

১৯৬৪ সালে নির্বাচনের প্রস্তুতিকালে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্যোগে সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু হলে, নারীসমাজও এতে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দল রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনীত করলে, সামরিক সরকার রাষ্ট্রপ্রধান পদে নারীর নির্বাচন জায়েজ নয় বলে ফতোয়া দেয়। প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের ৯ দফাবিশিষ্ট নির্বাচনী ঘোষণার ৮ নম্বর ধারায় বলা "ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ইসলামী বিধানাবলীর বাস্তবায়ন এবং শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 'পারিবারিক আইন ১৯৬১' বাতিল করতে হবে।"[৩২] ফলে নারীসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। নারীসমাজের তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলস্বরূপ আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৮নং ধারার সঙ্গে তাদের দ্বিমত জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে।

বিশ শতকের ষাটের দশকে নারীসমাজ সরকারবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ছয় দফা এবং এগার দফা আন্দোলের প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। সামরিক আইন ভঙ্গ করে '৬৯-এর গণআন্দোলনেও নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ছাত্রীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ২২ জানুয়ারি নারীসমাজ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিছিলে যোগদান করেন। ২৪ জানুয়ারি সুফিয়া কামালের বাসায় অনুষ্ঠিত নারী সভায় শোক মিছিল করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় শহিদ মিনার থেকে শোক মিছিল বের হয়। মিছিলটি হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নওয়াবপুর হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। বোরকা পরা পর্দানশীন নারী, শিশু-কিশোরী-তরুণীরাও এই মিছিলে যোগ দেন। ঢাকার জনগণ তাদের ফুল, গোলাপজল ছিটিয়ে অভিনন্দিত করেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের পটভূমিকায় দলমত সংগঠন নির্বিশেষে প্রগতিশীল নারীনেত্রী ও সংগঠকদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত নারী এবং ছাত্রীনেত্রীদের মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম, বদরুন্নেসা আহমেদ, জোহরা তাজউদ্দীন, আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা বানু, নূরজাহান কাদের, সারা আলি, রাজিয়া বানু, আয়শা খানম, ফওজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস, কাজী মমতা হেনা, মুনিরা আক্তার প্রমুখ। ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক রূপান্তর সাধিত হলো 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' গঠনের মাধ্যমে।[৩৩] এই সংগঠন পাকিস্তানি সরকারের বিভিন্ন গণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে

নারীসমাজকে সচেতন এবং সংগঠিত করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া এই সংগঠনের উদ্যোগে দেশে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদ প্রতিষ্ঠা ও নারীদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, নারী শ্রমিকদের সমমজুরি, পর্যাপ্ত সংখ্যায় মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা, দ্রব্যমূল্যের দাম হ্রাস করা এবং নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিসহ নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।[৩৪]

১৯৭০-এর ১১ নভেম্বর উপকূল অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত জনমানুষকে সহায়তার জন্য পরিচালিত ত্রাণকার্যে সুফিয়া কামাল এবং সুলতানা জামানের নেতৃত্বে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। '৭০-এর নির্বাচন, পশ্চিম পাকিস্তানিদের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা, প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভের পথ ধরে আসা '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনেও নারীরা অংশ নেয়। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ সারা দেশের নারীসমাজকে সংগঠিত করে সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানায়। অবশেষে অসহযোগ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে রূপ নিলে, নারীসমাজ যুদ্ধকালে প্রত্যক্ষ যোদ্ধা, সংবাদ আদান-প্রদান, তহবিল সংগ্রহ, আশ্রয়দান, ক্যাম্পে ও হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা, পরিচর্যাকারী এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

পাঁচ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার প্রতি ঝোঁক লক্ষ করা যায়। মানুষের জীবনাচরণে ধর্মচেতনার প্রাবল্য ছিল লক্ষণীয়। তখনও মুসলমান সমাজে পর্দা প্রথা প্রবল ছিল। পাশাপাশি শুরু হয় তথাকথিত মুসলিম ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে নারীকে পর্দার মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল অপচেষ্টা। এমনকি পরিকল্পিতভাবে মেয়েদের ওপর গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণও চলত। ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রীদের বাসে প্রায়ই গুণ্ডাদের আক্রমণ চলত।[৩৫] এই প্রতিকূল সামাজিক অবস্থায় মেয়েদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা চালাতে হতো। নাচ ও গানের অনুষ্ঠানে নারীদের উত্যক্ত, অপমানিত করা হতো। ফলে অনেক পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে অনেকেই বহু বাধার সম্মুখীন হয়েও এই চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। তখন ঘোড়ার গাড়িতে পর্দা টানিয়ে মুসলমান নারীরা রাস্তায় চলাফেরা করতেন। এ প্রসঙ্গে রাবেয়া খাতুন তালুকদারের স্মৃতিচারণ:

> ১৯৪৮/৪৯ সালে ঢাকায় বোরখা না পরে বা গাড়ী না চেপে কোন মহিলা রাস্তায় চলাফেরা করতে পারতেন না। স্কুল কলেজের মেয়েরা পদাঘেরা রিকসা বা দরজা জানালা বন্ধকরা ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করত। এতে রিকসাওয়ালা কোন দিকে যায় তাও দেখা যেত না আবার ঘোড়া কোন দিকে ছোটে সেটাও বোঝা যেত না। কলকাতা থেকে এসে ওই ধরণ-ধারণ আমাদের কাছে যেন কেমন কেমন লাগত। সেজন্য আমাদের প্রথম পর্দা ছাড়া রিকসায় যাতায়াতের সময় ২/৪টা ঢিল টিল এসে গায়ে লাগত।[৩৬]

বেতারের যে দু'একজন গান গাইতেন, তারাও বেতার কেন্দ্রে যেতেন পর্দাঘেরা গাড়িতে, গান গাইতেন পর্দার আড়াল থেকে। পুরুষ শিল্পীরাই নাটকের মঞ্চে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আর মেয়েদের নাটকে মেয়েরাই পুরুষ চরিত্রের রূপায়ন করতেন। পাকিস্তান স্বাধীন হলেও দেশের নারীরা তখনও স্বাধীনতা লাভ করেনি। তখন ধর্মকে উপেক্ষা করে বা মানুষের ধর্মীয় বোধ ও আচার-আচরণকে পাশ কাটিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালানোও দুরূহ ব্যাপার ছিল। তবে এই রক্ষণশীলতার বিপরীতে একত্র হয়েছিলেন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী শক্তি। যারা ধর্মনিরপেক্ষভাবে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য চেতনার বিকাশে ভূমিকা রেখেছিলেন।

বিভিন্ন নারী সংগঠন ইতোমধ্যেই নারীর অধিকার বিষয়ে কাজ শুরু করলেও শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য আগ্রহী নারীদের কোনো সংগঠন ছিল না। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত *বেগম* পত্রিকা (প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে কলকাতা থেকে) এবং ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বেগম ক্লাব' পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। *বেগম* পত্রিকা এবং 'বেগম ক্লাব' অন্দরমহলের অন্ধকার থেকে নারীসমাজকে বাইরের উদার আঙ্গিনায় নিয়ে আসতে, শিল্প ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নারীর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করতে সর্বোপরি এদেশের নারীদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৫০ সালে কামরুন্নেছা স্কুলের ছুটির দিনে অর্থাৎ শুক্র ও রবিবার মেয়েদের জন্য আনোয়ারা বাহার চৌধুরী 'সুরবিতান' নামে একটি নাচ-গান বাজনার স্কুল খোলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর এটাই ছিল নৃত্যগীতবাদ্যের প্রথম স্কুল। যখন লেখাপড়ায় মুসলমান মেয়েদের অংশগ্রহণ কম ছিল তখন এ ধরনের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে মাইল ফলক। একই বছর গওহর জামিলের উদ্যোগে পুরান ঢাকায় 'সাংস্কৃতিক সংস্থা কলাভবন' নামে একটি নাচের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ পঞ্চাশের দশক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ করে ঢাকায় নতুন উদ্যমে সংগীত এবং নৃত্য চর্চার সূচনা হয়। তবে ভাষা আন্দোলনের সময় এই চর্চা আরও বেগবান হয়। পাকিস্তান আমলে সংগীত এবং নৃত্যের প্রসার ও প্রশিক্ষণ এবং বাঙালি সংস্কৃতির চর্চায় নিরলসভাবে ভূমিকা রেখেছে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (১৯৫৫) এবং ছায়ানট (১৯৬১)।

পাকিস্তানের সূচনালগ্নে নাটকে নারীর অংশগ্রহণ সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সহ অভিনয় তখন শঙ্কার কারণ ছিল। নারীকে মঞ্চে অনুপস্থিত রেখে পুরুষ দ্বারা নারীর চরিত্র রূপায়নের বিরুদ্ধে নীরব বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লবের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল ঢাকায় মঞ্চস্থ 'টিপু সুলতান' নাটকে মেয়ে শিশু শিল্পীর অভিনয়। ১৯৪৯ সালে নিউ থিয়েটার মঞ্চে 'উদয়নালা' নাটকে অভিনয় করেছিলেন শিরীন চৌধুরী। ঢাকার বাংলা নাটকে নারী শিল্পীদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। এই দুঃসাহসের জন্য তাকে, তার স্বামীকে এবং পরিবারকে দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নাটকের তিনটি স্ত্রী চরিত্রের জন্যই নারী শিল্পী খোঁজা হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন ঢাকার রক্ষণশীল সমাজের অভিভাবকরা কিছুতেই নিজেদের ঘরের মেয়েদের মঞ্চে নামানোর জন্য সম্মত হয়নি।[৩৭] তবে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে নাট্যমঞ্চে নারীরাই নারী চরিত্রের রূপায়ণ শুরু করে। কিছু প্রগতিশীল মুসলিম নারী নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের নাট্যচর্চায় শুধু নারীর অংশগ্রহণ ও উদ্যোগে ইডেন কলেজ ছাত্রী ইউনিয়ন, মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল ইউনিয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ, বিদ্যার্থিনী ভবন ছাত্রীবৃন্দ, মহিলা নাট্য সংগঠন, ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদ অনিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চায়ন করে। এসব নাটকে নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রেই নারীরা অভিনয় করতেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ঢাকা ছাত্র ইউনিয়ন, ড্রামা সার্কেলসহ আরও অনেক সংগঠন নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশগ্রহণে নাট্যচর্চা অব্যাহত রাখে।[৩৮]

পাকিস্তান শাসনামলে শেষ দিকে এসে ধর্মীয় চেতনার ধারা ক্ষীণতর হয়েছে, পর্দা প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারা পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র বাঙালি ধারা প্রবল হয়েছে।[৩৯] পুরানো রীতিনীতি ও মূল্যবোধেও পরিবর্তন এসেছে। ফলে সংগীত, নৃত্য, নাটকে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিয়ে তেমন কোনো সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হয়নি।

সার্বিকভাবে একথা বলা যায় যে, ১৯৪৭-৭১ সময়কাল নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করে। তবে এসময় নারীর অধিকাংশ সমস্যাবলির সমাধান না করে বরং বহাল রাখা হয়। নারীর অর্থনৈতিক শক্তি এবং আইনগত অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও তেমন অগ্রগতি লক্ষণীয় নয়। আবার সমাজে অব্যাহত ছিল পিতৃতন্ত্রের প্রাধান্য যার শেকড় বিস্তারলাভ করেছিল সমাজের অনেক গভীরে।[৪০] তাছাড়া শহরকেন্দ্রিক নারীরা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দিক দিয়ে যতটা অগ্রসরমান ছিলেন, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। স্মর্তব্য, এই আর্থ-সামজিক প্রেক্ষাপটে নারীসমাজ জড়িত হয়েছিলেন সমকালীন প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামে।

তথ্যসূত্র

১. এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Partha Chatterjee, 'The Nationalist Resolution of the Women's Question', Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (ed.), *Recasting Women: Essays in Indian Colonial History*, New Brunswick: Rutgers University Press, 1990.

২. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃ. ৭৩।

৩. *ঐ*।

৪. সোনিয়া নিশাত আমিন, 'নারী ও সমাজ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৭, পৃ. ৬০৯।

৫. মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ. ৭৮।

৬. মোতাহার আখন্দ, 'বাংলাদেশে নারী আন্দোলন: সহমর্মিতা থেকে স্বাতন্ত্র্য', নাসিম আখতার হোসাইন এবং পারভীন জলী (সম্পা.), *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারী*, ঢাকা: সংবেদ, ২০১৯, পৃ. ৪০২।

৭. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ১২৬।

৮. *ঐ*, পৃ. ১২৮।

৯. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭, পৃ. ১৯।

১০. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক প্রতিবেদন*, ১৯৪৭-৪৮, পৃ. ২৯।

১১. শাহিদা পারভিন, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ. ১৬৬।

১২. ১৯৫১ সালে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যার হার জানা যাবে নিচের পরিসংখ্যান থেকে:

জেলা	মোট নারী শিক্ষার হার	প্রাইমারি স্কুল	মাধ্যমিক স্কুল	ম্যাট্রিক	উচ্চতর ডিগ্রি
চট্টগ্রাম	২২.৪	১৯.৪	৪.৯	০.৬	০.১
নোয়াখালী	১৪.৫	২৬.২	৬.৭	০.২	০
সিলেট	১৭.৩	২৩.৬	৬.১	০.৬	০.১
ত্রিপুরা (পরবর্তীকালে কুমিল্লা)	১৩.১	২৪.৬	৫.০	০.৬	০.২
বাকেরগঞ্জ (বরিশাল)	১৩.৬	৩২.৭	৩.৭	০.২	০
ঢাকা	১৩.৩	২৯.৮	৫.৮	০.৭	০.১
ফরিদপুর	৭.৪	৩৭.৬	৪.৮	০.২	০
ময়মনসিংহ	১১.৫	২২.১	৩.০	০.২	০
বগুড়া	৭.৮	৩৮.০	৫.২	০.৪	০.১

জেলা	মোট নারী শিক্ষার হার	প্রাইমারি স্কুল	মাধ্যমিক স্কুল	ম্যাট্রিক	উচ্চতর ডিগ্রি
দিনাজপুর	৬.১	৩৮.৯	৬.১	০.৭	০
পাবনা	৬.৭	৪৬.৯	৬.৫	০.৫	০
রাজশাহী	৫.৮	৪৪.১	৬.৭	০.৫	০.১
রংপুর	৫.৪	৪১.৩	৬.৬	০.৪	০
যশোর	৭.৩	৩৬.৯	৪.১	০.২	০
খুলনা	১০.৯	৩৬.৫	৪.২	০.২	০
কুষ্টিয়া	৫.০	৪১.১	৬.৩	০.৪	০

Source: H. H. Nomani (ed.), *Census of Pakistan 1951, Vol-3,* East Bengal Report and Tables, Karachi: Manager of Publication, 1952, Table-7,9, p. 105.

১৩. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭০-৭১, পরিশিষ্ট-খ।

১৪. সালমা খান, 'অর্থনীতিতে নারীঃ হস্তশিল্প থেকে করপোরেট ব্যবস্থাপনা', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০, পৃ. ৭৯।

১৫. Civilian Labour Force-এর বাংলা বেসামরিক খাত এবং Not in Civilian Labour Force-এর বাংলা বেসামরিক বহির্ভূত খাত করা হয়েছে।

১৬. ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, The Agricultural Civilian Labour Force includes all persons who reported their usual main occupation as 'Cultivators' or who stated that in January, 1951 they were engaged or seeking work in cultivation, stock-raising, hunting and game propagation, or some other occupation associated with the agricultural industry but not generally those engaged in forestry or fishing. এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ এবং যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব না হওয়ায় মূলভাব রক্ষার্থে হুবুহু ইংরেজি সংজ্ঞা তুলে ধরা হয়েছে।

১৭. ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, The Non-Agricultural Civilian Labour Force includes all self-supporting persons who during January 1951 were engaged in Public Service (except the Armed Forces), personal service, trade, commerce, transportation or any industry other than agriculture, but including forestry and fishery. It also includes persons seeking work in any non-agricultural occupation. এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ এবং যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব না হওয়ায় মূলভাব রক্ষার্থে হুবহু ইংরেজি সংজ্ঞা তুলে ধরা হয়েছে।

১৮. ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, Persons Not in the Civilian Labour Force include the members of the Defence Service and also the several classes of self-supporting persons who are regarded as economically inactive. The latter consist of two main categories, first, those persons of private means who have not indicated that they follow any of the professions or occupations which would class them in the labour force. This group includes retired persons and pensioners, students (if they have stated that they are self-supporting or partly so) and those landowners who have not claimed to be cultivators or to be engaged in service or industry. Secondly the economically inactive category includes the inmates of hospitals,

asylums and Jails, if they heve not stated in occupation which enables them to be classed in the Labour force, and what may be called 'Social Parasites' namely persons who have described themselves as beggars, vagrants, prostitutes etc. এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ এবং যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব না হওয়ায় মূলভাব রক্ষার্থে হুবহু ইংরেজি সংজ্ঞা তুলে ধরা হয়েছে।

১৯. H. H. Nomani (ed.), *Pakistan Population Census 1951, Volume 8,* East Bengal Tables, Goverment of Pakistan, Karachi, pp. 2.2-2.10.

২০. সালমা খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

২১. *ঐ*।

২২. *ঐ*, পৃ. ৯৫।

২৩. *Bangladesh Census of Population 1974, Bulletin 1 Provisional Results,* Goverment of the People's Republic of Bangladesh, Dacca, pp. 200-201.

২৪. A. Rashid (ed.), *Pakistan Population Census 1961,* Volume 1, Government of Pakistan, Karachi, pp. V 40-41.

২৫. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

২৬. সালমা খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

২৭. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১, পৃ. ১১৩।

২৮. প্রিয়াঙ্কা রশ্মি হাজরা, 'পাকিস্তান আমলে প্রথম দশকে নারী সমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা', নাসিম আখতার হোসাইন এবং পারভীন জলী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭-৮৮।

২৯. *ঐ*, পৃ. ৩৮৯।

৩০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ১৩৯।

৩১. মালেকা বেগম, 'রাজনীতি: অন্দরমহল রাজপথ ও সংসদ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০, পৃ. ২০৭।

৩২. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

৩৩. মালেকা বেগম, 'রাজনীতি: অন্দরমহল রাজপথ ও সংসদ', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮।

৩৪. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৫. মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

৩৬. রাবেয়া খাতুন তালুকদার, 'আনোয়ারা বাহার চৌধুরী', সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭, পৃ. ৭০।

৩৭. ইসরাফিল শাহীন ও সুদীপ চক্রবর্তী, 'পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাট্যচর্চায় নারী', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।

৩৮. *ঐ*, পৃ. ২৭০-৭১।

৩৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৯-৭১*, ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০২, পৃ. ৩৭৫।

৪০. সোনিয়া নিশাত আমিন, 'নারী ও সমাজ', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৯।

প্রথম অধ্যায়

সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সংগঠন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পৃক্ততা বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২-১৯৭১ পর্বের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করা এবং নারীর ইতিহাস রচনার তত্ত্বগত কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

ক. সংস্কৃতি

ইংরেজি 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় সংস্কৃতি শব্দটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। তবে পূর্বে একই অর্থে 'অনুশীলন', 'কৃষ্টি', 'শিক্ষা', 'সভ্যতা' প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহৃত হতো। শব্দের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কথার মধ্যে নিহিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়, যখন কালক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, গোপাল হালদার, নীহাররঞ্জন রায়, আবুল ফজল, আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, আনিসুজ্জামান, যতীন সরকার, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ মনীষীর চিন্তাধারা পর্যবেক্ষণ করি। সংস্কৃতির ধারণা নির্দ্বন্দ্বে বিকশিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য ঘটেছে এবং তর্ক-বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বর্তমানেও সেই তর্ক-বিতর্ক চলমান রয়েছে। সংস্কৃতি নিয়ে মতপার্থক্য ও তর্ক-বিতর্কের উপস্থিতি বাংলা ভাষায় যেমন আছে তেমনি অন্য সব ভাষায়ও রয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে স্বল্প প্রয়াসে, বাংলা ভাষার চিন্তা-ধারার ঐতিহ্য অনুসরণ করে, সংস্কৃতি কথাটির অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রশ্নের আলোচনায় লিখেছেন, "উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলোর অনুশীলন তাই; এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম CULTURE। এর জন্য কথিত হইয়াছে যে, The Substance of Religion is Culture- মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"[১] তবে সমসাময়িক কালে কালচার অর্থে যে শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হত তা হল 'কৃষ্টি'। বাংলা ভাষায় কালচার অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটির প্রচলন করেছিলেন সম্ভবত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬)।[২] তবে এই 'কৃষ্টি' শব্দটির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) আপত্তি ছিল। তিনি কালচার অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটির ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কারণে। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন:

> মোটামুটি ১৯৩২-৩৩ থেকে ১৯৩৭-৩৮ পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ একটি শব্দ নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন, শব্দটি কৃষ্টি। ... কৃষ্টি শব্দটি যে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করতে পারেনি, শুধু তাই নয়, এই শব্দটির প্রচলন-আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলেন এবং বাঙলা ভাষায় যাতে এর অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি।[৩]

পরবর্তীসময়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) সংস্কৃতি শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি সাগ্রহে তা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সংস্কৃতি শব্দটি Culture বা Civilization অর্থে আমি প্রথমে পাই ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। ১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। আমার বেশ মনে আছে, Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দ সম্বন্ধে তিনি তার সম্পূর্ণ

অনুমোদন জ্ঞাপন করেন।"[৪] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতির সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে 'মার্জিত মানসিকতা' শব্দটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন মনের স্বাধীনতা (Freedom of Mind), বিশ্বমানবতা (Universalism) এবং শালীনতা (Urbanity) এই তিনটি বিষয় মানসিক পরিমার্জনা বা সংস্কৃতির প্রধান সত্য।[৫]

প্রকৃতপক্ষে, কালচার অর্থে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটির প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার অনুশীলনতত্ত্বে যে রকম ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি কথাটার ব্যবহার করছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা করেননি। মূলত পরিশীলিত জীবনবোধ ও চর্চার অর্থেই তিনি সংস্কৃতি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃতি বা Culture-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) লিখেছেন:

> সহজ কথায় ব্যষ্টি বা ইন্ডিভিজুয়্যালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি, সমষ্টি বা কমিউনিটির তা-ই কালচার। আমরা যখন কোনো একজন লোক সম্বন্ধে বলি : 'লোকটার পার্সন্যালিটি আছে', তখন আমরা সেই লোকটির এমন কতকগুলি গুণ-সমষ্টির দিকে ইশারা করি, যেগুলি ঐকান্তিকভাবে তার নিজস্ব এবং যার দ্বারা সে অপর সাধারণ হইতে পৃথক। অথচ ঐ গুণ-সমষ্টি বা পার্সন্যালিটি ঐ লোকটির বিশেষত্ব নয়। কারণ পার্সন্যালিটি আরও অনেক লোকের আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, সকলের পার্সন্যালিটি রূপে-গুণে এক নয়। ব্যক্তিত্বে-ব্যক্তিত্বে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এ পার্থক্যের দ্বারাই তাদের চিনা যায়। ঐ পার্থক্যটুকুই তাদের নিজস্বতা। নিজস্বতাই ঐ পার্থক্যের প্রাণ। ঐটুকুই ব্যক্তিত্ব। ঠিক তেমনি, সকল লোক-সমষ্টিরই অর্থাৎ সব কমিউনিটি সমাজ বা জাতিরই একটা নিজস্ব সমবেত ব্যক্তিত্ব বা কর্পোরেট পার্সন্যালিটি আছে। তারই নাম ঐ লোক সমষ্টি বা কমিউনিটির কালচার।[৬]

আবুল মনসুর আহমদ সংস্কৃতি অর্থে কালচার শব্দটিকেই ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি বা তমদ্দুন কোনো শব্দই তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তবে কৃষ্টি শব্দটিকে তিনি Culture -এর অধিকতর কাছাকাছি বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সংস্কৃতির এই সঠিক প্রতিশব্দ বা সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ককে তিনি নিরর্থক মনে করেছেন।[৭]

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) কালচারের কর্ষণ-সম্পৃক্ত অর্থ বা তাৎপর্যের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শব্দ দুটির মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য করতে চাননি। তার মতে, "চাষের যে অন্যতম উদ্দেশ্য সংস্কার, সেই সংস্কার ক্রিয়ার ফল হচ্ছে সংস্কৃতি, যেমন কৃষির ফল হচ্ছে কৃষ্টি"।[৮] আবার সংস্কৃতি সম্পর্কে গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) *সংস্কৃতির রূপান্তর* গ্রন্থে লিখেছেন, "সংস্কৃতির অর্থ কী, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত- মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্থ মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি; এই 'কৃতির' বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া যাইতেছে।"[৯] সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোপাল হালদার মনুষ্যত্ব এবং তার বিকাশের দিকটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, "সংস্কৃতির মূলের কথা হল জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি, আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্ব প্রকৃতির সহযোগে মানব-প্রকৃতির স্বরাজ-সাধনা"।[১০] গোপাল হালদারের রচনাবলিতে মানুষের চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তির কিছু বৈশিষ্ট্য, মানুষের সৃজনসামর্থ্য, মানুষের প্রকৃতিকে জয় করে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাবার শক্তি- এক কথায় মানুষের ইতিহাস সৃষ্টি করার শক্তি অভিহিত হয়েছে সংস্কৃতি বলে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) সংস্কৃতিকে অনুভব করেছেন জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় সন্ধানের ও অবলম্বনের প্রয়াস রূপে। তার ভাষায়:

> সংক্ষেপে, সুন্দর করে কবিতার মতো করে বলতে গেলে–সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা; গল্পকাহিনীর মারফতে, নর-নারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমণ কাহিনীর মারফতে, বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।[১১]

সুন্দর-মহৎ-গভীরভাবে বাঁচার জন্য মানুষকে সব সময় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত সর্ববিধ কর্মে নিয়োজিত থেকে চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তার কর্মের মধ্যে– তা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে পর্যায়েই হোক। কর্ম না থাকলে সংস্কৃতি থাকে না। তাই উত্তম জীবনযাপনের জন্য মানুষকে নিরন্তর সংস্কৃতিমান থাকতে হয়। তাই মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখেছেন, "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি।"[১২] তিনি মনে করেন, "সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়- উপায়। উদ্দেশ্য, নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লা সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে সে-ই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়।"[১৩] তার চিন্তাধারা থেকে বিশ শতকের সংস্কৃতি চিন্তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ কালের চিন্তাবিদদের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, এ কালেও বিভিন্নজন নানাভাবে সংস্কৃতিকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মধ্যে মতপার্থক্যও কম নয়।

বিশ শতকের চিন্তাবিদ আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) সংস্কৃতি ভাবনা দেশ ধর্ম সীমানাহীন উদার মানবিক মূল্যচেতনায় গড়ে উঠেছে। আবুল ফজলের মতে, "মনুষ্যত্ব তথা মানব ধর্মের সাধনাই হল সংস্কৃতি, আর একমাত্র এই সাধনাই জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করতে পারে।"[১৪] তিনি লিখেছেন:

> রাষ্ট্র বা সংস্কার যেমন সংস্কৃতি নয়, তেমনি প্রচলিত ধর্মীয় আচার বা শিক্ষাও সংস্কৃতি নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে অসভ্যের দেখা মিলবে না এবং অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত লোককেও নেহাত পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করতে কে না দেখেছে? কাজেই ইসলাম, হিন্দু, খ্রিষ্টান বা অন্য যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করেও লোক Uncultured থাকতে পারে, তেমনি এম. এ পাস করে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো উচ্চতম ডিগ্রী নিয়েও Uncultured থাকা অসম্ভব নয়।[১৫]

তিনি মনে করেন, মনের চর্চা ও উৎকর্ষের দ্বারাই ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠে। তাই একজন ব্যক্তির জীবন দর্শন, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবেই তার নিজস্ব ব্যাপার। আর এই ব্যক্তি-মানসের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করছে তার সাংস্কৃতিক জীবনের মান।[১৬] তাছাড়া তিনি কৃষ্টি বা সংস্কৃতির মূল কাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেছেন সাহিত্যকে। তার মতে, সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই সাধারণত সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা দল মেলে। সংগীত, নাটক, চিত্রকলাসহ সংস্কৃতির আরো যত রকম রূপ আছে, সবেরই মূল উৎস ও প্রেরণা সাহিত্য।[১৭]

এক্ষেত্রে আহমদ শরীফের (১৯২১-১৯৯৯) চিন্তা বিশেষ গুরুত্ববহ। তার ভাষায়:

> সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয়-উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। ... সংস্কৃতিকে যদিও ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কোনো বস্তুর মতো মূর্তিমান দেখা যায় না, তবু মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবহারিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তার সংস্কৃতি নিহিত থাকে।

> সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টা দ্বারা যে সৌন্দর্য্য চেতনা, কল্যাণবুদ্ধি ও শোভন জগতদৃষ্টি অর্জন করতে চায়- তাকেই হয়ত তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিস্রুত জীবনচেতনা।... চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা, কল্যাণবুদ্ধি ও মহত্ত্বই সংস্কৃতিবানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে সংস্কৃতিবানের কাছ থেকে সংস্কৃতি সমাজে, দেশে সংক্রমিত হয়, এবং তখন তা পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে।[১৮]

আহমদ শরীফ মনে করেন চিন্তা ও কর্মে সুন্দরের সাধনার নামই সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে তিনি স্বচ্ছ জীবনবোধের প্রকাশ ও প্রাণময়তার অভিব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন এর চর্চা এবং স্বরূপে এর প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের নাম সাংস্কৃতিক চর্চা।[১৯] তাছাড়া সংস্কৃতির বৈচিত্র্যধর্মের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তার কাছে স্থান ও কালভেদে মানুষের ভাব-ভাবনা ও জীবন-জীবিকায় যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা-ই এক এক স্থানিক গোত্র বা জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।[২০] তিনি মনে করেন সংস্কৃতির ধারা সচল রাখতে হলে সৃজনশীলতার সাথে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই। সাধারণ মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, তাদের উদ্ভাবন ক্ষমতা বা নতুনভাবে চিন্তা করার শক্তি নেই। এজন্য তারা গ্রহণশীল হয়েই সংস্কৃতিবান হয়। তিনি সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে মানসিক উৎকর্ষের দিকটির পাশাপাশি সংস্কৃতির ব্যাপকতর অর্থের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্যাকেই সংস্কৃতি হিসেবে বিচার করেছেন কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১)। তার মতে, কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তাদের জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার তাদের ভাষা-সাহিত্য-চিত্রকলা-সংগীত-নৃত্য ইত্যাদি মিলেই তাদের সংস্কৃতি।[২১] পাশাপাশি তিনি এটাও মনে করেন যে, সংস্কৃতির সব উপাদান সর্বদা সমান গুরুত্বপূর্ণ কিংবা সমান প্রভাব বিস্তারকারী হয় না। কোনো একটি বা বিশেষ কয়েকটি উপাদান কোনো কোনো সময়ে অন্যান্য উপাদানগুলোর চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সার্বিক সংস্কৃতি বিনির্মাণে তা মুখ্য ভূমিকা রাখে।[২২]

বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১) বিগত চার দশক কালের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> সংস্কৃতি কি? এ নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক সম্ভব হলেও এর স্বরূপ উপলব্ধির সহজ উপায় সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সেগুলির প্রতি লক্ষ্যপাত করা। যেমন, আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত-নৃত্য, সাহিত্য-নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি। এগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, এগুলি নিত্যকার জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত জীবন উপভোগের ব্যবস্থা এবং উপকরণের সাথে জড়িত। কোনো জাতির অথবা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলতে এ জন্যে তার সামগ্রিক আর্থিক জীবন থেকে শুরু করে ললিতকলা এবং শিষ্টাচার পর্যন্ত সব কিছুই বোঝায়। অর্থাৎ সেই দেশ এবং জাতির অন্তর্গত মানুষের জীবনযাপন ও জীবন উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনই এর অন্তর্গত। কোনো একটি লোকের সংস্কৃতি কী, একথা বোঝার জন্য তাই প্রয়োজন তার আর্থিক জীবন, ভাষা, শিক্ষা, রুচি ইত্যাদি সব কিছুরই সাথে ওয়াকিফহাল হওয়া।[২৩]

প্রায় একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০)। তার মতে, "সংস্কৃতি বলতে মুখ্যত দুটো ব্যাপার বুঝায় : বস্তুগত সংস্কৃতি আর মানস সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, আহার-বিহার, জীবনযাপন প্রণালি এসব বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আর সাহিত্যে-দর্শনে-শিল্পে-

সঙ্গীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে বলা যায় মানস সংস্কৃতি। বস্তুগত আর মানস সংস্কৃতি মিলেই কোনো দেশের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে।"[২৪]

সংস্কৃতির বস্তুগত আর ভাবগত দিকের ওপর যতীন সরকারও (জন্ম ১৯৩৮) গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন:

> সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিহার্য যোগ হলো অনুশীলনের। সামাজিক মানুষ যুগ যুগ ধরে অনুশীলনের সাহায্যে বাইরের প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করে যে কৃতির সঞ্চয় ঘটিয়েছে, তার সেই সম্যক কৃতিই সংস্কৃতি। না, শুধু বাইরের প্রকৃতিতেই নয়, মানুষ তার নিজের ভেতরেও যে পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটিয়ে চলেছে ও চলছে, তা-ও সংস্কৃতি। মানুষের সম্যক কৃতি বা সংস্কৃতির যেমন বস্তুগত রূপ আছে। তেমনি আছে তার ভাবগত রূপ। ... মানুষে মানুষে বিচিত্র সম্পর্ক, বিচিত্র সব ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান সব নিয়েই মানুষের সংস্কৃতি। মানুষের দৈহিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট কৃতির মতো বুদ্ধিগত উৎকর্ষের ফসলও সংস্কৃতি। বিজ্ঞান, দর্শন, নৃ-তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, এরকম সব মানুষিক কৃতি দিয়েই গঠিত মানুষের সংস্কৃতি। গান-বাজনা-নাচ-অভিনয়-চিত্রকলা কিংবা সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত মানুষের যে শৈল্পিক কৃতি তার সব তো অবশ্যই সংস্কৃতি।[২৫]

তার মতে, বস্তুগত অর্জন ও বুদ্ধিগত অনুশীলনকে উপেক্ষা করে ভাবগত সংস্কৃতিকে যখন সংস্কৃতির একমাত্র এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয় তখনই গভীর ও ব্যাপক ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই ভ্রান্তিজনিত বোধই মানুষের বস্তুগত অর্জনকে যেমন সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকৃতি জানাতে অস্বীকৃত হয়, তেমনি কোনো মননশীল আলোচনা অনুষ্ঠানকেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না। কেবল গান-নাচ-অভিনয়কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শিরোপা দিয়ে মানবিক সংস্কৃতিকেই একান্তভাবে খণ্ডিত ও সংকীর্ণ করে ফেলে।[২৬]

আবুল কাসেম ফজলুল হকও (জন্ম ১৯৪৪) সংস্কৃতিকে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন। তিনি মনে করেন কেবল নাচ-গান ও শিল্প-সাহিত্যকে অনেকে সংস্কৃতি বলে মনে করলেও তা ঠিক নয়। নাচ-গান ও শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যতম বাহন মাত্র, সংস্কৃতি নয়। মানুষের সকল প্রকার চিন্তা, কর্ম ও সৃষ্টিকেই সংস্কৃতির বাহন বলে মনে করেন তিনি। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক দল ইত্যাদি শব্দের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির যে রূপ প্রকাশ পায় তা অনুভূতি নির্ভর ভাসা-ভাসা রূপ মাত্র–সমগ্র রূপ নয়। তার মতে, 'নাচ-গান ও শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যেমন তেমনি দর্শন বিজ্ঞান-ইতিহাস, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিন্তা ও চেষ্টা এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক-সামাজিক জীবনযাত্রার সকল চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সব কিছুর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় ব্যক্তির ও সমষ্টির সংস্কৃতি।[২৭] সংস্কৃতির সজ্ঞায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> সংস্কৃতি হল জীবনের ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনের ও উন্নতি বিধানের এবং ইচ্ছানুযায়ী ইতিহাসের গতি নির্ধারণের চিন্তা ও চেষ্টা। ... জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষের নিজেকে এবং নিজের সঙ্গে পরিবেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত করার যে প্রবণতা, চিন্তা ও চেষ্টা লক্ষ করা যায়, তারই মধ্যে নিহিত থাকে তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে রুচি, পছন্দ, দৃষ্টি, শ্রুতি, চিন্তাশক্তি, শ্রমশক্তি, সমাজবোধ, আহার্য, ব্যবহার্য, পরিপার্শ্ব, বিবেক-বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিচারক্ষমতা, গ্রহণ-বর্জন ও প্রয়াস-প্রচেষ্টার। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ও যূথের কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয় ও পরিবেশের সংস্কার, রূপান্তর ও নবজন্ম ঘটে। কোনো ব্যক্তির কিংবা জনগোষ্ঠীর উৎপাদনসামর্থ্য, সৃষ্টিসামর্থ্য, ন্যায়নিষ্ঠা, কল্যাণ চেতনা, সত্যপ্রিয়তা, সৌন্দর্যবুদ্ধি এবং উন্নত ভবিষ্যৎ সৃষ্টির চিন্তা ও চেষ্টা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তির কিংবা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।[২৮]

বাংলা ভাষায় আজ আমরা যে ধারণাটিকে সংস্কৃতি কথাটি দ্বারা ব্যক্ত করি, মূলে সেই ধারণাটির রূপ কী ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন বিষয়ক চিন্তা থেকে তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীসময়ে এই বিষয়ক চিন্তার অনেক বিবর্তন হয়েছে। তবে আমাদের দেশে সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন বা বর্তমানে করছেন তাদের চিন্তা অতীতের চিন্তার সঙ্গে যোগসূত্রহীন নয়। তারা সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সংস্কৃতিকে কোনো খণ্ডিত বা সংকীর্ণ ধারণার মধ্যে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নন তারা। তাই সংস্কৃতি যে আসলে সামগ্রিক জীবনযাত্রার রূপ এবং তার ভাবগত এবং বস্তুগত দুটি দিকই রয়েছে, সেই সত্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। সার্বিকভাবে সংস্কৃতি বলতে একটা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন চর্চাকে বোঝায়। একটি জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ এবং সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের আয়োজনের সামগ্রিক রূপ হল সংস্কৃতি। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, নান্দনিক যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের সবকিছু নিয়েই মানুষের সংস্কৃতি চর্চা বিকশিত হয়। মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই তার সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। কাজেই কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে এবং সাংস্কৃতিক প্রবণতার পরিচয় লাভ করতে হলে সেই ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সমস্ত কর্মকাণ্ডই বিচার করতে হবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে সংস্কৃতিকে এই ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সাংস্কৃতিক আন্দোলন

সাধারণ অর্থে কোনো পরিকল্পিত, লক্ষ্যনির্ভর এবং বহুলোকের অংশগ্রহণ ভিত্তিজাত কোনো ঘটনাকে আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করা হয়। যৌথ কর্মকাণ্ড কিছুটা সময় টিকে থাকলে তা আন্দোলনে রূপ নেয় তবে ঐ যৌথ কর্মকাণ্ড সংহত এবং সংগঠিত কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে।[২৯] আবার যদি তা বেশ কিছু লোকের মনে সচেতনতা ও কৌতূহল জাগাতে পারে, তাহলে তাকে আমরা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আন্দোলনের মূল ভিত্তি বহুলোকের অংশগ্রহণ তবে আকস্মিক ঘটনাজাত কোনো প্রতিক্রিয়া আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পায় না।[৩০] একটি সামাজিক আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন তার লক্ষ্য থাকে বিদ্যমান মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, ব্যবস্থার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন। তবে একই সময় এর বিপরীতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যেও প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে।[৩১] বিভিন্ন কারণে একজন ব্যক্তি সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে যৌক্তিক বিশ্বাস অথবা আবেগের কারণেও কেউ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আবার নিছক সুবিধাবাদও আন্দোলনে ব্যক্তির অংশগ্রহণের পেছনে কারণ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নেতার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েও অংশগ্রহণকারীরা আন্দোলনে যোগ দিতে পারে।[৩২]

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও লক্ষ্য থাকে বিদ্যমান মূল্যবোধ, ধ্যানধারণার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনসাধারণের চিন্তাধারা এবং রুচি, পছন্দ ও প্রবণতা পরিবর্তনের আন্দোলনই হল সাংস্কৃতিক আন্দোলন।[৩৩] অন্যান্য আন্দোলনের মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও মূল ভিত্তি বহুলোকের অংশগ্রহণ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনও আবেগজাত এবং তা স্থিতাবস্থা ভাঙার জন্য করা হতে পারে। একই সময় এর বিপরীতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রতিরোধও গড়ে উঠতে পারে। তবে জনসাধারণের চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি ও প্রজ্ঞার পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যেতে পারে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলো উন্নত জীবন পদ্ধতি, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনগণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আন্দোলন। তবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্থান ও কাল বিশেষে প্রগতিশীল, রক্ষণশীল, অপ্রক্রিয়াশীল প্রভৃতি প্রকৃতির হতে পারে।

গ. সাংস্কৃতিক সংগঠন

একটি সংস্কৃতিবান জনসমষ্টি যখন আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে সংস্কৃতিপ্রবণ করে তোলার লক্ষ্যে একতাবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন তখন সেই সংগঠনকে সাংস্কৃতিক সংগঠন বলে অভিহিত করা যায়।[৩৪] কিন্তু এক্ষেত্রে কারা সংস্কৃতিবান মানুষ এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । কারণ সমাজের একদল মানুষ যাকে সংস্কৃতিবান বলে অভিহিত করেন অপরদল তাকে গোঁড়া কিংবা চরমপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন। কালচারড বা সংস্কৃতিবান মানুষ সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখেছেন, "শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়, উপায়। উদ্দেশ্য নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে, সেই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়। ... কালচার্ড লোকেরা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে; অন্যায় নিষ্ঠুরতাকে তো বটেই ন্যায়-নিষ্ঠুরতাকেও।"[৩৫] তবে সংস্কৃতিবান মানুষ সম্পর্কে একমত হওয়া গেলেও এই গুণে গুণান্বিত জনসমষ্টি জোগাড় করে সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগকে দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করেছেন রেজোয়ান সিদ্দিকী।[৩৬] এক্ষেত্রে বিনয় ঘোষের বক্তব্য, "একই পণ্যের দুই ব্যবসায়ী যেমন নিজের পণ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত থাকেন, মস্তিকের কীর্তির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিযোগীর সেই হীন আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রকাশের ব্যস্ততা সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে।"[৩৭] কিন্তু বহু মত পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নিয়েও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। কারণ সামাজিক সংঘাতের তীব্রতার মধ্যেই সভা-সমিতির বিকাশ ঘটে।[৩৮] সাংস্কৃতিক সংগঠনের মূল কাজ মানুষের সংস্কৃতিমনস্কতা বাড়িয়ে দিয়ে তার চেতনা স্তরের বিকাশ ঘটানো। রুচি ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে পরিশীলতা এনে জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটানোও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজ। আর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক সংগঠন হয়ে ওঠে প্রগতির বাহন।[৩৯]

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো যেমন মানুষের মনের মুক্তি ঘটায় অন্যদিকে তেমনি একটি জনগোষ্ঠীর মানসের রূপান্তর সাধন করে এবং চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে জনমনের মুক্তি সাধন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা মত ও পথের হতে পারে। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এই পর্বে যেমন বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক তথা প্রগতিশীল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে তেমনি রক্ষণশীল বা পাকিস্তানমনস্ক বিভিন্ন ধারার সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

ঘ. সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পৃক্ততা

সংস্কৃতি একান্তভাবেই সমাজনির্ভর। আর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সবকিছু অর্থনীতি ও রাজনীতির সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই বলা যায় সংস্কৃতি ও রাজনীতি পরস্পর পরিপূরক। মার্কসীয় চিন্তাবিদ লুকাচ (Georg Lukacs) এর মতে, "সংস্কৃতিই হচ্ছে মূল লক্ষ্য, রাজনীতি সে-লক্ষ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র।"[৪০] রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। কিন্তু সংস্কৃতিতে সংগ্রাম অনেকটা পরোক্ষ বলে এর রূপ সর্বদা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। রাজনৈতিক সংগ্রাম যেমন সমাজের নায়কত্ব লাভের সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক সংগ্রামও অনেকটা তাই কিংবা তার চেয়েও ব্যাপক ও গভীর।[৪১] সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে পরিবর্তনের ফলে যেমন সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তেমনি সামাজিক পরিবর্তনের অনুষঙ্গী রূপেই ঘটে রাজনীতির পরিবর্তন সাথে সংস্কৃতিরও। এই পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রয়াসটিই সংগ্রাম। তাই সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন-প্রয়াস তারই নাম সাংস্কৃতিক সংগ্রাম।[৪২]

রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেখানেই সমাজ পরিবর্তনের অধ্যায় রচিত হয়, সেখানে সংস্কৃতির সংগ্রাম অনিবার্য। সংস্কৃতির সংগ্রামের কাজ হলো রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ পরিষ্কার করা।[৪৩] সংস্কৃতি ও রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যতীন সরকার মন্তব্য করেছেন:

> সংস্কৃতি যখন রাজনীতির অধীন হয়ে যায়, তখনই রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের প্রসার ঘটে। আর সংস্কৃতি যখন রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, রাজনীতি তখন সঠিক পথ চলতে বাধ্য হয়। তবে রাজনীতিকে সঠিক পথে চালাবে যে সংস্কৃতি, তাকে অবশ্যই প্রকৃত সংস্কৃতি হতে হবে। সংস্কৃতির ছদ্মবেশ ধরে অপসংস্কৃতি অনেক সময়েই প্রবল প্রতাপ বিস্তার করে বসে। সেই অপসংস্কৃতির ঘাড়ে ভর করেই অপরাজনীতি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। অপসংস্কৃতি-অপরাজনীতির সম্মিলিত শক্তি মানুষকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, বর্ণবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ এসবই অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতির উপজাত। কেবল রাজনীতি দিয়েই এসব দানবের মোকাবেলা করা যায় না। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন সুস্থ সংস্কৃতি। অপ-সংস্কৃতি যেমন অপরাজনীতির পৃষ্ঠপোষক, তেমনি সুস্থ সংস্কৃতি থেকেই বেরিয়ে আসে সুস্থ রাজনীতি।[৪৪]

তাছাড়া বিশ্বের সব বড় রাজনৈতিক ঘটনাই ঘটেছে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মনোজগতে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটার পর। ফরাসি বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের মতো বিশ্ব আলোড়নকারী ঘটনার ক্ষেত্রে এটি যেমন সত্য তেমনি বিভিন্ন জাতির জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ছোট বড় ব্যাপারেও তা সত্য। সত্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও।[৪৫] বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন অন্যতম মাইলফলক। এটি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কিন্তু পরবর্তীকালে এর সাথে রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়েছে। তখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

ভাষা আন্দোলন থেকে সূচিত হয়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ধাপে ধাপে সংস্কৃতি চেতনার যে বিস্তার ঘটেছিল, সে চেতনাই এ ভূখণ্ডের মানুষকে পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্ত করে তোলে। পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল, একে অন্যকে প্রেরণা যুগিয়েছে সব সময়। তাই একটা সময় দেখা যায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। সংস্কৃতিকর্মীরা মানুষের সংস্কৃতিবোধ, চিন্তা, তাদের সত্তা, অস্তিত্ব যে সংকটের সম্মুখীন এ বিষয়টি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। পরে রাজনৈতিক কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই দেখা যায়, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন একীভূত হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতির নিবিড় সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ওয়াহিদুল হক বলেছেন, "বাংলায় রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ কেটেছিল সাংস্কৃতিক জাগরণ।"[৪৬] তিনি লিখেছেন, "যে মানুষই তখন সংস্কৃতি কর্ম করেছে-বাংলায় লিখেছে বলেছে, গেয়েছে বাঙালীর কথা বাংলার কথা, যে মানুষই এঁকেছে অভিনয়-আবৃত্তি করেছে মূর্তি গড়েছে বাংলার বাঙালীর সে এ দেশের পক্ষে এক দুর্বার রাজনীতি করেছে। যে রাজনৈতিক লড়াই লড়েছে সে সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াই লড়েছে, কেবলই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নয়।"[৪৭] তার মতে, পাকিস্তানি সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র বাঙালির একটা পাষাণ প্রাকারে এসে বাধা পায়, পরাস্ত হয়। বাঙালির যত ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই নিরাকরণ হয় একটি মাত্র ধারণার দ্বারা আর তা হল সংস্কৃতি।[৪৮]

তবে বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ কেবল একটিমাত্র খাত ধরে প্রবাহিত হয়নি। ভাষা আন্দোলনকে মূল নদী হিসেবে ধরলে পরবর্তীকালে নানা শাখা নদী বেরিয়েছে, অনেক উপনদী এসে যুক্ত হয়েছে তাতে। ওয়াহিদুল হক বাঙালির সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মূল প্রতিজ্ঞাগুলোকে কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত করেছেন:

এক. বাংলা ভাষার অবিভাজ্যতা ও সর্বজনীনতা

দুই. বাঙালি সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা

তিন. সাম্প্রদায়িকতার বিদূরণ, গণতন্ত্রের বিকাশ

চার. এই সমস্ত কিছুর সার্থক সম্পাদনের অস্ত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার

পাঁচ. এই সমস্ত সাধনের পথে পাকিস্তান কাঁটা দিলে পাকিস্তানকে প্রতিরোধ ও প্রয়োজনে অস্বীকার।[৪৯]

এভাবেই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন ভিন্নমাত্রা লাভ করে। এখানে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিছক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না, সব সময় প্রগতির পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। তাই সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন, "সে সময়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি এতদুভয়ের হয়তো বিচ্ছিন্নতা ঘটে না কখনো।"[৫০]

প্রকৃতপক্ষে একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী তখন শুধু তার সৃজনশীলতা নিয়েই ব্যস্ত থাকেননি, তিনি আন্দোলনের সাথেও সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাই একসময় সংস্কৃতি ও রাজনীতির সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা মিলিয়ে গিয়েছে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন, "সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্র: তিনটির মালমশলা মানুষ, আর মানুষ জীবন্ত, চঞ্চল, জটিল। এই মানুষটির ব্যক্তিক এবং পারস্পরিক ভূমিকা নির্ধারিত হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিসরে। সংস্কৃতির মধ্যে এই ভূমিকা কর্মস্থল খুঁজে পায়। সেজন্য সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সামাজিক, রাষ্ট্রিক বিচার, সেজন্য ব্যক্তিক সাংস্কৃতিক ভূমিকা ও বিচার সামাজিক, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির পরিসরে।"[৫১] মূলত প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের নিরলস প্রয়াসে পূর্ব বাংলায় প্রগতিশীল সংস্কৃতি চেতনার জন্ম হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আর সে আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধ আপাতদৃষ্টিতে একটি রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনা হলেও এর মূল উৎস সাংস্কৃতিক।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কিছু চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে কোনো তাৎক্ষণিক ও আশু লক্ষ্যকে সামনে রেখে। রাজনৈতিক দলগুলোর মূল লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। অপরদিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মসূচিতে তাৎক্ষণিক কোনো সমস্যা সম্পর্কীয় বিবেচনা কখনো কখনো প্রাধান্য পেলেও তার মূল লক্ষ্য থাকে চিরন্তনতার ব্যাঞ্জনা।[৫২] তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়, চিরন্তন মানবিকতাই সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এই মানবিকতাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ও কর্মসূচিকে নির্ধারণ করে দেয়।[৫৩]

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এই চরিত্রগত পার্থক্য থাকলেও মূলত এটি পরস্পরের পরিপূরক। তাই সংস্কৃতিই হবে মূল লক্ষ্য এবং রাজনীতি হবে সেই লক্ষ্য সাধনের অনেক উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র। এই নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হলেই সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে শুদ্ধতা আসে।[৫৪]

৬. সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৫২-১৯৭১): তাত্ত্বিক কাঠামো

আন্দোলন কেন হয়, কখন হয়? কখন একটি জনগোষ্ঠী সমষ্টিগত প্রতিরোধ গড়ে তোলে? কোন পরিস্থিতিতে তাদের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে? কোন প্রেক্ষাপটে প্রতিরোধের প্রচণ্ডতার তারতম্য দেখা যায়? এই প্রশ্নগুলো সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক যে কোনো ধরনের আন্দোলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে বের করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং রচিত হয়েছে অসংখ্য যুক্তি ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাকর্ম। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী Ted Robert Gurr *Why Men Rebel* গ্রন্থে গণবিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে অভিমত দেন। তার মূল বক্তব্য :[৫৫]

Intrusion অভিঘাত	Cultural cores (মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ) Relative Deprivation (আপেক্ষিক বঞ্চনা)	High intensity of collective violence (সমষ্টিগত প্রতিরোধের উচ্চ সম্ভাবনা)
Intrusion অভিঘাত	Cultural peripherals (প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ) Relative Deprivation (আপেক্ষিক বঞ্চনা)	Low intensity of collective violence (সমষ্টিগত প্রতিরোধের মৃদু সম্ভাবনা)

অর্থাৎ দেখা যায়, দু'ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমাজে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের সূচনা হতে পারে। প্রথমত, বাইরের কোনো শোষণকারী শক্তির নীতি ও কর্মকাণ্ডের ফলে সেই সমাজের মৌল সংস্কৃতির উপাদানসমূহের ওপর অভিঘাত এলে প্রচণ্ড রকমের সমষ্টিগত প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে। একটি জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব যে সকল উপাদানসমূহের উপর নির্ভর করে সেই উপাদানসমূহকে মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলা যায়। দ্বিতীয়ত, কোনো জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও প্রতিরোধ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে প্রতিরোধ হবে তা হয়তো খুব তীব্র বা তুলনামূলকভাবে খুব ব্যাপক হবে না, বা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে গোটা জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে আলোড়িত করে একটি মৌল পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে না। প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যেগুলোর প্রকৃতি শোষণমূলক প্রক্রিয়ার কারণে বিকৃত হলে একটি জনগোষ্ঠীর চেতনালোক বিক্ষুব্ধ হয় কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সৃষ্টিতে একটি অভিন্ন উপাদান হিসেবে আপেক্ষিক বঞ্চনা (Relative Deprivation) সক্রিয় থাকে। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বা শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় পরাধীন ও শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বঞ্চনার চেতনা গড়ে ওঠে। যখন গণমানসে সাংস্কৃতিক উপাদানভিত্তিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অধিকারের মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয় এবং তা যদি ক্রমেই বেড়ে চলে তাহলে আপেক্ষিক বঞ্চনার সৃষ্টি হয়।[৫৬]

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে ১৯৫২-১৯৭১ সালে সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে টেড রবার্ট গারের তত্ত্বটির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসতে থাকে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী শোষণ আর নির্যাতনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মাতৃভাষার উপর আঘাত হানলে এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রবল সমষ্টিগত প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। টেড রবার্ট গারের তত্ত্ব অনুযায়ী যখনই একটি সমাজের মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর আঘাত আসে তখনই সমষ্টিগত প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্রমে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হয়। অপরদিকে পাকিস্তানবাদী সরকার বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ বা অগ্রগতি রোধ করতে সরকারি বেসরকারি নানামাত্রিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। পঞ্চাশের দশকের শেষে সামরিক শাসন জারি হলে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত আরো প্রকট হয়। স্বৈরশাসনের মাধ্যমে সরকার পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত ও নানাভাবে বিকৃতির অপচেষ্টা চালায়। এর

মধ্যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা, বাংলা হরফের পরিবর্তে আরবি ও রোমান হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র, রবীন্দ্র বিরোধিতা, নজরুল সাহিত্য বিকৃতি, প্রগতিশীল শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং সংগঠনের কাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানের উপর আঘাতের প্রতিবাদে শুরু হয় প্রতিরোধ। তবে এই সাংস্কৃতিক অবদমনের পেছনে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্যবাদও সক্রিয় ছিল। এই পরিস্থিতিতে জনমনে আপেক্ষিক বঞ্চনার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতারিত ও নিষ্পেষিত হওয়ার বোধ থেকে জনগণের সুপ্ত ক্ষোভ প্রকাশ্য রূপ নিতে থাকে। আর তখনই শুরু হয় প্রচণ্ডতম সমষ্টিগত প্রতিরোধ যা শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়।

নারীর ইতিহাস রচনার তত্ত্বগত কাঠামো

আদিম যুগের যাযাবর জনগোষ্ঠী যখন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচলন হয় তখন থেকেই নারীরা পুরুষের অধস্তন হয়ে গৃহে আবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করে।[৫৭] ফলে নারীরা সমাজের কেন্দ্র ও অগ্রাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাধারণভাবে নারীর অনুৎপাদনশীল গৃহস্থালির কাজকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। নারীর গৃহস্থালির কাজে কোনো উপার্জন হয় না বিধায় অর্থনৈতিকভাবে নারীকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতা যখন পুরুষের হাতে থাকে তখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতাও পুরুষের কুক্ষিগত হয় এবং নারী সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের অধীন হয়ে যায়। একপর্যায়ে এই অধস্তন অবস্থানে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।[৫৮]

নারীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে আমেরিকা ও ইউরোপে নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও নারী জাগরণের সূচনা হয়েছে। সারা পৃথিবীর নারীসমাজ আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে পুরুষের সমঅধিকার দাবি করছে। ১৯৬০-এর দশকে নারীবাদ কথাটিকে কিছুটা নারী মুক্তির অর্থে ব্যবহার করা হতে থাকে। তবে পর্যায়ক্রমে নারীবাদী ধ্যান-ধারণা বিকাশের সময়ে নারীবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব হয়। তত্ত্বসমূহের মধ্যে উদারনৈতিক নারীবাদ, মার্ক্সীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, বৈপ্লবিক নারীবাদ, অস্তিত্ববাদী নারীবাদ, সাংস্কৃতিক নারীবাদ, পরিবেশ নারীবাদ এবং উত্তরাধুনিক নারীবাদ উল্লেখযোগ্য। নারীবাদ এবং নারীবাদী তত্ত্বসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না বিধায় বর্তমান আলোচনায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৫৯]

নারীবাদের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সবাই একমত পোষণ করে। এই বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকে কীভাবে অবমূল্যায়ন করে তা অনুধাবনে অতীতকে সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা এবং সমাজে নারীর অবদানকে সুনির্দিষ্ট করে নারীর মূল্যায়ন করা। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যগত দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও সেই একই প্রভাব ক্রিয়াশীল। সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি ঠিক করে দেয়, নারী কী ভূমিকা পালন করবে। নারী সেই সীমা ও গণ্ডি অতিক্রম করে উত্তরোত্তর নতুন নতুন ভূমিকা পালন করলেও তা স্বীকার করা হয় না।[৬০]

নারীর ইতিহাস রচনার তত্ত্বগত কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে গিয়ে তাই জোন কেলি বলেছেন, "নারীর ইতিহাস প্রত্যয়টির দুটো লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে"। এগুলো হল:

১. ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় নারীকে নিয়ে আসা।

২.আমাদের ইতিহাস রচনাকে নারীর কাছে নিয়ে যাওয়া।[৬১]

এছাড়া ঐতিহাসিক চিন্তার তিনটি মৌলিক বিষয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:

১. ঐতিহাসিক কাল বিভাজন

২. সামাজিক বিশ্লেষণের পর্ব

৩. সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব[৬২]

কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিরাজমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে নারী বঞ্চিত থাকার কারণে একই ঐতিহাসিক ঘটনা পুরুষের অগ্রগতি সাধন করলেও নারীর ওপর ভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে। তাই এই বিষয়ে জোন কেলির বক্তব্য:

> বিভিন্ন সময়কাল অথবা বিরাট ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সাধনকারী আন্দোলনগুলোকে দেখতে হবে নারীর স্বাধীনতা ও নিপীড়নের আলোকে এবং নারীর মানবতার অগ্রগতির স্বার্থে পুরুষের জন্যও সেসব কাজ ও আন্দোলন কী বয়ে এনেছে, তার আলোকে। যে মুহূর্তে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে সেই মুহূর্তে মানুষ উপলব্ধি করবে যে নারী সম্পূর্ণ অর্থেই মানবতার অংশ। সেই সময়কাল অথবা ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এবং ভিন্ন অর্থের ধারক ও বাহক ছিল।[৬৩]

সামাজিক বিশ্লেষণের পর্ব বিষয়ে জোন কেলির বক্তব্য সাধারণভাবে সামাজিকীকরণের ফলে নারী নিজ শ্রেণির পুরুষের আগ্রহ ও মতাদর্শকে লালন এবং অনুসরণ করলেও, সামাজিক শ্রেণি হিসেবে নারী সেই অবস্থান থেকেও এগিয়ে যায়। তাই নারীর অবস্থান বিচারে নারীকে নারী হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে। যে কোনো শ্রেণি, বর্ণ, সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর বিপরীত শ্রেণি, বর্ণ বা গোষ্ঠী হিসেবে নারীকে চিহ্নিত করলে চলবে না। বরং নারীকে দেখতে হবে পুরুষের বিপরীতে সংখ্যাগুরু সামাজিক মানুষ হিসেবে। প্রাকৃতিক শারীরিক বিভাজন নারীর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ও পুরুষের অধস্তনতা ও অধীনতা তৈরি করে না। নারীর ভূমিকা সামাজিকভাবেই নির্ধারিত, গঠিত এবং আরোপিত হয়। আর এই ভিত্তিতেই নারী-পুরুষের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা এবং পারস্পরিক সম্পর্কগুলো স্বীকৃত হয়।[৬৪]

সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে জোন কেলি বলেছেন, কাজের ক্ষেত্রে ঘর-গার্হস্থ্য জগৎ এবং বাইরের জগতের মধ্যে নারী ও পুরুষের ভূমিকা বিষয়ে সীমারেখা টেনে দেয়া হয়। এটাই হল পিতৃতন্ত্র। এর উত্তরণ ঘটাতে হলে সমাজ পরিবর্তনের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। সেটা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের যেমন কর্তব্য, তেমনি ব্যক্তি পুরুষ ও নারী নিজেদেরও দায়িত্ব।[৬৫]

নারীবাদী ইতিহাস রচনার এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণ করেই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। **১৯৫২-১৯৭১** পর্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর প্রকৃত ভূমিকা ইতিহাসের বিস্মৃতি থেকে ও অদৃশ্য অবস্থান থেকে দৃশ্যমান করে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নারীর সামগ্রিক ভূমিকা কীভাবে অনুপস্থিত থাকে তা নির্ণয় করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। যুগ যুগ ধরে নারীর জন্য যে লিঙ্গীয় সামাজিকীকরণ এবং সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছে এর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর সংগ্রাম বিকাশ লাভ করেছে। বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর বিকশিত হয়ে ওঠা এবং মানুষ হিসেবে ভূমিকা পালনের কথা সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষের একটি বৃহৎ অংশ ভাবতেই পারেনি।[৬৬] কেউ কেউ ভাবলেও তাদের সেই ভাবনাকে নারীর ব্যতিক্রমী পরিচয় হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমী নারীদেরও যথার্থ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তাই ইতিহাসের ক্ষেত্রেও নারীবাদী জ্ঞানচর্চার উদ্ভব

ঘটেছে, যা কিনা প্রধানত নারীর মর্যাদার ওপর দৃষ্টি দেবে।[৬৭] এজন্য বর্তমান গবেষণায় নারীকে শুধু নারী হিসেবে নয়, মানব সমাজের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৯৫, পৃ. ৫৯১।

২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে*, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ৪৯।

৩. উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

৪. *প্রাগুক্ত*।

৫. গোপাল হালদার, *বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ*, কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৩৬৩, পৃ. ২-৩।

৬. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

৮. নীহাররঞ্জন রায়, *কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি*, কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯, পৃ. ১৭।

৯. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪, পৃ. ৩১।

১০. *প্রাগুক্ত*।

১১. মোতাহার হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ২৭।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

১৩. *ঐ*।

১৪. আবুল ফজল, 'সংস্কৃতি', মাহবুবুল হক (সম্পা.), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ আবুল ফজল*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ১৬২।

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮।

১৬. *ঐ*, পৃ. ১৫৯।

১৭. আবুল ফজল, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', মাহবুবুল হক (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১।

১৮. উদ্ধৃত, আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২।

১৯. আহমদ শরীফ, 'সাহিত্যে রূপপ্রতীক', *বিচিত চিন্তা*, ঢাকা: চৌধুরী পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৮, পৃ. ১৮।

২০. আহমদ শরীফ, 'আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

২১. কবীর চৌধুরী, 'বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সংকট: কৃত্রিম সমস্যা', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা: ১৯৯৩, পৃ. ৩৯৬।

২২. কবীর চৌধুরী, 'সংস্কৃতি ধর্ম সুশীল সমাজ', *প্রবন্ধ সমগ্র*-৩, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬, পৃ. ১৩৯-১৪০।

২৩. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সঙ্কট*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৪, পৃ. ২৭-২৮।

২৪. আনিসুজ্জামান, 'সংস্কৃতি কথা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

২৫. যতীন সরকার, *সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১১।

২৬. *প্রাগুক্ত*।

২৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজ কথা*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৮, পৃ. ৩৬-৩৭।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬।

২৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪, পৃ. ১৪০।

৩০. *প্রাগুক্ত*।

৩১. M. S. A Rao, 'Conceptual Problems in the Study of Social Movements', M. S. A Rao (ed.), *Social Movements in India*, vol. I, New Delhi, 1978, p. 2, উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*।

৩২. Rudolf Heberle, 'Types and Functions of Social Movements', IESS, vol. xiii & xiv, p. 440.

৩৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজকথা*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৮, পৃ. ৩৭।

৩৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০৬, পৃ. ২২।

৩৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি-কথা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭০, পৃ. ১-২।

৩৬. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

৩৭. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৮৭, পৃ. ১২৭।

৩৮. *প্রাগুক্ত*।

৩৯. জুলফিকার মতিন, 'বিকল্পহীন কাজ', সম্মেলন *স্মরণিকা*, উদীচী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩।

৪০. যতীন সরকার, 'রণেশ-চরিতামৃত: স্মৃতির স্বর্ণপাত্রে', সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা.), *রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ১৬৫।

৪১. যতীন সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।

৪২. *ঐ*।

৪৩. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১১, পৃ. ২৯।

৪৪. যতীন সরকার, *সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৬০।

৪৫. *প্রাগুক্ত*।

৪৬. ওয়াহিদুল হক, 'মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম', লোকবক্তৃতা মালা-৭, গাজীপুর: মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৮।

৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

৪৮. *ঐ*, পৃ. ২১।

৪৯. *ঐ*. পৃ. ২০-২১।

৫০. সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, ঢাকা: অনন্যা, ২০০১, পৃ. ১৪।

৫১. উদ্বৃত, রোজিনা কাদের, *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০৪, পৃ. ১৫৫।

৫২. যতীন সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।

৫৩. *প্রাগুক্ত*।

৫৪. *ঐ*।

৫৫. Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, New Jersey: Princetion University Press, 1970; উদ্ধৃত, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৪।

৫৬. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

৫৭. সপ্তারী রায় মুখার্জী, 'নারীবাদী আন্দোলন', রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, কলকাতা: উর্বী প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৬৩।

৫৮. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৭৫, পৃ. ৫।

৫৯. নারীবাদ কী, এর উৎপত্তি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Rosemary Tong, *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*, Boulder:Westview Press, 1989 ; Deidre Beddoe, *Discovering Women's History*, London: Pandora Press, 1983; Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy*, New York: Oxford University Press, 1986 ; Rosalind Miles, *The Women's History of the World*, London: Paladin Grafton Books, 1989; Joan Wallach Scott, *Feminism and History*, Oxford University Press, 1996.

৬০. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৫, পৃ. ২৩।

৬১. Joan kelly, 'The Social Relation of the Sexes: Methodological Implications of Women's History', *Women, History and Theory: The Essays of Joan Kelly*, Chicago: University of Chicago Press, 1986, উদ্ধৃত, সায়াদিয়া গুলরুখ এবং মানস চৌধুরী (সম্পা.), *কর্তার সংসার*, ঢাকা: রূপান্তর প্রকাশনা, ২০০০, পৃ. ৭১।

৬২. *প্রাগুক্ত*।

৬৩. *ঐ*, পৃ. ৭৪, উদ্ধৃত, মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

৬৪. *ঐ*, পৃ. ৭৬।

৬৫. *ঐ*, পৃ. ৮১।

৬৬. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬।

৬৭. *ঐ*, পৃ. ২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনে নারী

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভাষা আন্দোলন। ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক পর্যায়ে মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। কারণ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে শুধুমাত্র ভাষার দাবির বহিঃপ্রকাশ ছিল তা নয়, এর সাথে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও জড়িত ছিল। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি শাসকবর্গের এ অঞ্চলের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং পূর্ব বাংলা বিরোধী মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারী-পুরুষ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। সেই অনগ্রসর সমাজের সকল রক্ষণশীলতা অতিক্রম করে নারীরা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন প্রতিরোধ ও আন্দোলনের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে। অন্তরালে থাকা ভাষাকন্যাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানকে দৃষ্টিগোচর করাই বর্তমান অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: প্রথম পর্ব

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী শোষণ আর নির্যাতনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মাতৃভাষার উপর আঘাত হানলে এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন শুরু হয়। আর এই লক্ষ্য অর্জনের শুরু থেকেই নারীসমাজের সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং বিবৃতিতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করার প্রেক্ষাপটে এদেশের বহু নারী প্রতিবাদমুখর হয়ে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন।[১] যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্রী ও ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হামিদা রহমান কলকাতা থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা* পত্রিকায় ১০ জুলাই 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি পত্রে বাংলা ভাষার বিরোধিতাকারীদের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ জানান।[২] তার প্রতিবাদ লিপিতে ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষ করা যায়। তিনি লিখেছিলেন:

> বাঙালি হিসেবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দাবী করেছিলাম, তেমনি আজ বাংলাদেশের ভাষা হিসেবেও বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবী করব না কেন? পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় আজাদের পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখে খুবই দুঃখ হয়। ... আমাদের বাঙালির এতদিনের সাহিত্যকলা সবই কি আজ ভুলে যেতে হবে। কেমন করে আমরা ভুলে যাবো মাননীয় আকরাম খাঁয়ের লেখা কোরআনের তর্জমা, কেমন করে আমরা ভুলে যাবো তার মোস্তফা চরিত, কেমন করে আমরা ভুলবো আমাদের নজরুলের গান? এই সাহিত্য কি আবার উর্দুতে তর্জমা হবে। শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ কি আবার আমাদের জন্য তার কলম উর্দুর গন্ডিতে সীমাবদ্ধ করবেন। পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র। তাই তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা। বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে সে ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষা হবে না এও কি বিশ্বাস করতে হবে? স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার সাথে তাদের প্রাণের কোনো যোগও থাকবে না এও কি সত্য হবে?[৩]

এর কিছুদিন পরই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় তমদ্দুন মজলিশ। পরবর্তীসময়ে ২ সেপ্টেম্বর সিলেটে বাংলা ভাষার সমর্থকরা প্রথমে যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সেখানেও নারীর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। এই পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন জোবেদা খাতুন, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখ।[৪]

সেই সময় সারা দেশেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বহু আলোচনা, সভা সমিতি, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল এবং নারীরাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৫ অক্টোবর *আজাদ* পত্রিকার মহিলা মাহফিলে আয়েশা বেগমের ভাষা সমস্যা শিরোনামে আলোচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীসময়ে ১৩ নভেম্বর তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা প্রচলন করার সমর্থনে আয়োজিত সভায়ও নারীর অংশগ্রহণ ছিল।[৫] এই বিষয়ে ১৯৪৭ সালের ১৮ নভেম্বর *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়:

> ঢাকা ১৭ নভেম্বর। বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়ে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকট একখানি স্মারকপত্র দাখিল করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের শত শত নাগরিক এই স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং এদের মধ্যে সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, আইনজীবী, অধ্যাপক, ওলামা, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, মহিলা সকলেই আছেন। এই স্বাক্ষরকারী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপিকা মিসেস শামসুন্নাহার মাহমুদ, লীলা রায়, এম এ. (সম্পাদিকা জয়শ্রী), মিসেস আনওয়ারা চৌধুরী, বি.এ.বি.টি, সেক্রেটারী নিখিল বঙ্গ মোছলেম মহিলা সমিতি (ঢাকা), প্রমুখ।[৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন পত্রিকাতে বিবৃতি, আলাপ আলোচনা ও সভা সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৪৮ সালে এতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে সিলেটের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১১ জানুয়ারি পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুর রব নিশতার সিলেট সফরে যান। সেখানকার নারীদের একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। একই বছর ২২ ফেব্রুয়ারি সিলেট মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহের বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, সিলেট রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসী কাইসার রশীদ, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন, শামসুন্নেসা খাতুন ও অন্যান্য বিশিষ্টজন (নারী) পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের কাছে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।[৭] এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জোবেদা খাতুনের বিরুদ্ধে সিলেটের দৈনিক *ইস্টার্ন হেরাল্ড* পত্রিকা বিরূপ মন্তব্য করে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন বলেন:

> যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কু-পুত্র তুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন।...আমাদের বক্তব্য ছিল যে, উর্দু ভাষাভাষী অধিকসংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া পর্দানশীল মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্ভব। ফলে অল্পশিক্ষিতা নারী জাতি অশিক্ষিতা হইয়া যাইবেন এবং স্বামী-পুত্রের সহযোগিতা করিতে পারিবেন না।[৮]

তাদের স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম মহিলা লীগের সভানেত্রী জোবেদা খাতুনের কাছে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখেছিলেন, "আজ সত্যি আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ এবং অশেষ গৌরব অনুভব করছি, সিলেটের পুরুষরা যা পারে নি আপনারা (মহিলারা) তা করেছেন।"[৯]

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের

প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনার সময় গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্য খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন এই বিরোধিতার শীর্ষে। নাজিমউদ্দীনের সক্রিয় সমর্থনে এই বিলটিকে পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বিলটি বাতিল করা হয়।[১০] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী, ২৮ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর, পাবনা এবং মুন্সিগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট করেন এবং বিরাট মিছিল বের করেন। একই দিনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনে যে প্রতিনিধি দল যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হাজেরা মাহমুদ ও লায়লা আর্জুমান্দ বানু কলকাতায় এক বিবৃতি দিয়ে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করে খাজা নাজিমউদ্দীনের গণপরিষদের উক্তির প্রতিবাদ করেন।[১১]

পাকিস্তান মুসলিম লীগের তৎকালীন ভাষা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন সংগঠনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং তমদ্দুন মজলিশের যৌথ উদ্যোগে ২ মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কামরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের সাথে আনোয়ারা খাতুন[১২] এবং লিলি খান[১৩] উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে আনোয়ারা খাতুন ও লিলি খান উপস্থিত থেকে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ১৯৪৮ সালে যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তারও অন্যতম সদস্য ছিলেন লিলি খান এবং আনোয়ারা খাতুন।[১৪] ইতোমধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভায় ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা হয় গণপরিষদের সরকারি ভাষা তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাক টিকেটে বাংলা ব্যবহার না করা ও নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা রূপে ঘোষণা করার দাবিতে এই ধর্মঘট করা হবে। এই সাধারণ ধর্মঘট পালনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন নারীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের ছাত্রী উম্মে বতুল খালেদা খানমের নেতৃত্বে নারীদের একটি দল হাইকোর্টের সামনে গেলে তাদেরকে সশস্ত্র সৈন্যদল ঘিরে ফেলে। তখন খালেদা খানম গম্ভীরভাবে সেনাদের পথ ছেড়ে দিতে বললে সৈন্যরা পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তিনি তার দল নিয়ে এগিয়ে যান।[১৫] এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের নেত্রী বেগজাদী মাহমুদা নাসির বলেন:

> প্রথম দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের জায়গা ছিল প্রধান গেট। মেইন গেটে যারা ছিল সেদিন তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে নেই, কে কোথায় আছে, তাও আমাদের অজানা ছিল। মমতাজ বেগম, ইকোনোমিক্সে অনার্সে পড়তো মালেকা তারপরে ছিল সুলতানা রাজিয়া আরও কয়েকজন যারা স্মৃতিতে বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে অনার্সের ছাত্রী ছিল আফরোজা। এদিকে আমরা তিনজন-আমি, লিলি খান, খালেদা খানম হাইকোর্টের ভিতর গিয়ে প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এলিসের এজলাসে গিয়ে উপস্থিত। ... পরদিন সকাল সকাল মেয়েরা সবাই মেডিক্যাল কলেজের কোণায় চলে গেলাম।... ১৪৪ ধারা জারি থাকায় ওখানে আমরা পাঁচজন মেয়ে মাত্র ছিলাম। অন্য মেয়েরা ভেতরে ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ বোমা ফাটার মত একটা আওয়াজ শুনলাম। যখন আমরা নিজেদের দিকে তাকালাম তখন দেখি আমরা প্যারামিলিটারী গ্রুপের একটা অংশের ঘেরাওয়ের মধ্যে। আমরা দৌড়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনের গেটে চলে গেলাম। আমাদের ততক্ষণে চোখ মুখ দিয়ে পানি পড়ছে। মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা মগে করে পানি নিয়ে আমাদের চোখে মুখে ছিটাতে বলল। সেদিনের পিকেটিংয়ে যারা ছিলেন তাদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। বেঁচে নেই লুলু বিলকিস বানু, মেহেরুন্নিসা, আফরোজা হোসেন। মেডিক্যাল কলেজের গেটের ভেতরে অনেকেই ডিউটিতে ছিল,

ছিল লায়লা, সামসুন্নাহার, মমতাজ এবং আরও অনেকে। ঢাকায় এটাই ছিল মেয়েদের প্রথম আন্দোলন।[১৬]

তার বক্তব্য থেকে ১১ মার্চের হরতাল সফল করতে নারীর অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ের এই ভাষা আন্দোলন ঢাকার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলা ভাষার দাবিতে পিরোজপুর গার্লস স্কুলের ছাত্রীরাও ধর্মঘট করেন এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পিরোজপুর আরবান গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী হোসনে আরা বেগম।[১৭] সেই সময়ের কথা তিনি বর্ণনা করেন এভাবে:

> ওই বয়সে রাজনৈতিক তত্ত্বালোচনা কিছুই বুঝতাম না। তার ওপর থাকতাম মফস্বল শহরে। সেই সময় রাজধানীর মেয়েরাই অনেক রক্ষণশীল ছিল। মফস্বলের মেয়েরা তো বটেই। তবু বাড়ির বড়দের এবং পাড়া মহল্লার মুরব্বিদের মধ্যে উর্দু ও বাংলা ভাষার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা শুনতাম। এমনকি আমাদের পাশের বয়েজ স্কুলের ছেলেদের এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কে মেতে উঠতে দেখেছি। ... এর আগে কখনো ধর্মঘটের কথা শুনিনি। তাই ধর্মঘট কীভাবে করতে হয়, সেটাও জানি না। আমাদের ধারণা ছিল ছুটির মত ধর্মঘট করতেও হেড স্যারের অনুমতি লাগবে। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলতে গেলে স্যার বললেন, আমাকে জানিয়ে ধর্মঘট করবে নাকি? তাহলে সেটা কেমন ধর্মঘট হবে?[১৮]

১৯৪৮ সালের পরে হোসনে আরা বেগম ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে পারেননি। তবে ভাষার লড়াইয়ে তার একাত্মতা ছিল সর্বক্ষণের।

যশোরেও প্রত্যেকটি স্কুল কলেজে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয় এবং ঐদিন যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদা রহমান[১৯] এর নেতৃত্বে স্কুল কলেজের ছাত্রীরা মিছিলে অংশ নেন।[২০] হামিদা রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্রী মিছিলটি মোমিন গার্লস স্কুল থেকে যশোর কোর্টের সামনে এসে হাজির হয়। কোর্টের সামনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীসময়ে ১৩ মার্চ যশোরে হরতাল কর্মসূচি চলাকালীন তার নেতৃত্বে যশোরে মেয়েদের একটি মিছিল বের হয়। পুলিশ হামিদা রহমানকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়। তাকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে বিভিন্ন থানায় তার নামে ওয়ারেন্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পার্টি থেকে তাকে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ না করে আত্মগোপন করেন এবং পার্টির কার্ড ফেরত দেন। তবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারেননি।[২১]

ভাষা আন্দোলনের এই পর্বে বগুড়ার ছাত্রীগণও ধর্মঘট পালন করেছিলেন। বগুড়ায় বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি রহিমা খাতুন এবং সালেহা খাতুন ধর্মঘট পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল খুলনা শহরেও। তৎকালীন খুলনা গার্লস গাইডের কর্মী ফাতেমা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, সাজেদা হেলেন, সুফিয়া আলী, আনোয়ারা খাতুন এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২২] ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে চট্টগ্রামে যে সকল নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে হালিমা খাতুন, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, রাশেদা জামান ও ফজিলাতুন্নেসার নাম উল্লেখযোগ্য।[২৩] এছাড়া কুমিল্লায় ভূমিকা রেখেছিলেন লায়লা নূর। কুমিল্লায় রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রয়াসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলার পক্ষে

বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি। তখন তিনি ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। সেই দিনের সভা সম্পর্কে লায়লা নূরের স্মৃতিচারণ:

> সেই সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করছিলেন। ... তারা প্রমাণ করছিলেন– পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ভাষা বাংলা নয়। কাজেই বাঙালি মুসলমানের একমাত্র ভাষা উর্দু– উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ... এটা শুনে আমার সহ্য হলো না। কিছু বলার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি পেতে দেরি হয়নি। মঞ্চে গেলাম– আমি যা বলেছিলাম, তা হলো– একটা দেশের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা স্থির করার জন্য কতগুলো মজবুত যুক্তি থাকতে হবে- ১. জনগণ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তার উপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়, তাহলে বাংলাই হওয়া উচিত রাষ্ট্রভাষা ২. বাংলা পূর্ব বাঙলার ভাষা নয়- এর চেয়ে অসত্য কিছু হতে পারে না। যে কোনো জায়গায় ভাষার মধ্যে আঞ্চলিকতা থাকে– যেমন চট্টগ্রামের ভাষা একরকম, নোয়াখালীর ভাষা একরকম। কিন্তু ঢাকার ভাষা হোক আর কলকাতার ভাষা হোক ... মূল ভাষা বাংলা। একটা বিশুদ্ধ ভাষায় কিছু বললে সব জায়গার লোকই বুঝতে পারে। বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা বই সবাই বুঝতে পারে সাদরে গ্রহণ করে। বাংলা ভাষা তো কোনো নিম্নমানের ভাষা না– এর যোগ্যতা আছে– কারণ সারা ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। ৩. ভাষার বিচারে সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিক দিয়ে ভারতবর্ষে বাংলা ভাষা শ্রেষ্ঠ ৪. সারা বাংলাদেশে এক ভাষা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে একেক জেলায় একেক ভাষা–অধিকাংশ উর্দু ভাষী নন। এরকম পরিস্থিতিতে জোর করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।[২৪]

এভাবেই সাহসিকতার সাথে পুলিশ প্রহরাধীন সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। পাশাপাশি নোয়াখালী সদরের উমা গার্লস স্কুলের ছাত্রী শরিফা খাতুনসহ অনেক ছাত্রী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে অংশ নেন।[২৫] রাজশাহীর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন কলেজ ছাত্রী হাসনা বেগম।[২৬]

১৯৪৮ সালের ১৪ মার্চ পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ধর্মঘট পালন করা হলে ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের তীব্রতা দেখে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং আইয়ুব খানকে তলব করেন। এদিন গণপরিষদের মধ্যে ফজলুল হক, আনোয়ারা খাতুন এবং অন্যেরা প্রধানমন্ত্রীকে বাইরে গিয়ে অবস্থা দেখে আসার জন্য ক্রমাগত দাবি জানাতে থাকেন। এ সময় একবার উত্তেজিত অবস্থায় আনোয়ারা খাতুন বলেন, "গত ১১ মার্চ তারিখে যা হয়েছে, তা হয়েছে। আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামি চলবে না। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে আসুন।"[২৭] ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসেন এবং ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ও ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় জিন্নাহর সাথে আলোচনায় বসেন। ওই প্রতিনিধিদলে নারী প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিলি খান।[২৮]

১৯৪৭-৪৮ সময়ে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশ বিভাগের আগে সাধারণ নারীরা ঢাকায় বিশেষভাবে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন হচ্ছে এজাতীয় প্রথম আন্দোলন যেখানে নারীসমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নারীসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৪৮-১৯৫২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভাষা বিতর্ককে উর্দুর সপক্ষে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে প্রথম নিরবতা ভাঙেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার মাধ্যমে। খাজা নাজিমউদ্দীনের বক্তৃতার মাধ্যমে পুনরায় রাষ্ট্রভাষা বিতর্কটি নতুন মাত্রা পায় এবং নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়। এই পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকার বাইরে জেলা ও মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়ে। মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই বাংলার নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ভাষা আন্দোলনে এলাকাভিত্তিক নারীর ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ভাষা আন্দোলনে নারী: ঢাকা বিভাগ

ঢাকা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য বক্তার সাথে ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুনও বক্তৃতা করেন। এই বিষয়ে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি ছিল:

> রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য সভায় ৪০ জনের উপর সদস্য লইয়া একটি সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুব সংঘ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের সমিতির কর্মী ও নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করেন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজ খান, পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, অধ্যাপক খায়রুল বাশার, ইডেন কলেজের ছাত্রী মিসেস মাহবুবা খাতুন।[২৯]

মাহবুবা খাতুন বক্তৃতায় বলেন, "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে।"[৩০] এ সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আনোয়ারা খাতুন, লিলি খান প্রমুখ। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষা প্রচলন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট সভা ও শোভাযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৩১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শোভাযাত্রা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ইডেন কলেজের ছাত্রী শরীফা খাতুনসহ কয়েকজন ছাত্রী হোস্টেল থেকে পালিয়ে মিছিল করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে গিয়ে ছাত্র জনতার সমাবেশে যোগদান করেন।[৩২] ভাষা আন্দোলন নিয়ে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের মনোভাব সম্পর্কে শরীফা খাতুন উল্লেখ করেন:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুসংখ্যক ছাত্রী কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ইডেন কলেজে এবং হোস্টেলে আসতেন। এরা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের অবহিত করতেন। এদের সাহায্যে কথাবার্তা ও ছাত্রীদের সভায় আলোচনা হতো এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবির প্রতি পাকিস্তান সরকার ও পূর্ববর্তী সরকারের বিরূপ ও বিরোধী নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। আমাদের তরুণ মনে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পটভূমি সেই সময় সৃষ্টি হয়, যা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বাস্তবতা লাভ করে। ... আমার মনে পড়ে ৪ ফেব্রুয়ারি আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্রী হোস্টেল থেকে পালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে যাই। আমাদের হাতে কয়েকটি পোস্টারও ছিল। বিভিন্ন স্কুলের মেয়েরা ও ইডেনের মেয়েরা আমরা নির্ধারিত জায়গায় বসি। আমরা সেখানে বিরাট ছাত্র-জনতার সমাবেশ দেখি।[৩৩]

এই সভা শেষে ছাত্র জনতার এক বিরাট মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। সে সময় ছাত্রীদেরও একটা মিছিল বের হয়। শহরের তিন শতাধিক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মূল শোভাযাত্রার সঙ্গে বের হয়ে সেক্রেটারিয়েট ভবনের নিকট হতে তাদের নিজস্ব একটি শোভাযাত্রা সহকারে বিক্ষোভ করতে করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়।[৩৪]

ভাষা আন্দোলনের তৎপরতাকে বিস্তৃত করতে ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ সময় পাঁচশত পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় নাদেরা বেগম এবং শাফিয়া খাতুনকে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের ও অন্যান্য ছাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৫] নূরুন্নাহার কবীরের হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলে তিনি বেশির ভাগ পোস্টার লেখার দায়িত্বে ছিলেন। তাকে সাহায্য করতেন রওশন আরা বাচ্চু, মাহফিল আরা, রাবেয়া ইসলাম, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, কায়সার লিলিসহ আরও অনেকে।[৩৬] এরই মধ্যে ৪ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য প্রস্তুতিও চলছিল। প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল। বিশেষ করে লায়লা সামাদ, শাফিয়া খাতুন, শামসুন নাহার, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুন প্রমুখ ছাত্রীগণ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রীদের আন্দোলনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করেন।[৩৭] সেই সময় আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রোকেয়াকে। রোকেয়া অন্য কয়েকজন ছাত্রীসহ প্রায় দশ হাজার অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।[৩৮]

২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে। কিন্তু ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. শামসুল হক কোরেশী সমগ্র ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বেগম আনোয়ারা খাতুন।[৩৯] ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। এই সভায় ঢাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ থেকে ছাত্রীরা যোগদান করে। মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের মধ্য থেকে পঁচিশ-ত্রিশ জন ছাত্রী সমাবেশে যোগদান করেন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সারা তৈফুর।[৪০] সেই সময় মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা স্কুল, ইডেন কলেজ, আনন্দময়ী গার্লস হাইস্কুলসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করে সমাবেশে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, সুফিয়া খান, আমিনা মাহমুদ, শামসুন নাহার, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া করিম।[৪১]

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে বিপক্ষে বক্তৃতা চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী জাহানারা লাইজু। জাহানারা লাইজু সাইকেল চালাতে পারতেন বলে তাকে এবং গাজীউল হকের ছোট ভাই নিজামকে চিঠি বহন করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেয়া হয়।[৪২] সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশ জন করে ছাত্র-ছাত্রীর দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে যোগদান করবে বলে স্থির হয়। গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে মিছিলের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সশস্ত্র পুলিশ ছেলেদের গ্রুপ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে আটক করে ট্রাকে তুলে নেয়ায় ছেলেরা আর সামনে যেতে পারেনি। এর পরপরই সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার, সারা তৈফুর প্রমুখ বেশ কয়েকজন ছাত্রী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হন। ধারণা ছিল তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে পুলিশ মেয়েদের এগিয়ে যেতে বাধা দিবে না বা লাঠিচার্জ করবে না। রওশন আরা ও অন্যেরা গেট থেকে বের হওয়ার সময় স্কুল, কলেজের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়েই অবস্থান করছিলেন, কিন্তু তাদের এগিয়ে যেতে দেখে অন্য ছাত্রীরাও বের হতে শুরু করেন। এভাবে কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করলে দেয়াল টপকে এসে কিছু ছাত্রও মিছিলের পেছনে যোগদান করেছিলেন। তারা মেডিক্যালের বর্তমান প্রবেশ দ্বারের কাছে আসতেই পুলিশের লাঠিচার্জ আর কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের ফলে রওশন আরা বাচ্চুর গায়ে লাঠির আঘাত লাগে। রওশন আরা বাচ্চু আকস্মিক আঘাতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। রাস্তার পাশে রেস্টুরেন্টের কাছে কয়েকটি ভাঙা রিকশা ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এরপর ছুটে যান সাইন্স এনেক্সের কম্পাউন্ডে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ওসমান গণির বাসভবনের দিকে। সেখানে বাসভবনের বারান্দায় সুফিয়া ইব্রাহিম, শামসুন নাহার ও সারা তৈফুরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সহায়তায় তারা হোস্টেলে ফিরে আসেন।[৪৩]

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের পাশাপাশি ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা পোস্টার বিতরণ, স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং পিকেটিংয়ের কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ইডেন কলেজের যেসকল ছাত্রী ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শরীফা খাতুন[৪৪], সুফিয়া করিম[৪৫], রওশন জাহান হেনা, মাহবুবা খাতুন, উম্মে সাঈদা সিদ্দিকী[৪৬], মনোয়ারা ইসলাম, গুলে ফেরদৌস, চেমন আরা,[৪৭] মনু, হেনা, রহিমা, দুলু, লুৎফুন্নেসা বেগম, আমিরুন্নেসা, শাহাদৎ আরা, রাজিয়া চৌধুরী[৪৮], ফিরোজী বেগম, রাহাত আরা প্রমুখ। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হোস্টেলের ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রচারপত্র দিয়ে গেলে ইডেন হোস্টেলের ছাত্রীরা তা বিলি করতেন। তারা পোস্টার বিলি, স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার কাজও করতেন। প্রথম দিকে হোস্টেল প্রশাসন আন্দোলনকারীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। হোস্টেলের গেটে তালা দেয়া সত্ত্বেও ছাত্রীরা দেয়াল টপকে অথবা দারোয়ানের সহযোগিতায় বের হয়ে মিটিং-মিছিলে যোগ দিতেন।[৪৯] ১৯৫২ সালে হোস্টেল সুপার ছিলেন আরবির অধ্যাপক হালিমা খাতুন। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আফিয়া খাতুন মাঝে মাঝে হোস্টেল সুপারের বাসায় থাকতেন। আফিয়া খাতুন ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের স্ত্রী। এই পরিবেশে ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রমে হোস্টেল প্রশাসন কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের অনেক ছাত্রীই অংশ নেন।[৫০] ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের মেয়েদের অংশগ্রহণ বিষয়ে শরীফা খাতুন বলেন:

ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সভা ডাকে। আমরা ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রীরা সে সভায় অংশগ্রহণ করেছি। সব খবর রাখতাম আমরা হোস্টেলের মেয়েরা। ওই সময় চিঠির যে খাম ছিল তাতে উর্দু এবং ইরেজি লেখা ছিল। কোনো বাংলা লেখা ছিল না। খুব খারাপ লাগত তো ৪ ফেব্রুয়ারি যে মিটিং হয় সেখানে আমি গিয়েছি। সে সময় আমার সঙ্গে ছিলেন ইডেন কলেজের জিএস মনোয়ারা বেগম। আরো ছিলেন মতি আপা, জেবুন্নেসা, লুৎফুন্নেসা, শাহাদত আরা, আমিরুন্নেসা, রওশন জাহান হেনা, ফিরোজী বেগম, সুফিয়া খাতুন, রাহাত আরা, শহর বানু। আরো অনেকের নাম এখন আর মনে নেই। মিটিং এ যাওয়া ছাড়া আমরা আন্দোলনের পক্ষে পোস্টার লিখে দেয়ালে সাঁটাতাম। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত ব্যাচ বিলির কাজ করেছি। আমাদের আরেকটি দায়িত্ব দেয়া হলো যে, মেয়েদের বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে বোঝাতে হবে। ঢাকা শহরে যে ক'টা স্কুল ছিল, সেগুলোতে প্রচার চালানোর দায়িত্ব পড়ল আমাদের ওপর। ... ২১ তারিখ সকালে ৯টার দিকে আমরা নাস্তা করে আমতলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। সকালে ইডেনের গেট বন্ধ ছিল। আমরা কেউ দেয়াল, কেউ গাছ বেয়ে দেয়াল পার হলাম। সেদিন হোস্টেল থেকে আমরা ৩০ জনের মত ছাত্রী গিয়েছিলাম। সঙ্গে ব্যানার ছিল। ১৪৪ ধারা তো আমরা কয়েকজন কয়েকজন করে গিয়েছি। সবাই একসঙ্গে যাই নি। রাস্তায় পুলিশ দেখতে পেলাম। হাফপ্যান্ট পরা, হাতে লাঠি। আমতলায় গিয়ে দেখি অনেক লোকজন। মুসলিম স্কুল থেকেও মেয়েরা এসেছে। কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরাও ছিল। শ'খানেক মেয়ে ছিল মনে হয়। আমরা আমতলার একপাশে বসলাম। ... ভাষা আন্দোলনে নারী শুধু সক্রিয়ভাবে অংশই নেননি বরং নিজের গায়ের গয়না এবং টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছেন। এমনকি ইডেন কলেজের আমরা একদিন রান্না করে জেলখানায় পাঠিয়েছি। ... ভাষা আন্দোলন চলে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়ার আগ পর্যন্ত এবং ২১ ফেব্রুয়ারির পর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আন্দোলনেও নারীদের ভূমিকা ছিল।[৫১]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে গুলে ফেরদৌস ছিলেন ইডেন কলেজের ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি হোস্টেল সুপার ও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করতেন। একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মিছিলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

তখন প্রায় দুপুর হয় হয়। অসংখ্য কণ্ঠধ্বনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আমাদের চমকে দিল। আমরা জনা বিশেক মেয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা অ্যাসেমব্লি হলের দিকে দৌড় দিলাম। মাঝপথে আমাদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল পুলিশ। সোজা চোখে এসে ঢুকল বিষাক্ত ধোঁয়া। অসহ্য যন্ত্রণায় আবার কলেজে ঢুকে মাটিতেই বসে পড়লাম। কলেজের নতুন দাই খাতুন ছুটে এসে আঁচল ভিজিয়ে আমার চোখ মুখ মুছিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পর পর কয়েক রাউন্ড গুলির আওয়াজ শুনলাম। ওই অবস্থাতেই আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই পেছন থেকে আফিয়া আপা, আখতার ইমাম আপা চিৎকার করে আমাকে থামাতে চাইলেন– "যাসনে ফেরদৌস যাসনে, তুই সরকারি কর্মচারী ....."। তখন আমার একটাই উত্তর ছিল– "আমাকে বাধা দেবেন না। আমিও তো ছাত্রী, সবার ওপরে আমি বাঙালি"।[৫২]

ইডেন কলেজের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রী মনোয়ারা ইসলাম ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। হোস্টেলের মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আন্দোলনে অর্থের যোগান দিতেন তিনি। সেই সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পুলিশ তল্লাশি করবে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে সেই হলের এক ছাত্রের দেয়া একটি প্যাকেট আমগাছের গোড়ায় গর্তের ভেতর পাতা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। প্যাকেটে ছিল হ্যান্ড মাইক, যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে জানানো হতো। এভাবেই সব বিপদ উপেক্ষা করে ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি।[৫৩] এছাড়া তৎকালীন কন্ট্রোল রুম হিসেবে খ্যাত সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ইডেন কলেজের ছাত্রীবৃন্দ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে ইডেন কলেজের হোস্টেলের তৎকালীন ছাত্রী ভাষাসংগ্রামী গুলে ফেরদৌস বলেন, "আমরা হোস্টেলের মেয়েরা কোঁচড় ভরে খাবার নিয়ে জানালা গড়িয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের তুলে ধরা সার্টের ভিতর খাবার ঢেলে

দিয়েছি। কারণ সলিমুল্লাহ হল পুরোটা পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে আবাসিক ছাত্ররা রাতের অন্ধকারে আমাদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে যেত।"[৫৪] ইডেন কলেজের ছাত্রীগণ মেডিক্যাল হোস্টেলে আহতদের কাছেও খাবার পৌঁছে দিতেন। এই দলে অন্যতম ছিলেন রওশন জাহান হোসেন। এক পর্যায়ে হোস্টেল সুপারের আদেশে হোস্টেলের গেটে তালা ঝোলানো হয়, যাতে ছাত্রীরা ভেতরে না যেতে পারে। তখন তারা ইট জোগাড় করে গেট টপকিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। এভাবেই সব বাধা, রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে ছাত্রীগণ ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি মিছিল বের হয়। এই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন মালেকা খান। তার ভাষায়, "ছোটখাটো ছিলাম বলে মিছিলের সামনের দিকেই ছিলাম। আমার স্কুল অভয় দাস লেনের কামরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগানে মুখরিত ছিল আমাদের মিছিলটি। পথের দুধারের মানুষ করতালি দিয়ে উৎসাহিত করেছিল। আর আমাদের স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল বাতাস, একাত্মতা ঘোষণা করছিল ছাত্রীদের প্রতিবাদের সাথে।"[৫৫] সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রওশন আহমদ দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মিছিলে যোগ দেন। সেই বয়সে সভা-সমাবেশ, মিছিল, দাবি আদায় বা রাষ্ট্রভাষা বাংলা এই কথাগুলো গভীরভাবে না বুঝলেও স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে শুনতেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সোচ্চার পূর্ব বাংলা। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী গিয়েছিলেন কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ে। তখন তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে স্কুলের ছাত্রীরা দুজন দুজন করে বের হতে শুরু করলেন। রওশন আহমেদ দোলনের স্মৃতিচারণ:

> আমাদের সঙ্গে পাঁচিলের বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারাও যোগ দিল এবং তা-ই করা হলো। এর মধ্যে পুলিশভ্যানও চলে এসেছে, ছাত্রদের অ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে নিচ্ছে। কিন্তু এ যেন পঙ্গপালের দল, আর পেরে উঠছে না। তখন পুলিশ শুরু করল টিয়ার গ্যাস ছোড়া। টিয়ার গ্যাসের শেল কয়েকজনের গায়ে এসে পড়ল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পুরো সমাবেশ এলাকা ছেয়ে গেল।[৫৬]

কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রী কাজী খালেদা খাতুন[৫৭] ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মিছিল, সমাবেশ ও পিকেটিংয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। তার নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেয়া লিফলেট কামরুন্নেসা স্কুলে বিতরণ করা হয়েছিল।[৫৮] তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে অংশ নেন এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন। তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী দলের সাথে যুক্ত হন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বের হয়ে আসেন। এরপর তিনি অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে রশিদ বিল্ডিংয়ের পাশে অবস্থান নেন। এক পর্যায়ে পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাস তাদের দিকে এসে পড়ে এবং তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। পুলিশ ধাওয়া করলে তিনি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেও তার অনেক সহযোগীই পুলিশের লাঠির আঘাতের শিকার হন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বাকি দিনগুলোতেও তিনি কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে রাষ্ট্রভাষার দাবির পক্ষে সোচ্চার ছিলেন।[৫৯]

এই স্কুলেরই অপর ছাত্রী জুলেখা হক যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাফিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুনের সাহচর্যে এসে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তিনি ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি সভা-সমাবেশ সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং বক্তৃতা দেন। জুলেখা হক এ প্রসঙ্গে বলেন:

> ১৯৫২ সালের প্রথম থেকেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ক্রমে জোরদার হয়ে উঠেছিল, তার প্রভাব আমাদের মতো কিশোরীদের ওপরও যথেষ্টভাবে পড়েছিল। তাই

> ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়, তখন আমরা একযোগে স্কুলগেটে পিকেটিং করি, নিচের ক্লাসের মেয়েদের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে সেদিনের স্কুলের সাধারণ কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিই।[৬০]

তিনি এবং রওশন আহমেদ দোলন মিলে স্কুলের প্রায় ৫০ জন ছাত্রী নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী হাবিবা খাতুন ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রাজপথের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তিনি স্কুলে শহিদ মিনার নির্মাণেও অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তার স্মৃতিচারণ:

> ... ২৪ ফেব্রুয়ারিতে আবেদা আপার নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন ভাতুর (স্কুলের দারোয়ান) চোখ ফাঁকি দিয়ে গেইট টপকে পথে বের হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় হাজির হয়েছিলাম। ... পরবর্তী বছরগুলোতে কামরুন্নেছা স্কুলের ছাত্রীরা মিছিল করে আমতলায় জড় হয়ে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি, স্লোগান দিয়েছি, আমরা কামরুন্নেছা স্কুলে সেদিনের আদলে প্রথম শহীদ মিনার তৈরি করেছি। আমাদের শিক্ষক নূরজাহান আপা আমাদের উৎসাহিত করতেন, সাহস জোগাতেন।[৬১]

মুসলিম গার্লস স্কুল ও বাংলা বাজার স্কুলের ছাত্রীরাও ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিলেন। মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সারা তৈফুর বলেন:

> ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আমরা ২/৩ জন মুসলিম গার্লস স্কুলে যাই। আমরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসতে চাইলে হেড মিস্ট্রেস বাধা দেন। আমরা এসম্বলীতে কিছু বলতে চাইলাম। তিনি আমাদের পাঁচ মিনিট বলার অনুমতি দিলেন। আমরা মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললাম ভাষা আন্দোলনের কথা তোমরা জান। উর্দু আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে এটা যৌক্তিক নয়, এটাতো তোমরা বোঝ, আজকে একটা মিটিং হচ্ছে আমতলায়। তোমরা যারা যেতে চাও, আসতে পারো। আমাদের বক্তব্য শুনে ওদের প্রায় ২৫/৩০ জন আমাদের সাথে আসে।[৬২]

ডাক্তার এবং নার্সরাও ভাষা আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছেন, তাদের নিজেদের জায়গা থেকে ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রী সেবিকা কোর্সে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন উষা বেপারী। ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় নার্স হোস্টেলের সামনে তিনিসহ কয়েকজন বসে ছিলেন। এমন সময় গুলির আওয়াজ শুনে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতো তিনিও ঘটনাস্থলে আসেন এবং আহত ছাত্রদের দেখে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের সাহায্য করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা পুলিশের ভয়ে হাসপাতালের ভিতরে আশ্রয় নিলে উষা বেপারী পুলিশের হাত থেকে ছাত্রদের রক্ষা করার জন্য ছাত্রদের হাসপাতালের বেডে শুইয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন। পুলিশ হাসপাতালে আসলে জানান, এখানে কোনো ছাত্র নেই, যারা আছে সবাই রোগী। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে কারফিউ জারি হলে মেডিক্যাল কলেজে আশ্রয় গ্রহণকারী ছাত্রদের সাদা শাড়ি পরে হাসপাতাল থেকে বের হতে সাহায্য করেন। প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন।[৬৩]

চিকিৎসক জোহরা বেগম কাজী[৬৪] বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি প্রতিদিনের মত রোগী দেখে ঢাকা মেডিক্যালের পিছনের রাস্তা দিয়ে রিকশায় চড়ে হাসপাতালে ফিরছিলেন। ক্যাম্পাসের কাছাকাছি এলেই তিনি লক্ষ করেন চারদিকে মানুষের মিছিল আর মিছিল। হাসপাতালের সামনে আসতেই কয়েকজন পরিচিত ছাত্র তার রিকশা থামিয়ে দ্রুত তাকে হাসপাতালের ভেতরে যেতে বলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি গুলির আওয়াজ শুনতে পান। অগত্যা পায়ে হেঁটেই তিনি হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে অধ্যক্ষকে খুঁজে বের করে পুলিশের গুলিবর্ষণের কথা জানান এবং অধ্যক্ষকে সাথে নিয়ে মেডিক্যাল ছাত্রাবাসে যান। ছাত্রাবাসের বারান্দায় শহিদের

মৃতদেহ দেখতে পান। তখনই খবর পান হাসপাতালে আহত ছাত্রসহ অনেক মানুষ একত্র হয়েছে। আহতদের আর্তনাদ আর তাদের স্বজনদের ছোটাছুটি এবং আতঙ্কিত মানুষের ভিড় সব মিলে হাসপাতালে এক উত্তেজনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক ও নার্সদের সহযোগিতায় আহতদের সেবায় নিয়োজিত হন। কারো হাতে ব্যান্ডেজ করে দেন। কারো শরীর থেকে অপারেশন করে বুলেট বের করেন। যাদের অল্প ক্ষত তাদের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ ঔষধপত্র দিয়ে তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সহযোগিতা করেন।[৬৫] এছাড়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহতদের যারা দেখতে যান তাদের মধ্যে ছিলেন নেলী সেনগুপ্তা।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর ঢাকায় নারীসমাজের প্রতিক্রিয়া

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের আহত হওয়ার ঘটনা পরবর্তী দিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারা খাতুন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন:

> নুরুল আমীন সাহেব যে কথা বললেন, নাজিমুদ্দীন সাহেব তখনকার পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী, এ রকমই একটা কথা বলেছিলেন। আজ চার বছর পরে তিনিই আবার পল্টন ময়দানে বললেন, Urdu shall be the only state language এ থেকে মনে হয় যে, নাজিমুদ্দীন সাহেব তিন বছর আগে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা একটা blulf ছাড়া আর কিছুই নয়। ... ঘটনা থেকে মনে হয় আজও আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাই নি। তার প্রমাণ পুলিশের এ জুলুম। ... এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই- ছেলেদের কথা আর নাই বল্লাম, যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানেনা সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়– দু'একটি কথায় কিছুটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব– মিলিটারী মেয়েদের গাড়ীতে করে নিয়ে কুর্মিটোলায় ছেড়ে দিয়েছে। যে Ministry-র আমলে এই সমস্ত অত্যাচার হয়- যারা মাতৃজাতির সম্মান দেয় না, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পুলিশের লাঠি চার্জে মেয়েরা Wounded হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে দু'জনার নাম দিচ্ছি। একজন হলো ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম। আর একজন হলো মিস রওশন আরা থার্ড ইয়ার বি.এ। মেয়েদের Total wounded এর সংখ্যা হল ৮ জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে।[৬৬]

ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্রী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শাফিয়া খাতুন। এই সভায় শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের ওপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিন্দা করা হয়।[৬৭] ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে আজিমপুর কলোনির মেয়েরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এই প্রতিবাদ সভায় কমলাপুরস্থ ও অন্যান্য দূর এলাকা থেকে নারীরা যোগদান করে সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়।[৬৮] ২৫ ফেব্রুয়ারি আজিমপুর কলোনিতে ঢাকার নারীদের একটি প্রতিনিধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য মা-বোনদের অনুরোধ জানানো হয়।[৬৯] ২৬ ফেব্রুয়ারি ১২ নং অভয়দাস লেনে সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে নারীদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শহরে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বহু দূর থেকে হেঁটে বৃদ্ধা ও বর্ষিয়সী নারীরা পর্যন্ত এই সভায় যোগদান করেন। সভায় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দাবি জানানো হয়। এই আন্দোলনকে যারা বাঙালি, অবাঙালি ও হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে প্রচার করে সভায় তাদের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও এই সভায় শহিদদের নাম, ঠিকানা

এবং তাদের দাফন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির সঠিক সংবাদ দাবি করা হয়। সবশেষে সেদিন সর্বদলীয় 'ঢাকা মহিলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭০] ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পুরানা পল্টনে নারীদের আর একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় নূরজাহান মোর্শেদ ও সাংবাদিক লায়লা সামাদ ভাষা আন্দোলনে শহিদদের আরাদ্ধ কাজ করে যাবার প্রতিজ্ঞা ও শোক জানিয়ে ভাষণ দেন। সভায় বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ১৪৪ ধারা বাতিলসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিসহ আরও কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওয়ারী মহিলা সমিতি, শিশু রক্ষা সমিতি ও অন্যান্য সমিতির কর্মী সদস্যরা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। নারীদের সভা করা, তাদের কাছে সঠিক বক্তব্য পৌঁছে দেয়া, সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের লিফলেট বিলি করাসহ অন্যান্য কাজে সরকারি দমননীতি উপেক্ষা করে সুফিয়া কামাল, নূরজাহান মোর্শেদ, কামরুন্নাহার লাইলী, আফসারী খানম, হালিমা খাতুনসহ অনেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।[৭১]

একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে আন্দোলন পরিচালনা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিলেন ছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, রওশন আরা, আমেনা মাহমুদ, কায়সার সিদ্দিকী, খোরশেদী আলমসহ আরও অনেক ছাত্রী এই চাঁদা তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সুফিয়া খাতুন ও মোসলেমা খাতুন শান্তিনগর আর মালিবাগ এলাকায় চাঁদা তুলতে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা যে যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, সব বাড়িতেই তারা ছাত্রদের জন্য সহানভূতি পেয়েছেন। গৃহিণীরা তাদের সাধ্যমত চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেছেন। অনেক বাড়িতে নারীরা গুলিবিদ্ধ ছেলেদের কথা বলে আপনজন হারানোর মতো কেঁদেছেন।[৭২] ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকাটুলি, আজিমপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় চাঁদা তোলা হয়। সারা তৈফুর, সুফিয়া ইব্রাহিম, হালিমা খাতুন, শামসুন্নাহারসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা চাঁদা তোলায় নেতৃত্ব দেন। ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা সুফিয়া করিম মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে চাঁদা তোলার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন।[৭৩] উত্তোলিত চাঁদা সলিমুল্লাহ হলে ভাষা আন্দোলনের কন্ট্রোল রুমে পাঠিয়ে দেয়া হতো। এছাড়া ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের সামনে নির্মিত শহিদ মিনারে অনেক নারী পুষ্পস্তবক অর্পণের পাশাপাশি হাতের কানের অলংকার খুলে দিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলন চালানোর জন্য। শিক্ষাবিদ, লেখক আনিসুজ্জামানের মা সৈয়দা খাতুন শহিদ মিনারের পাদপ্রান্তে সোনার হার নিবেদন করেছিলেন।[৭৪] এভাবেই ছাত্রী থেকে শুরু করে গৃহিণীরা পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং সমর্থন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারির পর কয়েকদিন আন্দোলন চলার পর দ্রুত সরকারপক্ষ থেকে দমননীতি গ্রহণ করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে ভাষা আন্দোলনের গতি ধীর হয়ে যায়। এ সময় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে আন্দোলনে জড়িত ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা শুরু হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি *ঢাকা গেজেটের* বিশেষ সংখ্যায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজনসহ বেশ কিছু ছাত্র নেতৃবৃন্দের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।[৭৫] ১৯৫২ সালের ৭ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হলে ১৪ মার্চ আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে সংগ্রাম পরিষদ পুনঃগঠিত হয়। পরবর্তীসময়ে ১৬ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ২৬ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদও পুনঃগঠন করা হয়। এসব পুনঃগঠিত পরিষদ পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের বাকি সময় বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সম্মেলন, ইশতেহার প্রকাশ, গণস্বাক্ষর অভিযান প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে অব্যাহত রাখে।[৭৬]

নারায়ণগঞ্জ

ভাষা আন্দোলনের একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই নারায়ণগঞ্জে এ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নারায়ণগঞ্জের বিজলী প্রেস থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা কেন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত ছিল এবং এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কথা বলা হলে তৎকালীন সরকার প্রেসটি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, শীতলক্ষা নদীতে ফেলে দেয়। ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব প্রশ্নাতীত।[৭৭] ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ হরতাল কর্মসূচিকে সামনে রেখে নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলেনের সূচনা হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপথ। সকালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থনকারী ছাত্রকর্মীরা স্থানীয় রেশনিং অফিসের সামনে রাজপথে শুয়ে পড়ে কর্মচারীদের অফিসে প্রবেশে বাধা দেয়। ১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশের যুক্ত রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটির ঘোষণা অনুযায়ী হরতাল পালিত হয়।[৭৮]

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। মফিজউদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক এবং আজগর হোসেন ভূইয়াকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ছাত্ররা এক বিশাল শোভাযাত্রাসহ শহর প্রদক্ষিণ করে ও রহমত উল্লাহ ক্লাবে সমাবেশের আয়োজন করে।[৭৯] ২১ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ ছিল প্রতিবাদ, মিছিল, বিক্ষোভ ও সমাবেশের শহর। এ দিনও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং বিকেলে রহমত উল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট মাঠে এক বিশাল জনসভা হয়। আলমাস আলীর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আবুল হাশিম। সভা চলাকালীন নারায়ণগঞ্জবাসী জানতে পারেন, ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি করা হয়েছে এবং কয়েকজন ছাত্র শহিদ হয়েছেন। এই খবর শোনা মাত্রই জনসভা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন মর্গ্যান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম[৮০] একটি মিছিল সহকারে সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে তাতে তিনি এবং তার নেতৃত্বে মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীসহ নারায়ণগঞ্জের নারীরাও যোগদান করেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভাষাসংগ্রামী আবুল গফুর চৌধুরী বলেন, "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নারায়ণগঞ্জে এটাই ছিল মহিলাদের প্রথম মিছিল। এতে আন্দোলন গতি লাভ করে এবং অন্যান্য কর্মীরা উৎসাহিত হয়।"[৮১] ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল ভাষা-আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে আরেকটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন সকাল থেকেই নারায়ণগঞ্জ মিছিলের শহরে পরিণত হয়। শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে চাষাড়া মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহর ছাড়াও আশেপাশের অঞ্চল থেকে হাজার হাজার শ্রমিক জনসভায় যোগ দেয়। এ জনসভায় মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে নারীদের একটি দল শোভাযাত্রা সহকারে অংশগ্রহণ করে।[৮২] মমতাজ বেগম এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সমকালীন রাজনীতিবিদ ও শ্রমিকদের সাথে গোপন বৈঠক করেন, যেন এ আন্দোলন শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যায়। তিনি শ্রমিকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এ আন্দোলন সফল না হলে শুধু ভাষা নয়, বাঙালির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। মমতাজ বেগমের এ দূরদর্শী ও দক্ষ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ফলেই আদমজী জুট মিলের শ্রমিকরা দলে দলে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।এই সব ঘটনার মধ্য দিয়েই মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জ ভাষা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন।[৮৩]

২৩-২৮ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন ক্রমাগত জোরালো হতে থাকে। প্রতিদিনই শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল, মিটিং ও প্রতিবাদ সভা চলতে থাকে। জনগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এসব বিক্ষোভে নারীরাও যোগদান করে।[৮৪] এই বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার মধ্যেই ২৯ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মমতাজ বেগমের গ্রেফতারকে কেন্দ্র

করে পরিস্থিতি গণবিক্ষোভের আকার ধারণ করে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন মমতাজ বেগমের সাংগঠনিক শক্তি ও সাহসে ভীত হয়েই ২৯ ফেব্রুয়ারি সকালে তাকে গ্রেফতার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে রাস্তা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা, সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিকরাও ছুটে আসেন। তারা কোর্ট এলাকায় এসে বিনাশর্তে মমতাজ বেগমের মুক্তি দাবি করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনি দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মহকুমা হাকিম ইমতিয়াজী বাইরে এসে বলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে মমতাজ বেগমের গ্রেফতারের কোনো সম্পর্ক নেই, তাকে স্কুলের তহবিল তসরুফের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু জনতা তা বিশ্বাস না করে বলতে থাকে, মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মী বলেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তাই তাকে বিনা শর্তে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তারা আদালত প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাবে না। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ তাকে ভ্যানে তুলে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে বিপুল সংখ্যক জনতা চাষাড়া স্টেশনের কাছে রাস্তায় গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ ভ্যান আটক করলে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এর ফলে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত ঢাকা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছালে জনতা পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। সন্ধ্যার দিকে জনতা কিছুক্ষণের জন্য ছত্রভঙ্গ হলে পুলিশ সেই সুযোগে মমতাজ বেগমকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রায় ৪৫ জন আহত হয়।[৮৫] পুলিশ ঐদিন আন্দোলনের মূল কর্ণধার, নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করে। একই দিনে গ্রেফতার হয়েছিলেন ছাত্রী ইলা বক্শী ও আয়েশা আক্তার বেলু।[৮৬] ঐদিন রাতে নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। মমতাজ বেগমের গ্রেফতারের সূত্র ধরে মোট ১৪৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মমতাজ বেগমকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ সংক্রান্ত এক খবরে বলা হয়, "One hundred and fifteen persons including two girl students have been arrested. So far in connection in the disturbances as Narayangonj that brookout after the arrest of Mrs. Mumtaz Begum Headmistress of the Morgan Girls High English School on February 29."[৮৭]

মুসলিম লীগ সরকার মমতাজ বেগমকে কারাগার থেকে মুচলেকার শর্তে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে তিনি তার সরকারি চাকরি হারান। তার স্বামী আবদুল মান্নাফ তখন ঢাকার সিভিল সাপ্লাই অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকার আবদুল মান্নাফকে চাকরি হারাবার ভয় দেখিয়ে চাপ প্রয়োগ করেছিল যেন মমতাজ বেগম বন্ড সইয়ে স্বাক্ষর করেন। আবদুল মান্নাফ জেলখানায় গিয়ে মমতাজ বেগমকে সরকারের শর্ত মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৫৩ সালের মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহের প্রথম দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মমতাজ বেগম মুক্তি পান। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকায় তিনি আরও কিছুদিন অন্তরীণ ছিলেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তার স্বামীর সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৯ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।[৮৮]নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে মমতাজ বেগমের ভূমিকা সম্পর্কে অলি আহাদ বলেন:

> মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। সরকার ও সমাজের সর্বপ্রকার রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়া এই অপ্রতিরোধ্য তেজস্বিনী নেত্রী যুবলীগ নেতা শামসুজ্জোহা, সফি হোসেন ও ডা. মুজিবর রহমানের সহিত হাতে হাত ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া শহীদদের রক্ত শপথে নারয়ণগঞ্জবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উজ্জীবিত করেন। অধুনা পথে ঘাটে অগ্নিকন্যা দাবীভূষিত বহুনেত্রীর নাম শুনা যায়। কিন্তু তাহারা কেহ কি মিসেস মমতাজ বেগমের ন্যায় অগ্নি অতিক্রম করিয়া জনতার চেতনার স্বীয় ত্যাগ ও কর্মোদ্যম দ্বারা এবং জানমাল ইজ্জতের পূর্ণ ঝুকি নিয়া আন্দোলনের আগুন ছড়াইতে কখনো সক্ষম হইয়াছেন?... কারাগার হইতে বন্ড সহি করিয়া মুক্তি ক্রয় করিতে অস্বীকার করিলে মিসেস মমতাজ

> বেগমকে তাহার স্বামী তালাক দেন। এভাবেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যোগ দিবার অপরাধে নারায়ণগঞ্জ মর্গান গার্লস হাইস্কুলের হেড মিসট্রেস মমতাজ বেগমের সংসার তছনছ হইয়া যায়। তাহার এই ত্যাগ আমরা মূল্যায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি কি? এবং সেই অনুযায়ী জাতির কর্ণধারগণ তাহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইয়াছেন কি?[৮৯]

নিজের মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে তিনি এতটাই দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে এর জন্য তিনি নিজের চকরি, স্বামী, সংসার সব কিছু ত্যাগ করতে পিছপা হননি।

নারায়ণগঞ্জে ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নারীসমাজের অংশগ্রহণ। মিছিল, সভা, সমাবেশে নারীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শহরের গৃহিণীদের স্বতঃস্ফূর্ত আর্থিক সহায়তাও এই ভাষা আন্দোলন সফল করেছে। নারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মমতাজ বেগম। তিনি ফেব্রুয়ারির উত্তাল দিনগুলোতে প্রতিটি সভা-সমাবেশ ও মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন।[৯০] ক্ষণজন্মা এই মহীয়সী নারীর আপসহীন ভূমিকা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

টাঙ্গাইল

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং এই উপলক্ষে একটি মিটিংও করা হয়। এক্ষেত্রে কেএন ছাকেরের মেয়ে রুবি, আব্দুল করিম খানের মেয়ে জোৎস্না, ঝর্ণা এবং মহেড়ার সৈয়দ ডাক্তারের মেয়ে ছালেহা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[৯১] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রীরা মিছিল ও সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছালেহা খাতুন নামে এক ছাত্রী দেয়াল টপকে ছাত্রীদেরকে নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।[৯২] কলেজের ছাত্রীদেরকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন রাবেয়া সিরাজ।[৯৩] ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি ছাত্রীদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করতে সক্ষম হন। তিনি কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[৯৪] ২২ ফেব্রুয়ারি কুমুদিনী মহিলা কলেজে ছাত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী কোহিনূর ইউসুফ শাহীর সভাপতিত্বে সভায় কিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৯৫] কুমুদিনী কলেজের ছাত্রী আজিজা বেগম এবং মাহমুদা খানম্‌ও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে টাঙ্গাইলের আরও যে সকল ছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন রুবী, সুফিয়া বেগম প্রমুখ।[৯৬]

নরসিংদী

১৯৫২ সালে নরসিংদীর পলাশ থানার দশম শ্রেণির ছাত্রী লীলা চক্রবর্তী পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ঢাকার ভাষা আন্দোলনের খবর পেয়ে স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে সারা এলাকা প্রদক্ষিণ করেছিলেন।[৯৭] তাছাড়া বামপন্থি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নরসিংদীর রানু চ্যাটার্জি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ কারাভোগ করেন।[৯৮]

মানিকগঞ্জ

১৯৪৮ সালে মানিকগঞ্জ ছিল ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। তখন থেকেই মানিকগঞ্জে ভাষা প্রশ্নে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫২ সালের আন্দোলনেও মানিকগঞ্জের জনসাধারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন

করেন। মার্চ মাসের শেষ দিকে স্থানীয় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন জাহানারা বেগম।[৯৯]

১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন রোকেয়া সুলতানা। এই কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছিল। এই শহিদ মিনারটি নির্মাণের জন্য উম্মে সাহারা খাতুন তার বাড়ির সামনে (বর্তমান মানিকগঞ্জ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়) জমি দান করেছিলেন।[১০০]

মুন্সিগঞ্জ

১৯৪৮ সাল থেকেই মুন্সিগঞ্জে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা হরতাল পালন করে। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ছাত্রীনেত্রী স্মৃতিকণা গুহ। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় গার্লস স্কুলের (অ্যালর্বাট ভিক্টোরিয়া যতীন্দ্রমোহন গার্লস স্কুল) ছাত্রীরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।[১০১]

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোসা. হেনা বেগম।[১০২]

ভাষা আন্দোলনে নারী: ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ

১৯৪৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলা ভাষার পক্ষে ময়মনসিংহের বিপিন পার্কে সম্মিলিত ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে একটি সভা হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলন ময়মনসিংহে তীব্র হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে সমাবেশ, মিছিল, হরতাল ও বিক্ষোভ পালিত হয়।[১০৩] ২২ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে বিদ্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করে। সামনে কালো পতাকা নিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে তারা। স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলন এবং ছাত্রীদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ মিছিল বের করার কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছালেহা বেগম।[১০৪] আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের অপরাধে তিন বছরের জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি।

১৯৫২ সালে ময়মনসিংহের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন হালিমা খাতুন। তিনি ছাত্রীনিবাসের মেয়েদেরকে সংগঠিত করে প্রধান ফটকের তালা ভেঙ্গে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার হাতে ছিল কালো পতাকা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' স্লোগান দিতে দিতে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তার হাতে কালো পতাকা থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাই তিনি ছাত্রীনিবাসে ফিরে গেলে বিদ্যাময়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হাসিনা বেগম রাত ১০টার দিকে তাকে হোস্টেল থেকে বের করে দেন। পরবর্তীসময়ে মাস্টার শামসুদ্দিনের সহযোগিতায় তিনি গ্রেফতারি পরোয়ানা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপেই নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন তিনি।[১০৫]

ময়মনসিংহের আর এক ভাষাকন্যা তাহমীদা সাঈদা। তিনি ১৯৫২ সালে বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি তার নেতৃত্বে নারীদের একটি দল কলেজ থেকে বেরিয়ে বিদ্যাময়ী স্কুলের সামনে জড়ো হয়। বিদ্যাময়ী স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রহরা ভেদ করে ছাত্রীরা রাজপথে এগিয়ে আসে। ছাত্রী মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে পনের দিনের জন্য নজরবন্দি করা হয় তাহমীদা সাঈদাকে।[১০৬] এভাবেই নারী-পুরুষের যৌথ পদচারণায় ভাষার দাবিতে ময়মনসিংহের রাজপথ প্রকম্পিত হয়েছিল।

জামালপুর

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে জামালপুর শহরে একটি মিছিল বের হয়। এই মিছিলে জামালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম জান্নাত আরা।[১০৭]

শেরপুর

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শেরপুরে তেমন জোরালো প্রভাব ফেলেনি। শেরপুরে সত্যিকারভাবে ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে। ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে শেরপুরের যে সমস্ত স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল শেরপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা।[১০৮]

নেত্রকোনা

১৯৪৮ সাল থেকেই নেত্রকোনার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে ভাষার প্রশ্নটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালে এই বিষয়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। নেত্রকোনাতে ভাষা আন্দোলনে যারা বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ছায়া রায় (শিক্ষক), কনক চক্রবর্তী (শিক্ষক), মোহিনী সেন (উকিল) প্রমুখ।[১০৯]

ভাষা আন্দোলনে নারী: চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষার প্রশ্নে সচেতনতা সৃষ্টিতে চট্টগ্রামের তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে *সীমান্ত*[১১০] পত্রিকা দৃঢ় ভূমিকা পালন করে। এই পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন তেমন সাংগঠনিক রূপ না পেলেও প্রতিবাদ, সমাবেশ চলেছিল সক্রিয়ভাবেই। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ চট্টগ্রামে বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে জোরদার করতে এবং পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকশিত করতে ১৯৫১ সালের ১৬-১৮ মার্চ চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টি করাই আমাদের মূল ও প্রাথমিক লক্ষ্য। এ সম্মেলন থেকেই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো ও ব্যাপক গণভিত্তিক দাবি সোচ্চার হয়েছে সর্বপ্রথম।[১১১]

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রামেও সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে আহ্বায়ক, এম. এ আজিজ ও চৌধুরী হারুনুর রশীদকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে চট্টগ্রাম জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, মিছিল এবং লালদিঘী ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি রাতদিন পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগানো হয়। চট্টগ্রামে পোস্টার লেখা ও লাগানোর কাজে জড়িত ছিলেন জওশন আরা রহমান,[১১২] মিরা সেন, প্রভিতা মুৎসুদ্দি,[১১৩] জাহানারা রহমান, হোসনে আরা মাক্ষী প্রমুখ।[১১৪]

২১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে হরতাল পূর্ণরূপে পালিত হয়। শহরের সমস্ত দোকানপাট, যানবাহন, সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। তখন নারীদের রাস্তায় বের হয়ে মিছিল করা সহজ ব্যাপার না হলেও বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে নারীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশের মতো চট্টগ্রামও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি লালদিঘী ময়দানের জনসভার পর রাতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতারা এক বৈঠকে ঢাকার আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি রেখে আন্দোলন অব্যাহত রাখা এবং ২২, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ, হরতাল, জনসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেন।[১১৫]

২২ ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঢাকার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর চট্টগ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে মিছিল এবং স্লোগানে সমগ্র শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র সংসদের নেতা এজহার, মাসুদুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রী এসে যোগ দেয়। মিছিলটি অর্পণাচরণ গার্লস কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে আরও কিছু ছাত্রী মিছিলে অংশ নেয়। ছাত্রীদের একটি ট্রাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্যরা পেছনে সাইকেল চেপে বা পায়ে হেঁটে মিছিলটি এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে জনতা শহর প্রদক্ষিণ করে।[১১৬] পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি অসংখ্য শোকমিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল ও জনসভা সফল করার জন্য ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে চোঙ্গা দিয়ে মিছিল সহকারে প্রচার কাজ চলে এবং পোস্টারিং করা হয় ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। এসব প্রচার প্রচারণায় মেয়েরাও অংশগ্রহণ করেন এবং আন্দোলন সফলভাবে পরিচালনার জন্য চাঁদাও তুলেছেন।[১১৭] ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ছাত্রীদের স্বতন্ত্র মিছিল। সেদিন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রতিভা মুৎসুদ্দি, তালেয়া রহমান প্রমুখ ছাত্রীদের একটি ছোট্ট মিছিল নিয়ে ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসেন। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে ঢাকার ছাত্রদের ওপর পুলিশি জুলুমের কথা এবং ছাত্র হত্যার কথা ছাত্রীদের জানান। সেখানে থেকে জওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুনসহ অন্যেরা মিছিলে যোগ দেন। এরপর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও যোগ দেন। মিছিলকারী ছাত্রীরা ট্রাকে করে ‘মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই’, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাসে নারীদের এই ধরনের স্বতন্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন এটাই প্রথম।[১১৮] তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বিভিন্ন নারী সংগঠন। চট্টগ্রামের সর্বদলীয় কর্মপরিষদের হয়ে সেদিন রাজপথে নামেন শেলী দস্তিদার, প্রণতি দস্তিদার (পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বোন), মীরাসহ সিনিয়র শিক্ষার্থী সুলেখা, মিনতিসহ আরও অনেকে।[১১৯] পরে এক সমাবেশে ছাত্রীরা ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন। গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারিতেও চট্টগ্রাম শহরে হরতাল পালিত হয় এবং হাটহাজারী, নাজিরহাট, পটিয়া ও অন্যান্য স্থানের ছাত্র-ছাত্রীরা বাস ও ট্রেনযোগে শহরে এসে মিছিলে যোগ দেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ তারিখ হরতাল পালিত হয়।

ঐদিন চট্টগ্রামের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা খালি পায়ে এক মিছিল বের করেন এবং 'মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন।[১২০]

চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনে নারীরা সম্পৃক্ত থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। চট্টগ্রামের ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে তালেহা রহমান বলেন:

> আমাদের সময়টা খুবই অন্যরকম ছিল। আমরা পুরুষদের থেকে অন্যরকম, অন্যভাবে চিন্তা করি, এমন ধারণাই ছিল না। যারাই গিয়েছে, তারাই পুরুষদের সাথে সমানে সমানে গিয়েছে। সুতরাং আমরা যে বেরিয়ে এসে একটি সাংঘাতিক কাজ করেছি, এটি মনেই হয় নি। আমাদের বের হতে হবে বেরিয়েছি, ব্যাস। আমাদের বাবা-মা চিন্তা করত, আমরা না।[১২১]

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারীগণ ভাষা-আন্দোলনের জনমত গঠন, পোস্টার তৈরি ও লাগানো, চোঙ্গা দিয়ে প্রচারণা, মিটিং, মিছিল প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছেন। ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নারী সদস্যরাও যার যার অবস্থান থেকে তৎপর ছিলেন। ফরিদা হাসান, রমা দত্ত, আরতি দত্ত, প্রণতি দস্তিদার, জওশন আরা বুলবুল, খালেদা খান, জাহানারা জুবলী, গীতা দত্ত (কল্পনা যোশীর ছোটবোন), কবিতা, হালিমা, সেলিনা, আখতার বানু, বিজয়লক্ষ্মী, নূরুন নাহার, মালেকা আজিম খান, খুরশীদা আজিম খান, লতিফা আজিম খান, ডা. লায়লা, চেমন আরা বেগম, ফৌজিয়া সামাদ প্রমুখ ডা. খাস্তগীর স্কুল থেকে সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সাল থেকে আরতি দত্ত এবং প্রণতি দস্তিদার আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু আত্মগোপনে থেকেও তারা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।[১২২] চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল প্রগতিশীল আন্দোলনেই নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

টেকনাফ

পঞ্চাশের দশকের যাতায়াত ব্যবস্থার বিবেচনায় টেকনাফ দুর্গম এলাকা হিসেবে গণ্য হতো। সরাসরি টেকনাফ-কক্সবাজার কোনো সড়ক যোগাযোগ ছিল না, যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল জলপথ ও জলযান। টেকনাফের মত অনুন্নত, দুর্গম অঞ্চলেও ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে, যখন সেখানে কোনো হাইস্কুলও ছিল না। এ ঘটনা এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে, সংবাদ প্রতিবেদনে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল, 'টেকনাফে মিছিল করেছিল ছাত্রীরা'।[১২৩]

কুমিল্লা

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রদত্ত বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তৃতা এবং সেটি অবহেলিত হলে সারা দেশব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার ঢেউ তার জন্মভূমিতেও এসে লাগে। এর প্রতিক্রিয়ায় ১ মার্চ এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরবর্তীসময়ে ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার প্রশ্নে সারা দেশ যখন উত্তপ্ত তখন কুমিল্লাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর কুমিল্লায় পৌঁছালে কুমিল্লা শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। বাড়ি বাড়ি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সবাই কালো ফিতা ধারণ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় টাউন হল লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিরাট মিছিল বের হয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে।[১২৪] এই মিছিলে কুমিল্লার ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী লায়লা রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে ছাত্রীদের ভূমিকার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়:

.... ফয়জুন্নেসা ছিল কুমিল্লাতে নামকরা স্কুল, ছাত্রী সংখ্যাও বেশি। ছাত্ররা স্কুলের সামনে শ্লোগান দিতে লাগল-বোনেরা আমার, ঢাকাতে আমাদের ভাইয়েরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তাদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত। আমরা এর প্রতিবাদ করছি, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই, বাংলা চাই, মায়ের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার বৃথা আশা। ইতিমধ্যে দারোয়ান গেটে তালা দিয়েছে, শ্রেণীকক্ষ থেকে বাইরে আসার সাহস কারো নাই। আমি সেদিন অসুস্থ থাকায় স্কুলে যাইনি। এরপর কি ভেতরে বসে থাকা সম্ভব? দৌড়ে গেটের কাছে এলাম ততক্ষণে যেভাবেই হোক কিছু ছাত্রী বাইরে বের হয়ে এসেছে। আমাকে পথ আগলে দাঁড়ালেন মেট্রোন খালাম্মা। গেটে তালা। আমার ভেতরটা তখন দাউদাউ করে জ্বলছে। গেটের পাশেই ছিল একটা কাঠগোলাপের কাছ। আমি তরতর করে ঐ গাছ বেয়ে দেয়ালে উঠলাম। আর চোখের পলকে দেয়ালের ঐ পাড়ে চলে গেলাম। স্কুলের পুকুর পাড়ের দিকে একটু জায়গা বেড়া ভাঙ্গা ছিল, আমি ঐ পথে স্কুলে ঢুকলাম এবং সবার বাধা অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে চিৎকার করে সবাইকে বাইরে আসতে বললাম, তারা কি তখন আর আটকা থাকে? সবাই মাঠে নেমে এলো। এবং ঐ ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেদিকে পারল বের হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল অনেক ছাত্র-ছাত্রীই রাস্তায় নেমে পড়েছে।[১২৫]

পরবর্তীসময়ে মিছিলটি শৈলরাণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে স্লোগানরত ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রনেতৃবৃন্দ মেয়েদের নিরপত্তার জন্য সর্তক ছিলেন। বিকেলে অভিভাবকদের কাছে তাদের মেয়েদের বুঝিয়ে দেয়া হয়। কোনো কোনো মেয়েকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল। লায়লা রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে আরও জানা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবরে ফয়জুন্নেছা স্কুলের হোস্টেলের কোনো ছাত্রী ভাত খায়নি। ভাতসহ থালা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। রাতে হোস্টেলের মধ্যেই মিছিল করে স্লোগান দিয়েছিল।[১২৬] এছাড়াও ২৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মিস সাবিহা খাতুনের সভাপতিত্বে কুমিল্লার স্কুল কলেজের ছাত্রীদের এক সভা হয়। সভায় ঢাকার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।[১২৭] কুমিল্লায় একুশে উদযাপনেও নারীর ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩ এবং ৫৪ সালে একুশে উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন ফাতেমা খায়ের, ফরিদা মীর্জা এবং ছালেহা খাতুন।[১২৮]

নোয়াখালী

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই আন্দোলন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাপ্রবাহ নোয়াখালীতেও পৌঁছে এবং তা এই অঞ্চলের নারীদের মধ্যেও প্রসারিত হয়। মিছিলে মিটিং এ নোয়াখালীর নারীরাও অংশ নেন।[১২৯]

ফেনী

২১ ফেব্রুয়ারি ফেনীতে ছাত্র মিছিল, ধর্মঘট ও সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে হয়। কিন্তু ঐ দিন রাতে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হওয়ার খবর আসার পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন 'ছাত্র হত্যার বিচার চাই', 'খুনী নুরুল আমিনের কল্লা চাই' স্লোগানে ফেনী শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন ফেনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[১৩০]

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তৎপরতা বেশি ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা থেকে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা একটি শোভাযাত্রা বের করেন, সেখানে উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।[১৩১] ভাষা আন্দোলনে স্থানীয় সরোজিনী গার্লস

স্কুলের ছাত্রীদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। এই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কবি আবদুল কাদিরের কন্যা সুলতানার নেতৃত্বে স্কুলের অন্য ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।[১৩২] সুলতানা মিছিল নিয়ে কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে আসতে চাইলে কর্তৃপক্ষের বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় তিনি অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে গেট ভেঙে কলেজ মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া আম্বিয়া খাতুন, হোসনে আরা খান, রওশন আরা হেনা, রহিমা খাতুন, মোহসেনা বেগম, নূরজাহান বেগমসহ অনেক ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৩৩]

ভাষা আন্দোলনে নারী: রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী

১৯৪৮ সাল থেকেই রাজশাহীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের প্রথম দিক থেকেই এ আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে দিনব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন বিকেলে ভুবন মোহন পার্কে ডা. এস. এম এ গাফ্ফারের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। এই জনসভায় জাহানারা বেগম, 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা- আজ জেগেছে সেই জনতা' গানটি পরিবেশন করেন।[১৩৪] ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনা রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়লে ২২ ফেব্রুয়ারি আতাউর রহমানের নেতৃত্বে রাজশাহীতে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরের দিনের মিছিল এবং প্রতিবাদ সভায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য হাফিজা বেগম, ফিরোজা বেগম, হাসিনা বেগম, খুকু এরা সকলে মিলে একটি পাল্কী গাড়িতে করে মাইকের পরিবর্তে চোঙ্গা নিয়ে প্রচারণায় বের হন।[১৩৫] ২২ ফেব্রুয়ারি বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হলে সেই মিছিলে ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রীদেরকে মিছিলে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন পি. এন. গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মনোয়ারা বেগম। মনোয়ারা বেগম স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এবং মিছিলে গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রীদেরকে বুঝিয়ে মিছিলে অংশ নেয়ার জন্য একত্র করার চেষ্টা করেন। তার কথা শুনে ক্লাস বর্জন করে ছাত্রীরা মিছিলে অংশ নেন। মিছিল পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দশম শ্রেণির ছাত্রী হাফিজা বেগম টুকু, জাহানারা বেগম, মহসিনা বেগম ও অন্যেরা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্দোলনের পক্ষেই সমর্থন দেন। শিক্ষিকাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা নূরমহল খাতুন, হাজেরা বেগম, মনসুরা বেগম, মিনতি, স্নেহ, গীতা, হালিমা, নিরুপমা প্রমুখ। লম্বা মিছিলটি স্কুল থেকে বেরিয়ে সাগরপাড়া ঘুরে কল্পনা হল হয়ে আলুপট্টির মোড় ঘুরে জুবিলী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভুবনমোহন পার্কে যায়। সেখানে গিয়ে অন্যান্য ছাত্রের সাথে বক্তব্য দিয়েছিলেন মনোয়ারা বেগম, ডা. মহসিনা বেগম প্রমুখ।[১৩৬] এ বিষয়ে ভাষাসংগ্রামী আখতার বানুর স্মৃতিচারণ:

> পার্কের খোলা বাঁধানো মঞ্চে ছাত্র ভাইদের সাথে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন মনোয়ারা আপা, মহসিনা আপা। কি তীব্র ঝাঁজালো সেই বক্তৃতার কথা। ঢাকায় গুলিবিদ্ধ শহীদ ভাইদের নিহত হবার খবর, পুলিশী নির্যাতন আর তৎকালীন শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের বর্ণনা শুনে বুকের ভেতরটায় যেন কষ্টের ঝর্ণা ধারা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরে বুক ভেজাতে লাগলো। সব কথা বুঝিনা, অত শক্ত শক্ত কথার মানেও জানি না, কিন্তু অবুঝ এক ভাবাবেগ মনটাকে অনবরত দলিত মথিত করতে লাগলো। জাহানারা বেগমের কণ্ঠস্বরও সকলকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একাকার করে তুললো।[১৩৭]

রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক আন্দোলনে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ। মিছিল, সভা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন জাহান আরা বেগম, বেগম মনোয়ারা রহমান, মোহসিনা বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম, রওশন আরা, খুরশীদা বানু, ফিরোজা বেগম, ফুলু, নুরমহল খাতুন, হাজেরা, আবেদা, মিনতি, স্নেহ, গীতা, মনোয়ারা বেগম, হাসনা বেগম, হালিমা, মনসুরা, নিরুপমা, সারা খন্দকার, বীণাপাণি বসাক, আরজু, জুলেখা বেগম, আখতার

বানু।[১৩৮] রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে নারীদের সরব এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। রাজশাহীর অন্যতম ভাষাসংগ্রামী আব্দুর রাজ্জাক এ প্রসঙ্গে বলেন, "নারীরা মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করত এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহেও তারা ভূমিকা রেখেছে। তাদের বড় ভূমিকা ছিল চিঠি আদান প্রদানে। তারা কুরিয়ার হিসেবেও কাজ করেছে। তাদের অংশগ্রহণ ছিল প্রগতির সপক্ষে একটি বড় পদক্ষেপ। পরবর্তী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের সহায়ক শক্তি হিসেবে এটি কাজ করেছে।"[১৩৯] রাজশাহীতে আন্দোলন সংগঠন থেকে শুরু করে পোস্টার তৈরি ও বিতরণ, অর্থ-সংগ্রহ, সংবাদ আদান প্রদান, মিটিং মিছিলে যোগদান ইত্যাদি কাজে নারীগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্মিত রাজশাহীতে ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের নামফলকে নারী ভাষাসংগ্রামীদের মধ্যে জাহানারা বেগম বেগু, মহসিনা বেগম, জেরিনা বেগম, কুলসুম বেগম, মনোয়ারা বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি এবং রওশন আরা খুকুর নাম পাওয়া যায়।[১৪০]

নাটোর

নাটোরে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বেগম শামসুন্নাহার। তার নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নাটোরে 'মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতি' গঠন করা হয়। সমিতির উদ্যোগে নাটোরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রকাশ্য মাঠে জনসভার আয়োজন করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলা হয়।[১৪১] ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতির উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বিরাট মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। পরবর্তীসময়ে চৌধুরী সাহেবের মাঠে বেগম শামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করা হয়। এই সংবাদ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

> নাটোর, ২৯ ফেব্রুয়ারি। ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতির উদ্যোগে অদ্য এক বিরাট মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার সভানেতৃত্বে চৌধুরী সাহেবের মাঠে এক সভা হয়। সভায় বক্তৃতাদির পর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচার এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করা হয়।[১৪২]

নাটোরে আগে থেকেই বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য বেগম শামসুন্নাহারের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই তার আহ্বানে নাটোরের নারীরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তার সাথে অন্য যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারা খাতুন, জাহানারা বেগম, সালেহা খাতুন প্রমুখ। এদের সবাই নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতির সদস্য ছিলেন।[১৪৩] এছাড়া নাটোরের ভাষা আন্দোলনে নাটোর গার্লস হাই স্কুলের (বর্তমানে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। ক্লাস বর্জন এবং মিছিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন।[১৪৪]

পাবনা

পাবনায় ১৯৪৮ সাল থেকেই বাংলা ভাষার প্রশ্নে জনমত গড়ে ওঠে। তখন থেকেই বাংলা ভাষার দাবি আদায়ে প্রতিবাদ, হরতাল ও আন্দোলন চলতে থাকে। ১১ মার্চ ছাত্র হরতাল ও শোভাযাত্রার কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচি সফল করার জন্য সেই সময় সরকারি রক্তচক্ষু ও দমননীতি উপেক্ষা করে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সেলিনা বানু।[১৪৫] ১৯৪৯ সালেও পাবনায় প্রচারপত্র ও পোস্টারের মাধ্যমে আন্দোলনকে চালিয়ে নেয়া হয়। আর এই তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৪৯ সালের ১৩ আগস্ট কমিউনিস্ট কর্মী লিলি

চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সচেতন ছাত্র মহল রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে আবার সংগঠিত হতে থাকে। সেই সময় পুরুষের পাশাপাশি পাবনার নারী সমাজও রাজপথে নেমে আসেন। ভাষা আন্দোলনে পাবনার যে সকল নারী রাজপথে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সেলিনা বানু, সারোয়ারী জাহান, সাবেরা মুর্শেদ, রোকেয়া বেগম, দীপ্তি লোহানী প্রমুখ। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন মিছিলে তারা সামনের সারিতে থাকতেন। রক্ষণশীল পরিবেশে বসবাস করেও আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তারা। এ এম এ হামিদের মতো মুসলিম লীগ নেতার পরিবারের নারী হয়েও সারোয়ারী জাহান বলিষ্ঠভাবে রাজপথে নেমে এসেছিলেন। তার সম্পর্কে সৈয়দ রেজা কাদের লিখেছেন, "তাঁকে অনেকেই চিনবে না। তাঁর নাম সারোয়ারী জাহান। কোরেশী পরিবারের একজন। তাঁর পক্ষে রাজনীতি করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই সাহসী মহিলা সংস্কার ভেঙে আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। টাউন হলের জনসভায় আমাদের সঙ্গে বক্তৃতা করেছেন বোরখা পরে"।[১৪৬] ১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের আহ্বানে ঢাকার বার এসোসিয়েশন হলে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা আন্দোলনের সার্বিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন। পাবনার আবদুল মোমিন তালুকদার সম্মেলনে বক্তৃতার এক পর্যায়ে উল্লেখ করেন, "এর আগে পাবনা শহরে কোনোদিন মহিলারা রাস্তায় বের হয় নি, কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মিছিলে তাঁরা দলে দলে যোগদান করেন"।[১৪৭] এভাবেই সামাজিক রক্ষণশীলতা, সরকারি রক্তচক্ষু এবং দমননীতিকে উপেক্ষা করে পাবনার নারীসমাজ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঈশ্বরদী

ঢাকার ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর পাবনায় আসলে ঈশ্বরদীর ছাত্রনেতাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে তারা স্কুলের সকল ছাত্রদের একত্র করে বর্তমানে খবিরের চায়ের দোকানের মোড়ে একটি পুরানো বটগাছের নিচে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশ শেষ করে মিছিল করে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রীদের ক্লাস বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। ছাত্রীরাও তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। আন্দোলনে যেসব ছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে সুফিয়া বেগম, জাহানারা প্রধান, নূরজাহান বেগম, হালিমা খাতুন, রাবেয়া খাতুন এর নাম উল্লেখযোগ্য।[১৪৮]

বগুড়া

ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই বগুড়া সংশ্লিষ্ট ছিল। ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল ও বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে।[১৪৯] বগুড়ায় নারীদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন রহিমা খাতুন ও সালেহা খাতুন।[১৫০] কবি আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক করে গঠিত 'বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটি'র সদস্য ছিলেন তারা। ভাষা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা বিষয়ে গাজীউল হকের স্মৃতিচারণ:

> পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিতের পর মুসলিম পরিবার থেকে এ দু'জন ছাত্রীর দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা সেদিন বগুড়াবাসীকে বিস্মিত না করে পারেনি। রহিমা খাতুন সম্পর্কে একটি কথা না বলে পারছি না। তিনি যখন আমাদের এ কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হলেন তখন তার সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়ার জন্য আমরা তার অভিভাবক ডাক্তার মুজাফফর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মুজাফফর সাহেব আমাদের কথা শুনে বললেন, 'বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্য আমার বোন সংগ্রাম কমিটির সদস্য হয়েছে এতে আমি গর্ববোধ করছি।[১৫১]

তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ অন্য নারীদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল।

জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল মূলত ১৯৫২ সালে। স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতাদের বিরোধিতার কারণে এর পূর্বে এখানে ভাষা আন্দোলনের তেমন তৎপরতা লক্ষ করা যায় না। জয়পুরহাটের যারা ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অনুরাধা ভট্টাচার্য, শামসুন্নাহার, জীবননেসা, মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী অন্যতম।[১৫২]

নওগাঁ

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকেই নওগাঁয় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ নওগাঁয় হরতাল পালিত হয়। সেই সময় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে আয়েশা, জ্যোৎস্না, মমেনার নাম উল্লেখযোগ্য।[১৫৩]

১৯৫২ সালে নওগাঁয় ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নওগাঁ শহরের ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয়ে মাদ্রাসা মাঠে একটি সভা হয়। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারি সর্বাত্মক ধর্মঘট ও প্রতিবাদ দিবস সফল করার আহ্বান জানানো হয়। সভা শেষে গণসংগীতের মাধ্যমে জন-সাধারণকে উদ্দীপ্ত করা হয়। সভায় অন্যান্যের সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেন হীরা, বেনু এবং ফিরোজা বেগম।[১৫৪] ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নওগাঁয় সফলভাবে ধর্মঘট পালিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে নিয়ামতপুর থানার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। এছাড়া নওগাঁর শামসুন নাহার রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৫৫ সালে সামরিক শক্তি কালো ব্যাজ ধারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে নওগাঁর ছাত্রীরা তখন কালো শাড়ী পরতে শুরু করে।[১৫৫] ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভের পূর্ব পর্যন্ত নওগাঁয় ভাষা আন্দোলন চলমান ছিল।

সিরাজগঞ্জ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পিছিয়ে ছিলেন না সিরাজগঞ্জের নারীরাও। সিরাজগঞ্জ ভাষা আন্দোলন কমিটির তত্ত্বাবধায়নে সালেহা ইসহাক স্কুলের ছাত্রী বিজলী, মেহের নিগার প্রমুখ ছাত্রীর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে প্রথম ছাত্রীদের মিছিল হয় ।[১৫৬] ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে যে প্রতিবাদ মিছিল হতো তাতে প্রতিদিনই সালেহা ইসহাক স্কুলের ছাত্রীরাও অংশ নিতেন।[১৫৭] ভাষা আন্দোলন অব্যাহত রাখতে তহবিল সংগ্রহের কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন সিরাজগঞ্জের নারীরা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক' ব্যাজ ছাপিয়ে বিক্রি করতেন তারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইরা (ডা. মোস্তফা নূরুল ইসলামের স্ত্রী), হেনা (আমির হোসেন উকিলের মেয়ে), বিজলী (শামসুজ্জোহা মল্লিক উকিলের মেয়ে), মনিকা (খোরশেদ আলমের বোন), মেহের নিগার (আবুল মনসুর নূরে এলাহীর মেয়ে)।[১৫৮] অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহ থেকে শুরু করে মিছিল, ধর্মঘট সকল ক্ষেত্রেই সিরাজগঞ্জের নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

ভাষা আন্দোলনে নারীঃ রংপুর বিভাগ

রংপুর

রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকেই রংপুরে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে মিছিল কারমাইকেল কলেজ ছেড়ে শহর অভিমুখে যাত্রা করলে শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং জনসাধারণ এতে যোগদান করেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে রংপুরে ভাষা আন্দোলনের সংগঠক অধ্যাপক গোলাম আযম এবং অধ্যাপক জমিরউদ্দিন আহম্মেদকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের গ্রেফতারের খবরে রংপুরের ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অন্যদের সাথে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন মিলি চৌধুরী এবং নীলুফার বানু ডলি।[১৫৯] সভার পরপরই কলেজ থেকে ছাত্র, শিক্ষক, জনতার একটি বিশাল মিছিল শহর অভিমুখে যাত্রা করে। মিছিলটি যখন জেলা জজ কোর্টের সামনে পৌঁছল সেই মুর্হূতে জজ সাহেব ইংরেজিতে একটি মামলার রায় ঘোষণা করছিলেন। তখন মিলি চৌধুরী এজলাসে প্রবেশ করেন এবং চিৎকার করে বললেন ইংরেজিতে নয়, বাংলায় রায় ঘোষণা করতে হবে। এক পর্যায়ে তিনি জেলা জজ সাহেবের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। এ ঘটনায় জেলা জজসহ এজলাসের সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।[১৬০] ২৭ ফেব্রুয়ারি পাটগ্রাম হাইস্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ শোভাযাত্রা বের করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'গুলি বর্ষণের তদন্ত চাই', 'আটক ছাত্রদের মুক্তি চাই' স্লোগান দিতে দিতে বন্দরের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে।[১৬১] মিলি চৌধুরী ছাড়া রংপুরের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মাসুদা চৌধুরী এবং মিসেস ডলি।[১৬২] এছাড়া নেপথ্যে থেকে যারা সবরকম সাহায্য, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন তাদের মধ্যে বেগম আফতাবুন্নাহারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৬৩] ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রংপুরে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যে সকল নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন সাজেদা রহমান, শামিমা জামান, মিসেস ডলি, মিসেস মিলি চৌধুরী, প্রতিভা সমাদার, চিত্রা দাসগুপ্তা প্রমুখ।[১৬৪] তাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই জনসাধারণের মাঝে ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনাকে ধারণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

দিনাজপুর

দিনাজপুর শহরে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই আন্দোলনে জড়িত ছিল মূলত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। ২৯ ফেব্রুয়ারি পাবর্তীপুর, জ্ঞানাঙ্কুর এইচ. এ. ই স্কুল, রেল প্রাইমারী ইউপি স্কুল এবং গার্লস এম. ই স্কুলের আনুমানিক এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস বর্জন করে মিছিল করে হাই স্কুলের ময়দানে একত্র হয়।[১৬৫] ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে সাফল্যের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। বর্তমান দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ ভবন থেকে সকাল এগারটায় ছাত্রদের এক মিছিল মুন্সীপাড়া মালদাহ পট্টি জেলখানার পেছন দিয়ে, লিলি সিনেমা হলের মোড় হয়ে তৎকালীন হাই মাদ্রাসার মাঠে এসে শেষ হয়। অনেক পথ পায়ে হেঁটে মিছিল করায় স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। কচিমনি ও খুকুমনির নেতৃত্বে নারীরা তাদের পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৬৬]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং স্বরদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সম্পৃক্ত ছিলেন।[১৬৭] দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী হালিমা আখতার দিনাজপুর জেলা স্কুলের মাঠে ভাষা আন্দোলনের সব মিটিংয়ে যোগদান করতেন। তিনি একই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সেলিনা, রোকেয়া, শামসুন্নাহার, আবিদাসহ

আরও অনেকের সাথে ভাষা আন্দোলনের মিছিল মিটিংয়ে সোচ্চার ছিলেন।[১৬৮] এছাড়া দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে যে ছাত্রীগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন হামিদা হক, মমতাজ বেগম, আমিনা দানেশ, রওশন আরা, জান্নাতুল আরা প্রমুখ।[১৬৯] ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিনাজপুরে লাগাতার ধর্মঘট, মিছিল এবং সভার আয়োজন করা হয়। কাদের বক্স উকিল সাহেবের স্ত্রী কয়েকটি সভায় সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৭০] সভায় উল্লেখযোগ্য হারে নারীর উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে ২ মার্চ দিনাজপুর শহরে অন্যদের সাথে গ্রেফতার হয়েছিলেন আমেনা খাতুন।[১৭১]

নীলফামারী

১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি নীলফামারীতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। নীলফামারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং নীলফামারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় সব ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট, মিছিল, মিটিংয়ে অংশ নেয়। এই দিনেই নীলফামারীর ইতিহাসে ছাত্রীরা প্রথমবারের মত প্রকাশ্য মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করে।[১৭২] ৭ ফেব্রুয়ারি নীলফামারীতে হরতাল পালিত হয়। জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে মিছিলসহ শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে জাকিউল আলমের সভপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় অন্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন সুফিয়া, রাহেলা এবং ফিরোজা বেগম।[১৭৩] সম্পূর্ণ ফেব্রুয়ারি মাসেই ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ অব্যাহত থাকে। সকল কর্মসূচীতেই উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

গাইবান্ধা

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গাইবান্ধার জনগণ ১৯৪৮ সাল থেকে তেমন সক্রিয় না হলেও সীমিত আকারে ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালে গাইবান্ধায় ভাষা আন্দোলন সক্রিয় রূপ লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সকাল থেকেই শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। স্থানীয় স্কুল, কলেজ এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট পালন করে। সকাল এগারটায় প্রায় পনেরশত ছাত্র-ছাত্রীর এক শোভাযাত্রা বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে।[১৭৪] গাইবান্ধায় ভাষা আন্দোলনের সাথে যে সকল নারী সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দৌলতননেছা খাতুন।[১৭৫]

পঞ্চগড়

তৎকালীন জনবিরল পঞ্চগড়েও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল। তবে ছাত্রসমাজ সূচিত এই ভাষা আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট, মিছিল, সভা এবং কখনো পিকেটিং এ সীমাবদ্ধ ছিল। পঞ্চগড়ে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রেজিয়া খাতুন।[১৭৬]

ভাষা আন্দোলনে নারী: বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

বরিশালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৮ সালে হলেও আন্দোলনে নারীরা অংশগ্রহণ করেন মূলত ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। বরিশালে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার[১৭৭], রাণী ভট্টাচার্য[১৭৮], হোসনে আরা বেগম (নিরু), মঞ্জুশ্রী সেন, আনজিরা বেগম, সবিতা সাহা, দিবা সরকার, হালিমা খাতুন, নূরজাহান, লুৎফা জাহান, মাহেনুর বেগম, মিসেস অবনিনাদ ঘোষ, বীণা ঠাকুর প্রমুখ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন জগদীশ সারস্বত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের

শিক্ষিকা রাণী ভট্টাচার্য ঐ স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে এক বিরাট মিছিল বের করেন। এ বিষয়ে রাণী ভট্টাচার্য বলেন, "আসলে মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা যে ভাষায় কথা বলতে পারছি সেই ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে, তা মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই নিজের বিবেকের তাড়নায় সেদিন আমি আর এক শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী মিছিলে গিয়েছিলাম। সকলের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও।"[১৭৯] তার স্মৃতিচারণ:

> ... ১৯৫২ সালে আমি তখন জগদীশ সারস্বত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি শিক্ষকদের বললাম ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে যোগ দিতে, কিন্তু কেউই সাহস পায়নি। আমি মেয়েদের নিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। তখন সদর গার্লস স্কুল সরকারি হয়নি। সে স্কুলের কাছে মিছিল নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাদেরকে স্কুল হতে বের হতে দেয়নি। আমরা টাউন হল থেকে মিছিল করে কাঠপট্টি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বিরাট মিছিল। এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করেছি।[১৮০]

বরিশালের অন্যতম বৃহৎ এ মিছিলে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং নারীরা অংশ নেয়। প্রায় বিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ মিছিলটি সমগ্র বরিশাল অঞ্চলে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। মিছিলটি টাউন হল থেকে বের হয়ে বাজার রোড, বান্দ রোড, ক্লাব রোড, পুলিশ লাইন হয়ে বগুড়া রোড দিয়ে টাউন হলে এসে সমাপ্ত হয়। এ মিছিলে নারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেগম হামিদউদ্দিন এবং হোসনে আরা নিরু।[১৮১]

২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদে বরিশাল শহরে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল হয়। অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে ভোর হতেই ছাত্র জনতা জড়ো হতে থাকে। গ্রাম হতে আগত জনতা ছাড়াও শহরের শত শত নারী বেগম শামসুন্নাহারের নেতৃত্বে প্রথম শোভাযাত্রা করেন। মিছিলের প্রথম দিকে ছিলেন মেয়েরা তারপর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। বৃহত্তম এই মৌন মিছিলটি টাউন হল হতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে সার্কিট হাউজ ময়দানে শেষ হয়।[১৮২] ২২ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন থেকেই সাধারণ নারীরা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। চাঁদা তুলে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন ছাত্রীরা। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল ও বাসায় গিয়ে নারীদেরকে সংগঠিত করে মিছিলে যোগদান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেও তারা ভূমিকা রাখেন। এই ভাষা আন্দোলনের সময়েই প্রথম বারের মতো বরিশালের নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে মিছিলে, আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

ঝালকাঠি

ভাষা আন্দোলনের সময় ঝালকাঠিতে কোনো কলেজ না থাকায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি স্কুলগুলোতে হরতাল পালনের চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি। কিন্তু ঢাকার মিছিলে ছাত্রহত্যার খবর ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে ঝালকাঠিতে পৌঁছানোর সাথে সাথে উত্তেজিত ছাত্ররা বাইরে বেরিয়ে আসে। সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের নেতৃত্বে ঝালকাঠি সরকারি বালক বিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিল বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছালে ছাত্রদের কাছ থেকে ঢাকায় গুলিবর্ষণের খবর ছাত্রীরা পান এবং ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী লাইলী বেগমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। বিক্ষোভ মিছিল উদ্বোধন বিদ্যালয়ের কাছে আসলে সেখান থেকেও ছাত্রছাত্রীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে ঝালকাঠি বালিকা বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়।[১৮৩]

ভাষা আন্দোলনে নারী: সিলেট বিভাগ

সিলেট

ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় থেকেই নারীরা এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের ঢাকার আন্দোলনের পূর্বেই সিলেটের নারীরা পাকিস্তানের যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুর রব নিশতার এর নিকট রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি পেশ করেন। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়েও ১৯৫২ সালে সিলেটে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি মাসের আন্দোলনেও নারীরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে সিলেটেও সভা সমাবেশ চলছিল। ঐ দিন বিকেলে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সিলেটে ঢাকার মিছিলে গুলিবর্ষণের সংবাদ আসলে সিলেটের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই মিছিলে নারীদেরও অংশগ্রহণ ছিল। অনিল কুমার সিংহ সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

> ... সেদিনের মিছিল জিন্দাবাজার হয়ে পয়েন্ট থেকে পূর্বদিকে গিয়ে নয়াসড়ক, ধোপাদিঘীর পাড়, নাইওরপুল, রংমহলের সামনে দিয়ে এসে গোবিন্দচরণ পার্কের দক্ষিণ গেট দিয়ে পার্কের ভিতর জমা হয়েছিল। এই মিছিলের বিশেষত্ব ছিল ছাত্রীরা মিছিলের পুরোভাগে আর ছাত্র জনতা ছিল মিছিলের পেছনের সারিতে। সেই মিছিলের স্লোগান ছিল 'খুনের বদলে খুন চাই', 'নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি। গোবিন্দচরণ পার্কের ভিতরের লাইট পোস্টের নীচে গোল করে মেয়েরা বসে পড়েছে। ছেলেরা দূরত্ব বজায় রেখে মেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।[১৮৪]

২২ ফেব্রুয়ারি নারী নেত্রীবৃন্দ শহরের পাড়ায় পাড়ায় প্রচারণা চালান এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি নারীরা শহরে এক বিরাট মিছিল বের করেন। সিলেট শহরে নারীদের এত বড় মিছিল এর আগে হয়নি। মিছিলটি সকাল এগারটায় শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে গোবিন্দচরণ পার্কে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে পার্কে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরী[১৮৫] এবং অন্যান্য নারী ও ছাত্রী নেতৃবৃন্দ। বিকেলে নারীদের আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ এর মূল সভাকক্ষ জিন্নাহ হলে, যা বর্তমানে শহিদ সুলেমান হল হিসেবে পরিচিত।[১৮৬] পরবর্তীসময়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি সিলেটে নারীদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এতে অনেক সম্ভ্রান্ত নারীসহ স্কুল কলেজের ছাত্রীরাও যোগদান করেন। তারা ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের তদন্ত এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন।[১৮৭] পরবর্তীসময়ে ১ মার্চ পর্যন্ত সিলেটে সাধারণ ধর্মঘট হয়। ৫ মার্চ হরতাল পালিত হয়। এ সময় আন্দোলন সিলেট শহর ছাড়িয়ে মহকুমা ও থানা শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনগুলোতেও নারীর অংশগ্রহণ ছিল। সিলেটের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী[১৮৮], সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন[১৮৯], রাবেয়া আলী[১৯০], যোবেদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন[১৯১], ছালেহা খাতুন প্রমুখ। এছাড়া শরিফুনেছা খান চৌধুরী, সামসি খানম চৌধুরী, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, নূরজাহান বেগম, সৈয়দা খাতুন, মাহমুদা খাতুন প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে অবদান রেখেছেন।[১৯২] এদের মধ্যে ছালেহা খাতুন স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।[১৯৩]

সুনামগঞ্জ
ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় সুনামগঞ্জকে তেমন প্রভাবিত করতে না পারলেও ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঢেউ এখানেও পৌঁছে যায়। সুনামগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন শাহেরা বানু চৌধুরী।[১৯৪] এছাড়া হাজেরা মাহমুদ[১৯৫] সুনামগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৯৬]

মৌলভীবাজার
মৌলভীবাজারে ভাষা আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মৌলভীবাজারের বিখ্যাত সৈয়দ বংশের মেয়ে সৈয়দা নাজিবুন্নেছা খাতুন।[১৯৭]

হবিগঞ্জ
ভাষা আন্দোলনের সূচনায় হবিগঞ্জ অগ্রসর ভূমিকা না রাখলেও **১৯৫২** সালের ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। **২১** ফেব্রুয়ারি স্থানীয় ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ভাষা কমিটির উদ্যোগে 'বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা' দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং ব্যবসায়ীরা পূর্ণ হরতাল পালন করে।[১৯৮] এছাড়া ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ রেখে হবিগঞ্জের ভাষা আন্দোলন পরিচালনায় যারা ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য শান্তি দত্ত।[১৯৯]

ভাষা আন্দোলনে নারী: খুলনা বিভাগ

খুলনা
১৯৪৮ সালের **১১** মার্চ প্রদেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়েছিল তখন থেকেই খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস ও কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে একটি প্রচারপত্র তৈরি করা ও পুরানো খবরের কাগজে আলতা দিয়ে পোস্টার লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীসময়ে যে প্রচারপত্রটি ছাপা এবং বিতরণ করা হয়েছিল তাতে বাংলা ভাষা সমর্থনকারী যেসব সংগঠনের নাম ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।[২০০] **১৯৪৮** সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের মধ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন আনোয়ারা খাতুন, রেবা, লুৎফুননাহার, ফাতেমা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, সাজেদা হেলেন, কৃষ্ণাদাস, সুফিয়া আলী প্রমুখ।[২০১]

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়েও খুলনায় নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। **১৯৫২** সালের **২১** ফেব্রুয়ারি খুলনা করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে স্কুলের দেয়ালে বাংলা ভাষার পক্ষে হাতে লিখে পোস্টার লাগান।[২০২] **২১** ফেব্রুয়ারি ঢাকার মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার খবর **২২** ফেব্রুয়ারি খুলনায় আসলে খুলনায় ভাষা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। খুলনার ছাত্রী সমাজও এই সময় ভাষা আন্দোলনে তৎপর হয়ে ওঠেন। এই সম্পর্কে খুলনার করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রী নেত্রী রোকেয়া মাহবুব শিরি বলেন:

> ২২ ফেব্রুয়ারি স্কুলে এসে জানতে পারি যে, সালাম, রফিক, বরকতসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র জনতা ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। এই কথা কোনোর পর স্কুলের ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কোথাও কালো কাপড় পাওয়া যাচ্ছিল না। লাইলী নামে একজন ছাত্রী কালো কাপড় পরে স্কুলে এসেছিল। ছাত্রীরা তখন অন্য শাড়ী এনে তাকে পরতে দেয়। আর তার কালো শাড়ী কেটে ব্যাজ বানিয়ে ছাত্রীরা ধারণ করে।[২০৩]

২৩ ফেব্রুয়ারিও রাষ্ট্রভাষার দাবিতে খুলনায় হরতাল, প্রতিবাদ সভা এবং মিছিল হয়। মাজেদা আলী, আনোয়ারা বেগম, রোকেয়া খাতুন (শিরি), লুৎফুন নাহার (হেলেন), রাবেয়া, কৃষ্ণা, ফরিদা মজুমদার, খায়রুল নাহার বেবী প্রমুখ ছাত্রী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে এই মিছিলে প্রায় ৫/৬ শ ছাত্রী অংশ নেন। এটা ছিল শহরে মেয়েদের প্রথম মিছিল।[২০৪] এ বিষয়ে আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী আনোয়ারা বেগম লিখেছেন:

> ... তখন খুলনায় একটিই মাত্র মেয়েদের কলেজ ছিল। খুলনা মহিলা কলেজের নাম ছিল আর কে গার্লস কলেজ। সর্বমোট আইএ, বিএ ক্লাসের ছাত্রী মিলে ছিল পয়ত্রিশ জনের মত। আমরা বিএ ক্লাসের ছাত্রী ছিলাম। মেয়েদের জন্য হাইস্কুল ছিল করোনেশন গার্লস হাইস্কুল আর রেলওয়ে বি আর সিং গার্লস স্কুল। আমরা মেয়েদের নিয়ে ক্লাস বর্জন করে মিছিল করি। বি আর সিং গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ আমাদেরকে সহায়তা করেন। বাধা দেন করোনেশন গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস তসলিমা আবেদ। তসলিমা আপার সাথে আমাদের কথা কাটাকাটি হয়। তিনি পুলিশের ভয়ও দেখান। আমরা মেয়েদের বের করে আনতে সমর্থ হই।[২০৫]

ঐদিন দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সরকারবিরোধী পোস্টারও লাগানো হয়। ঐদিন ছাত্রীদের মিছিল সম্পর্কে আর. কে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী মাজেদা আলীর স্মৃতিচারণ:

> দু'জন করে সারিবদ্ধভাবে পোস্টার হাতে পি.টি.আই স্কুলের মোড় থেকে মহেন্দ্র হীল (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড়) পর্যন্ত (পুরা আহসান আহমেদ রোড) মিছিলটি লম্বা হয়েছিল। রত্না ও কৃষ্ণা শ্লোগান বলার জন্য বড় বড় চোঙা যোগাড় করেছিল। শ্লোগানের ভাষা ছিল "নুরুল আমিন গদি ছাড়ো", "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই", "শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না", "ফ্যাসিষ্ট শাহী গদি ছাড়ো", "রাষ্ট্রভাষা উর্দু কিছুতেই মেনে নেবো না" ইত্যাদি।[২০৬]

মিছিলটি আহসান আহমদ রোড, যশোর রোড, পিকসার প্যালেসের মোড় ঘুরে এসে তৎকালীন মহিলা পার্ক মহেন্দ্র হিলে আসে। মহেন্দ্র হিলে ছাত্রী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার মাধ্যমে মিছিল এবং সভা শেষ হয়। এ মিছিল শহরে বিশেষ সাড়া জাগায়। রাস্তার দুই পাশের মানুষ তাদের করতালি দিয়ে উৎসাহিত করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে এম. এ. গফুরের সভাপতিত্বে মিউনিসিপ্যাল পার্কে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি এম. এ. গফুরকে আহ্বায়ক করে খুলনায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির উদ্যোগে হরতাল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে আন্দোলন খুলনার মফস্বল এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালের ভাষা দিবসেও খুলনার মেয়েরা পৃথকভাবে মিছিল করে পার্কে একত্র হয়ে সভা করে। সভায় বক্তৃতা করেছিলেন রোকেয়া মাহবুব শিরি।[২০৭] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> ১৯৫৩ সালে যখন আবার একুশে ফেব্রুয়ারি এসেছে তখন মেয়েরা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আলতা দিয়ে ফেস্টুন লিখেছিল, ব্যাজ পরিধান করেছিল। অনেককে বাড়ী থেকে আসতে দিতে চায় নি। তারা ভোর রাতে উঠে চলে এসেছে। স্কুলের সামনে এসে মেয়েরা জড়ো হয়েছিল কিন্তু স্কুলের দরজা বন্ধ ছিল। ফলে হোস্টেল থেকে মই এনে স্কুলের দেয়াল পার করে মেয়েদের হোস্টেলে এনেছি। ফলে ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মেয়েদের মিছিল খুব বড় হয়েছিল। অবশ্য মিছিল শুরু হলে অনেক অভিভাবক এসে মেয়েদের হাত ধরে মিছিল থেকে টেনে নিয়ে গেছে। এরপরও বহু মেয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিল করে লেডিস পার্ক গিয়ে আমরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সভা করি। মোটামুটি নেত্রী গোছের সবাই বক্তৃতা করে। আমিও বক্তৃতা দিয়েছিলাম।[২০৮]

খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সকল পর্যায়ে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ দেখতে পাই। সেই সময়ের সামাজিক রক্ষণশীলতা, পারিবারিক বাধা নিষেধ সব কিছুকে অতিক্রম করে নারীরা ভাষার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

বাগেরহাট

ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিকে এই এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা ছিল খুবই কম। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে ধর্মঘট আহ্বান করা হলে বাগেরহাটের স্কুল ও কলেজে (মুসলিম হাইস্কুল ব্যতীত) ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাটের স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শোক মিছিল বের করেন। পিসি কলেজ সংলগ্ন তৎকালীন রামনারায়ণ পার্কে এসে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হন। দুপুরে সমাবেশ হয় এবং সেখানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি ছিল বক্তাদের মূল কথা।[২০৯]

সাতক্ষীরা

ভাষা আন্দোলনের সময় রাজধানীর সাথে সাতক্ষীরার সড়ক যোগাযোগ ছিল অনুন্নত। তাই ভাষা আন্দোলনের শুরুতে এই অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা খুবই কম ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও সাতক্ষীরার ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। সাতক্ষীরায় ভাষা আন্দোলনে নারীদের মধ্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্কুল ছাত্রী গোলেরা বেগম ও সুলতানা চৌধুরী।[২১০]

যশোর

১৯৪৮ সালে যশোরে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। যশোর থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার প্রথম প্রতিবাদ জানান মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী, ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হামিদা রহমান। তিনি যশোরে ভাষা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় একজন সংগঠক ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৩ মার্চ ভাষার দাবিতে যশোরবাসী চূড়ান্তভাবে সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠেন। ঐদিন সকাল আটটার মধ্যেই কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়। ঐ মিছিলে মেয়েদের নেতৃত্ব দেন হামিদা রহমান। তাকে সাহায্য করেছিলেন রুবী আহমেদ এবং সুফিয়া খাতুন। এর বাইরে ঐদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শহরের ঝালাইপট্টি পতিতালয়ের মেয়েরা। পুলিশ এক পর্যায়ে এই এলাকাটি ঘিরে ফেললে প্রায় চল্লিশজন ছাত্রকে পতিতারা তাদের ঘরে লুকিয়ে রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয়।[২১১] ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যশোর অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এখানে তেমন ব্যাপকতা পায়নি। ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলগুলোর অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকায় গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্ত দাবি করা হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি যশোর শহরে শহিদ দিবস পালিত হয়। ঐদিন সকাল দশটায় মধুসূদন কলেজ থেকে মিছিল বের হয় এবং মিছিল শেষে বেলা একটায় টাউন হল ময়দানে জনসভা হয়।[২১২] উক্ত শোভাযাত্রা এবং জনসভায় নারী শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিকর্মীদের উপস্থিতি ছিল।

নড়াইল

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নড়াইলের আলমডাঙ্গা আতিকুজ্জামান হাইস্কুলে হরতাল পালিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি রূপগঞ্জ কলেজ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে নড়াইলের দিলরুবা স্কুলের সামনে এসে স্কুলের ছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায়। এই মিছিলে রিজিয়া বেগম, বেবি, রবি, রুবি, শেফালী, বুলবুল প্রমুখ মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন।[২১৩]

ঝিনাইদহ
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, দোকানপাট ও বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি হরতালের খবর প্রচারের জন্য পোস্টার লিখে রাস্তায় রাস্তায় লাগানো এবং হরতালের দিন সকালবেলা মিছিল বের করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই আন্দোলনে নারীদেরকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেই বিষয়েও চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। জুনিয়র গার্লস স্কুলের শিক্ষক বেগম মনোয়ারা আহমেদের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্কুলের দুই জন ছাত্রী হাসনা এবং বেলাকে এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে বলেন। হাসনা এবং বেলা সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সিদ্ধান্ত হয় পরের দিন স্কুলে গিয়ে তারা সব ছাত্রীদের একত্র করবেন। পরের দিনের এই কর্মসূচিতে মেয়েদের আন্তরিক সাড়া পাওয়া যায়। অবশ্য এর জন্য বেলার বাবা (তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একরামুল হক) এবং মনোয়ারা বেগমকে সরকারি মহলের রোষানলে পড়তে হয়েছিল।[২১৪] ২১ ফেব্রুয়ারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুনিয়র গার্লস স্কুল, কাঞ্চননগর প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল বন্ধ করে রেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসেন। সকাল দশটায় মিছিল শুরু হলে অনেক ছাত্রী এ মিছিলে অংশ নেন। কর্মসূচিতে নেতৃস্থানীয় নারী ভাষাসংগ্রামীদের মধ্যে স্নিগ্ধা, ছন্দা, পুতুল, আনোয়ারা খাতুন ও জাহানারা খাতুন, হাসি, মনোয়ারা খাতুন, হোসনেয়ারা মাহবুব ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[২১৫]

কুষ্টিয়া
মফস্বল শহর কুষ্টিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও ভাষা আন্দোলনের তৎপরতা দেখা যায়। ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে স্কুল ছাত্রী শাহিদা খাতুন ভাষা প্রশ্নে কুষ্টিয়াবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২১৬] ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর কুষ্টিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্থানে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। এই সকল আন্দোলনে ছাত্রীগণও অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন কুষ্টিয়া ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। ২৩ ফেব্রুয়ারি তারা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। শাহিদা খাতুনের সভপতিত্বে এক শোকসভায় ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের উপর সরকারের দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহিদ ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৫ মার্চের আন্দোলনেও ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন।[২১৭]

চুয়াডাঙ্গা
১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চুয়াডাঙ্গাকেও স্পর্শ করেছিল। ১৯৫২ সালের ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ৫০-৬০ জনের একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে একটি সভা হয় এবং উক্ত সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন উষা চ্যাটার্জী।[২১৮] ৪ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। আন্দোলনে স্থানীয় গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রীদের একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।[২১৯] ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের সংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গাবাসী জানতে পারেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ভি. জে. স্কুল, গার্লস স্কুলসহ চুয়াডাঙ্গার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। ছাত্রীদের মধ্যে বেলা, পান্না, পাখি মিছিল পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে যোগদান করেন। মিছিল শেষে আলী হোসেনের আম বাগানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা দেন উষা চ্যাটার্জী, ইলা হক, বেলা, হেনা প্রমুখ।[২২০] ২২ মার্চ ভি. জে. স্কুলের ছাত্ররা একটি মিছিল নিয়ে গার্লস স্কুলে আসেন এবং ছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। রেবার নেতৃত্বে ছাত্রীরা মিছিলে যোগদান করেন। রেবা ছাড়াও ছাত্রীদের নেতৃত্বে ছিলেন রুবী, হেনা, আনোয়ারা,

বেলী, বুলবুলি, পাখী, বেলা, পান্না প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় বেলার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[২২১] চুয়াডাঙ্গার ভাষা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভি. জে স্কুল ও গার্লস স্কুল।

মেহেরপুর

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৪৮ সালেই মেহেরপুরে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে এ আন্দোলন আবার বেগবান হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত হয় 'ভাষা আন্দোলন সংগ্রাম কমিটি'। ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বর্জন, বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে আন্দোলন চলতে থাকে। সরকারি বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে ১৯৫৩-৫৫ সাল পর্যন্ত মেহেরপুরে ধারাবাহিকভাবে শহিদ দিবস পালন করা হয়। লক্ষণীয় যে এ সময় স্কুল ছাত্রীরাও মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। শুক্লা গাঙ্গুলির নেতৃত্বে রিপন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা মিছিলে অংশ নেয়।[২২২]

ভাষা আন্দোলনে নারী: ১৯৫৩-১৯৫৬

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি রোজা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[২২৩] ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় নারীদের প্রথম প্রভাতফেরি হয়। সুফিয়া কামালসহ অনেক নেতৃস্থানীয় নারী এতে অংশগ্রহণ করেন। এর সংগঠক ছিলেন লায়লা সামাদ।[২২৪] ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে ছাত্রছাত্রীরা ফেস্টুন হাতে প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রভাত ফেরিতে বহু ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা বারী মালিক, জহরত আরা, খালেদা ফেন্সী খান প্রমুখ।[২২৫] ঐদিন ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বিকেলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন হালিমা খাতুন।[২২৬] একই দিনে পুরাতন ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে ঢাকা কলেজের ছাত্র এবং ইডেন কলেজের ছাত্রীদের উদ্যোগে শহিদ মিনার নির্মিত হয়। ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস ফজিলাতুন্নেসা জোহার বাধা উপেক্ষা করেই ছাত্রীরা সেদিন শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। ঐ দিন কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা তাদের স্কুল প্রাঙ্গণে একটি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। ঢাকার বাইরে জেলা শহরগুলিতেও নারীরা মিছিল বের করেন। ১৯৫৩ সালে কুমিল্লায় একুশে উদ্‌যাপনে ভূমিকা রেখেছিলেন ফরিদা মির্জা, ছালেহা খাতুন এবং ফাতেমা খায়ের।[২২৭]

১৯৫৪ সালের পর এসব মিছিল আরও বড় আকার ধারণ করে এবং সংখ্যায়ও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় বিকেলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' স্লোগানে মিছিল বের হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী সৈয়দ নওয়াব আলীর মেয়ে শামিমা।[২২৮] এই বছরও কুমিল্লায় একুশে উদ্‌যাপনে নারীরা ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালে কুমিল্লায় একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন বিষয়ে মোহাম্মদ উল্লাহ্‌র স্মৃতিচারণ; "৫৪ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সংযোগ হলো মেয়েদের প্রভাত ফেরিতে যোগদানের এক নতুন উপাদান। ... অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ সাহেবের স্ত্রী কলেজ ছাত্রী ফাতেমা খায়ের, শহিদ মুনীর চৌধুরীর শ্যালিকা ফরিদা মীর্জা, সালাহউদ্দিন সাহেবের বোন ছালেহা খাতুন আরও কয়েকজন বোনসহ '৫৪ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলাম"।[২২৯] ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে ছাত্রছাত্রীরা প্রচারণা ও প্রচারপত্র বিতরণ করেন এবং ভাষার দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করেন। এই শোভাযাত্রাতেও নারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৩০]

১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঐদিন ভোর বেলায় পুলিশ বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। সকাল দশটায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। তারা আমতলায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' প্রভৃতি স্লোগান দেয়। সেই মুহূর্তে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে ফেলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে এবং অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। ঐদিন প্রায় ২২ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়।[২৩১] গ্রেফতারকৃত ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা বারী, কামরুন নাহার লাইলি, ফিরোজা বেগম, জহরত আরা, মেডিক্যাল কলেজের দু'জন ছাত্রীসহ আরও অনেকেই। গ্রেফতার না হলেও ঐদিনের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন লতিফা খানম।[২৩২] ঐদিনের আন্দোলনের বিবরণ পাওয়া যায় ভাষাকন্যা প্রতিভা মুৎসুদ্দির কাছে। তার ভাষায় :

> ১৯৫৫ সালে আমার সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা। কথা ছিল আমরা পরীক্ষার্থীরা ২১ ফেব্রুয়ারির আমতলার মিটিং এ যাব না। সেদিন ১৪৪ ধারা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ১১ টার দিকে খবর পেলাম সকালে মিডফোর্ড ও মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা মিলিটারীতে ছেয়ে গেছে। বিদ্রোহের আগুন তখন আমাদের মধ্যে। আমি ও কামরুন নাহার লাইলী একটি দল নিয়ে উইমেন্স হল (বর্তমান রোকেয়া হল) থেকে শোভাযাত্রা করে এগিয়ে দেখি রাস্তায় দু'ধারে হেলমেট পরিহিত বন্ধুকধারী মিলিটারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। তাদের মাঝখান দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং এর আমতলায় সমবেত হলাম। একজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা করছিলেন। হঠাৎ দেখি সবাই দৌড়াচ্ছে। শুনলাম লাঠি চার্জ হচ্ছে। আমরা মেয়েরা কলাভবনের এক তলায় অবস্থিত লাইব্রেরীতে ঢুকে গেলাম। লাইব্রেরিয়ান কার্ড ছাড়াই আমাদের বই ইস্যু করে দিলেন। আমরা ৭ জন আমি, কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা বারী মালিক, হোসনে আরা আপা (ইংরেজি), লায়লা নুর (ইংরেজি) ও আরও দুজন। অনেক পরে লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে কমনরুমে গেলাম। এর পর আবার লাইব্রেরীতে ফিরে আসি। হঠাৎ মনে হলো আমরা যদি সন্ধ্যার পর বের হই তখন যদি এ্যারেস্ট হই। তাছাড়া একা একা বের হলেও সমস্যা। তখন আমরা সবাই এক সাথে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। সবাই মিলে বের হতেই আমাদের উপর লাঠি চার্জ করা হল। আমরা তখন মিছিল শুরু করি। আশপাশ থেকে ছেলেরাও আসতে শুরু করে। আমাদের প্রায় সবাইকে গ্রেফতার করে ভ্যানে উঠিয়ে লালবাগ থানায় নিয়ে যায়। সেখানে নাম ঠিকানা লিখে আমাদের সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[২৩৩]

এভাবেই নারীরা সকল কষ্ট স্বীকার করে ভাষার জন্য লড়াই করেছিলেন। ক্রমাগত আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে উর্দুর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

মূল্যায়ন

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান অতিক্রম করে। পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই বাংলার নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। নারীরা ভাষা আন্দোলনে মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদান, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে মিছিল মিটিংয়ে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের প্রচারণায়ও তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ভাষা আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালনা করতে অর্থ-সংগ্রহের জন্য নারীরা বিভিন্ন স্থানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। এর বাইরে তারা পোস্টার এবং লিফলেট লেখা, লাগানো এই কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। শুধু ঢাকা শহরে নয় বিভিন্ন বিভাগীয় শহরেও

আন্দোলন-সংগ্রামে নারীরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই অনগ্রসর সমাজে, কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে মফস্বল শহর বা মহকুমাতে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীসহ সাধারণ নারীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কোনো কোনো স্থানে শিক্ষিকাদের অনেকেই ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের অগ্নিকন্যা ছিলেন মর্গ্যান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম। কেউ কেউ ছাত্রীদের মিছিল ও সভাতে অংশ নিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কোনো কোনো অঞ্চলে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগ্রাম কমিটিতেও যুক্ত ছিলেন কেউ কেউ। শুধু ১৯৫২ সালের আন্দোলনেই নয় পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৫৩-১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায় পর্যন্ত প্রতি বছর নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। শুধু ঢাকাতেই নয় অন্যান্য বিভাগীয় শহরের আন্দোলনেও নারীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার। সামাজিক, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, ধর্মীয় বিভিন্ন দিক থেকেই প্রতিনিয়ত নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা। তখনকার রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে মেয়েদের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণকে মোটেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হতো না। তখন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পর্দাঘেরা ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশায় নারীরা চলাফেরা করতেন। নারীদের ঘরের মধ্যে এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হতো। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় অন্য শহরগুলোতে অবস্থা ছিল আরও রক্ষণশীল। সামাজিক রক্ষণশীলতার সাথে যুক্ত হয়েছিল পারিবারিক প্রতিবন্ধকতাও। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ভাষাসংগ্রামী তালেয়া রহমান বলেন, "মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল পরিবার। পরিবার থেকে বাইরে যেতে বাধা দিত। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছি।"[২৩৪] অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও যে ছিল না তা নয়। অনেকেই পরিবার থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের উৎসাহ পেয়েছেন, সহযোগিতা পেয়েছেন। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের বেশিরভাগকেই স্বদেশ কোনো মূল্য না দিলেও, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনেক মূল্য তাদের অনেককেই দিতে হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন মমতাজ বেগম। শুধু তাই নয় এই ঘটনার সূত্র ধরেই তার স্বামীর সাথেও তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। অনেকের লেখাপাড়াও বন্ধ করে দেয়া হয়। চুয়াডাঙ্গায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কুল ছাত্রী বেলার লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া হয়। একই অপরাধে খুলনার ভাষাসংগ্রামী মাজেদা আলীকে হোস্টেল থেকে বের হয়ে যেতে হয়। স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের অপরাধে তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন সিলেটের ভাষাকন্যা ছালেহা খাতুন। তবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা এইসকল প্রতিবন্ধকতা সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তারা মাতৃভাষার লড়াইয়ে যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

২. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ. ৫৪।

৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯-৫০।

৪. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭, পৃ. ২৬।

৫. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।

৬. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭।

৭. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

৮. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃ. ১৩১।

৯. তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ২৬।

১০. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৩।

১১. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

১২. ভাষাসংগ্রামী আনোয়ারা খাতুন ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের বেশ কয়েকটি গোপন আলোচনা বৈঠকও তার ঢাকাস্থ ২৩ নম্বর গ্রিন রোডের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পুরোধা অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং আন্দোলনের সূচনাকারী সংগঠন তমদ্দুন মজলিশের সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ আন্দোলনের জন্য অর্থ-সংগ্রহসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের রাজপথের আন্দোলনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে আনোয়ারা খাতুন রাজপথে ছিলেন সোচ্চার। তিনি ১৯১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকার মিরপুরে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও তিনি এমএলএ হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালের ৩০ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (সূত্র: সুপা সাদিয়া, *বায়ান্নর ৫২ নারী*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ১৩)।

১৩. ঢাকার হাটখোলায় ১৯২৭ সালের ১২ মার্চ লিলি খান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মূলত নৃত্যশিল্পী। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার বিচরণ ছিল অবাধ ও উল্লেখযোগ্য। নারী প্রগতি আন্দোলনেও তার অবদান অপরিসীম।

১৪. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮, পৃ. ১০৩।

১৫. আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী*, ঢাকা: ত্রিভুজ প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ১৪।

১৬. বেগজাদী মাহমুদা নাসির, 'আমি ও আমার সময়', নাজমা জেসমিন চৌধুরী ত্রয়োদশ স্মারক বক্তৃতা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১০-১২।

১৭. তুষার আবদুল্লাহ, *বাহান্নর ভাষাকন্যা*, ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৭-৫৮।

১৮. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

১৯. হামিদা রহমান ১৯২৭ সালের ২৯ জুলাই যশোর শহরের পুরোনো কসবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৭ সালে মাইকেল মধুসূদন কলেজে থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনিয়মিত পরীক্ষা দিয়ে বিএ এবং ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি পাস করেন। ১৯৬৮ সালে লালমাটিয়া গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তার পেশা জীবনের শুরু। পরবর্তীসময়ে তিনি জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্যসাধনা এবং সাংবাদিকতার সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি ২০০৫ সালের ১৪ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্র: সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-৩৩)।

২০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ১ম খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৯, পৃ. ৭৯।

২১. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩২।

২২. সাক্ষাৎকার, ফাতেমা চৌধুরী; উদ্ধৃত, শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

২৩. বাশার খান (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী ৫২ ও ৭১*, ডেইলি স্টার বুকস, ঢাকা: ২০১৮, পৃ. ৪৯।

২৪. সাক্ষাৎকার: লায়লা নূর, উদ্ধৃত; মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৬৪ ।

২৫. বাশার খান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২।

২৬. শ. ম. সাজু, 'বায়ান্নতে দেশের প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয়েছিল রাজশাহীতে', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ১৪৯।

২৭. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

২৮. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

২৯. *দৈনিক আজাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৩০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৫।

৩১. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২।

৩২. তুষার আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

৩৩. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

৩৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৮৪, পৃ. ১৫৩।

৩৫. গাজীউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা*, ঢাকা: মেরী প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৫৭।

৩৬. তুষার আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

৩৭. সাক্ষাৎকার, সুফিয়া আহমেদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

৩৮. আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ১৮৩।

৩৯. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫।

৪০. তুষার আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮।

৪১. মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৭, পৃ. ২১৬-২১৭।

৪২. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২।

৪৩. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

৪৪. ভাষাসংগ্রামী শরীফা খাতুন ১৯৩৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তখনকার ফেনী মহকুমার শর্শদি ইউনিয়নের জাহানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি নোয়াখালী উমা গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ইডেন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। শরীফা খাতুন তখনকার অরফেনেজ রোডে অবস্থিত আবাসিক হোস্টেলে থাকতেন। কলেজ আর হোস্টেলে নানামুখী আলোচনা থেকেই ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারেন তিনি। কলেজের কমনরুমে আর লাইব্রেরিতে নানা ধরনের পত্রিকা থাকার কারণে বিভিন্ন মতামত ও আলোচনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইডেন কলেজে বেশ কয়েকটি সভা, সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, তিনি এগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৪ ফেব্রুয়ারি এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশেও তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৫৩ সালে ইডেন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতক এবং ১৯৫৮ সালে স্নাতকোত্তর পাস করেন। এই ভাষাসংগ্রামী কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৫৮ সালে ফেনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬৫-৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিক্ষায় পিএইচ.ডি লাভ করেন। তিনি ২০০১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৭ সালে একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। (সূত্র: *ভোরের কাগজ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, *দৈনিক যুগান্তর*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

৪৫. সুফিয়া করিম ১৯৩০ সালের ৩০ নভেম্বর পাবনায় নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্টের বিচারপতি বদিউজ্জামান আহমেদ এবং মা হামিদা বানু। ১৯৪৮ সালে তিনি পাবনা থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীসময়ে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫১-৫২ সালে কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য সহসভানেত্রী নির্বাচিত হন। ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে তিনি ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করেন। বিশ জনের একটি দল নিয়ে তিনি আমতলার মিছিলে অংশ নিতে রওনা হলে পুলিশের ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাসে দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু সব বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে তিনিসহ আরও অনেকেই মিছিলে যোগদান করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের পুরো সময়েই তিনি ছিলেন সোচ্চার প্রতিবাদী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা, আশ্রয় দানসহ প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭৩-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নিবাসে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া বহু সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। এর মধ্যে মহিলা ক্লাব, মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৯০ সালে ময়মনসিংহে তার নিজস্ব বাসভবনসহ ৭ শতাংশ জমি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের জন্য দান করেছিলেন। তিনি ১৯৯৮ সালের ১০ এপ্রিল মারা যান। (সূত্র: সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৮)।

৪৬. উম্মে সাঈদা সিদ্দিকীর জন্ম ১৯৩১ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকায়। পৈতৃক নিবাস হবিগঞ্জ জেলার দরিয়াপুর গ্রামে। ১৯৫০ সালে ইডেন কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৫০ সালে মন্ত্রী ফজলুর রহমানের স্ত্রী ফাতিমা রহমান ইডেন কলেজে এসেছিলেন। ছাত্রীদের সামনে তিনি উর্দু ভাষা শেখা প্রসঙ্গে উর্দুতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন উম্মে সাঈদা এবং তার বোন রাজিয়া হক অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এর প্রতিবাদ জানান। এর ফলে কলেজের অধ্যক্ষ ফজিলতুননেসা জোহা তাদেরকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু কলেজের অন্য ছাত্রীরা একত্র হয়ে এর প্রতিবাদ জানানোর ফলে তাদেরকে বহিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া কলেজের যেকোনো সমস্যা সমাধানেও তিনি অগ্রভাগে থাকতেন। পড়াশোনা শেষে শিক্ষকতায় সম্পৃক্ত হন। ঢাকার আজিমপুর বালিকা

বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন তিনি। ১৯৬৯ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পদকে ভূষিত হন তিনি। ১৯৯৬ সালে লাভ করেন বাংলাদেশ সাহিত্য সংসদ পদক। (তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা সংগ্রামীদের কথা বৃহত্তর সিলেট*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ৫৫-৫৬)।

৪৭. ১৯৪৮ সাল থেকেই চেমন আরা ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন তমদ্দুন মজলিশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি ইডেন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। সেসময় তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনুষ্ঠিত ইডেন কলেজের অনেক সভা ও সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছেন, সভাপতিত্ব করেছেন এবং মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সমাবেশে অংশ নেন। তিনি ওই সমাবেশে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন। সমাবেশ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত হলে তিনি এগিয়ে যান এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। চেমন আরা ১৯৩৫ সালে ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে তার স্কুল শিক্ষা শুরু হয় চট্টগ্রাম গুল এজার বেগম স্কুলে। ১৯৫১ সালে ঢাকার সরকারি কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৩ সালে ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাস করেন। ১৯৫৯ সাল থেকে ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ইডেন কলেজের বাংলা বিভাগে প্রায় ৩২ বছর বিভিন্ন পদমর্যাদায় অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন তমদ্দুন মজলিশ ২০০৪ সালে তাকে 'তমদ্দুন মজলিশ ভাষাসৈনিক' পদকে ভূষিত করে। (সূত্রঃ সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৫)।

৪৮. রাজিয়া চৌধুরী ১৯৩২ সালের ২০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রামের খাস্তগীর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। কলেজে পাকিস্তানের মন্ত্রী ফজলুর রহমানের স্ত্রী ফাতিমা রহমানের উর্দুর পক্ষে প্রচারণার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি এবং তার বোন উম্মে সাঈদা সিদ্দিকী। শিক্ষাজীবন শেষে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঢাকার মুসলিম গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘদিন সেখানে শিক্ষকতার পর বর্তমানে ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করছেন। (তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০)।

৪৯. সাক্ষাৎকার, শরীফা খাতুন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

৫০. আবদুল মালেক, 'ঢাকা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০, পৃ. ২৪।

৫১. *ভোরের কাগজ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

৫২. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২।

৫৩. *ঐ*, পৃ. ৫৪।

৫৪. তুষার আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।

৫৫. সুপা সাদিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৫৬. *ঐ*, পৃ. ৭০-৭১।

৫৭. ডা. কাজী খালেদা খাতুনের জন্ম পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠিতে। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে ১৯৭০ সালে একই কলেজের প্যাথলজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট থেকে অবসর নেন। ভাষাসংগ্রামী কাজী খালেদা খাতুন ২০১৩ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর মারা যান। (সূত্রঃ সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭)।

৫৮. আবদুল মালেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

৫৯. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

৬০. *ঐ*, পৃ. ২৮।

৬১. হাবিবা খাতুন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও আমাদের পরিবার', এম আর মাহবুব, *নরসিংদীতে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৭৪।

৬২. তুষার আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮।

৬৩. মনোয়ার আহমদ, *ভাষা আন্দোলনের সচিত্র দলিল*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৮৬।

৬৪. জোহরা বেগম কাজী উপমহাদেশের প্রথম মুসলমান নারী চিকিৎসক এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারী জাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে বার্জিস মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এরপরই চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়ার জন্য তিনি দিল্লিতে লেডি হাডিং যার ওম্যান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৫ সালে তিনি এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন এবং তাকে সম্মানজনক 'ভাইসরয়' ডিগ্রি প্রদান করা হয়। পরবর্তীসময়ে ইংল্যান্ড থেকে এফ. আর. সি. ওজি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেসিডেন্স সার্জন হিসেবে যোগদান করেন। তারই প্রচেষ্টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে গাইনি অ্যান্ড অবসটেটিক ডিপার্টমেন্ট চালু হয়। তিনিই এই বিভাগের প্রধান হন। মানবতার সেবায় নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. জোহরা কাজী তমঘা-ই-পাকিস্তান (১৯৬৪), রোকেয়া পদক (২০০২), একুশে পদক (২০০৮) লাভ করেন। ২০০৭ সালের ৭ নভেম্বর জোহরা কাজী মৃত্যুবরণ করেন।

৬৫. রীতা ভৌমিক, *২৪ জন ভাষাসংগ্রামীর জীবন কথা*, ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১২, পৃ. ১৬৫।

৬৬. *Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly,* 22nd February 1952, Vol. vii, p. 98.

৬৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৬৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭।

৬৯. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

৭০. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

৭১. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৭২. তুষার আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

৭৩. শাহজান পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

৭৪. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৮০।

৭৫. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫।

৭৬. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৭৭. এম. আর. মাহবুব, 'ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম: জীবন ও কর্ম', এম. আর. মাহবুব (সম্পা.), *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১১, পৃ. ২৬।

৭৮. রুমন রেজা, 'নারায়ণগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

৭৯. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

৮০. মমতাজ বেগম ১৯২৩ সালের ২০ মে কলকাতার ৫৭, শিবপুরস্থ হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম কল্যাণী রায় চৌধুরী, ডাক নাম মিনু। তার বাবা রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায় ছিলেন জেলা জজ এবং পরবর্তীসময়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন রাজশাহীর রঘুনন্দনপুরের জমিদার। মা পাবনার গোপালপুরের মেয়ে মাখনমতি দেবী কলকাতা

মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। মমতাজ বেগম ১৯৩৮ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মাট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৪২ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪২ সালে বিএ পাস করে কলকাতায় 'দি স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায়' যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় পরিচয় হয় গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর আবদুল মান্নাফের সাথে। ১৯৪৪ সালে তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তিনি মমতাজ বেগম নাম ধারণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি দেশ বিভাগের পর ঢাকায় আসেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিএড পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। একই বছর তিনি নারায়ণগঞ্জের মর্গ্যান হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই স্কুলে থাকাকালীন তিনি ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি স্কুল পরিদর্শক হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএড ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি পুরনো ঢাকার আনন্দময়ী গার্লস স্কুলে এবং আহমদ বাওয়ানী জুট মিল বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। 'শিশু নিকেতন' নামে একটি কিন্ডার গার্টেন চালু করেছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ৩০ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। ২০১২ সালে তাকে একুশে পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত করা হয়। (সূত্রঃ এম. আর. মাহবুব, 'ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগমঃ জীবন ও কর্ম', এম. আর. মাহবুব (সম্পা.), *ভাষা সংগ্রামী মমতাজ বেগম*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১১, পৃ. ২২-২৫, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২)।

৮১. এম. আর. মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮।

৮২. *দৈনিক আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৮৩. এম. আর. মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

৮৪. রুমন রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

৮৫. *দৈনিক আজাদ*, ১ মার্চ ১৯৫২।

৮৬. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৭।

৮৭. *The Statesman*, ৩ মার্চ ১৯৫২।

৮৮. এম. আর. মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৮।

৮৯. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮২, পৃ. ১৭৬-৭৮।

৯০. রুমন রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

৯১. মহব্বত হোসেন, 'টাঙ্গাইলের ভাষা সৈনিকদের অনুপ্রেরণায় ছিলেন মওলানা ভাসানী', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকাঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ১১৭।

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

৯৩. রাবেয়া সিরাজ ১৯৩৩ সালের ৪ মে ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি কুমুদিনী মহিলা কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কুমুদিনী মহিলা কলেজ হোস্টেলে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকার আনন্দময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯৫৮-১৯৫৯), রাজশাহী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯৫৯-১৯৬১) ও ঢাকার লেক সার্কাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে (১৯৬৫-১৯৬৭) একই পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি ঢাকার লালমাটিয়া মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮২ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেন। (সূত্রঃ সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০)।

৯৪. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৯৫. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৯৬. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

৯৭. *ঐ*, পৃ. ৩৭।

৯৮. এম আর মাহবুব, *নরসিংদীতে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১২৪।

৯৯. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ১১৯।

১০০. প্রদীপ কুমার রায়, 'মানিকগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪২।

১০১. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ১২১-২২।

১০২. সাইফুল হক মোল্লা দুলু, 'কিশোরগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

১০৩. মৃদুল রায়, 'ময়মনসিংহ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

১০৪. ছালেহা বেগমের জন্ম ১৯৩৭ সালে। পৈতৃক নিবাস সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার উচ্ছলাপাড়া গ্রামে। পিতা আবুল মোজাফফর আশরাফ আলী ছিলেন একজন সাবরেজিস্ট্রার। মা মনিরুন্নেছা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। তার বড় বোন রওশন আরা বাচ্চু ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অপর বোন হোসনে আরা বেগম পিরোজপুরে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শিক্ষকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০০২ সালের ১৯ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্র: তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা সংগ্রামীদের কথা; বৃহত্তর সিলেট*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ৬৮)

১০৫. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।

১০৬. *ঐ*, পৃ. ৩৪-৩৫।

১০৭. শফিক জামান, 'জামালপুর', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৪।

১০৮. এ. কে. এম. রিয়াজুল হাসান, 'শেরপুর', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

১০৯. কুণ্ডল বিশ্বাস, 'নেত্রকোনা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০।

১১০. ১৯৪৭ সালে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরীর যৌথ সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা *সীমান্ত* প্রকাশিত হয়। *সীমান্ত* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে মাহবুব উল আলম চৌধুরী একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখেন। চট্টগ্রামের তৎকালীন সকল প্রগতিশীল আন্দোলন এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। (সূত্র: মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'চট্টগ্রাম', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮)।

১১১. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

১১২. জওশন আরার জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার চুনতী গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুনসেফ পরিবারে। তার বাবা মাহবুবর রহমান ছিলেন বিভাগপূর্ব বাংলায় চট্টগ্রামের প্রথম ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার। মা সাদীদা খানম ছিলেন গৃহিণী। তিনি ১৯৫২ সালে ডা. খাস্তগীর গার্লস স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং আইএ পাস করেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে। ১৯৫৮ সালে তিনি বিএ পাস করেন। বিএ পাস করার পর তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের অফিসার পদের জন্য আবেদন করেন। চট্টগ্রাম আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এক নম্বর প্রজেক্টে ১৯৬০ সালের ৪ জানুয়ারি যোগদান করেন। সমাজকল্যাণ বিভাগে কর্মরত অবস্থায় ১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি কলম্বোপ্ল্যান

স্কলারশিপ নিয়ে দু'বছরের জন্য নিউজিল্যান্ড যান। ওয়েলিংটনে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি সোস্যাল সাইন্স-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে চাকরিরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তৎকালীন ইনস্টিটিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে এমএ পাস করেন। ১৯৭০-এর প্রথম দিকে চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে উপ-পরিচালক হিসেবে ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। তিনি দেশের প্রান্তিক নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। এছাড়া দেশে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন-ম্যাগাজিন এবং প্রকাশনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তার বহু লেখা প্রকাশিত হয়। *স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে* তার আত্মকথা। বইটিতে তার শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, বিয়ে, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার বিচরণ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: জওশন আরা রহমান, *স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫)।

১১৩. প্রতিভা মুৎসুদ্দির জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে। বাবা কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দি ছিলেন আইনজীবী। মা শৈলবালা মুৎসুদ্দি ছিলেন গৃহিণী। ১৯৫১ সালে ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর তিনি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পাস করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি এমএ পাস করেন। ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বছর কক্সবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬২ সালে গাজীপুর জেলায় জয়দেবপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করে বছর খানেক সেখানে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৩ সালে ভারতেশ্বরী হোমসে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং এরপর উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ১৯৬৫ সালে ওই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সফলতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেন এবং মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে নেমে কারাবরণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রকে নকলমুক্ত করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নিলেও শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তিনি সরে দাঁড়াননি। বরং ভারতেশ্বরী হোমসসহ কুমুদিনী মেডিক্যাল কলেজ, কুমুদিনী হাসপাতাল স্কুল অব নার্সিং এর কর্মকাণ্ডে এখনো সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি ২০০২ সালে একুশে পদক লাভ করেন। (সূত্র: *ভোরের কাগজ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; রীতা ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৭)।

১১৪. সাক্ষাৎকার, মাহবুব উল আলম চৌধুরী, ২৫ মে ২০০৫; উদ্ধৃত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

১১৫. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।

১১৬. *ঐ*, পৃ. ৯৪।

১১৭. *ঐ*, পৃ. ১২০।

১১৮. *ঐ*, পৃ. ৯৬।

১১৯. রীতা ভৌমিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

১২০. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

১২১. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

১২২. সুমি খান, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম', *সাপ্তাহিক ২০০০*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১; শরীফ শমশির, *চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৭০।

১২৩. আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

১২৪. মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৮৬।

১২৫. উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

১২৬. *ঐ*, পৃ. ৮৮।

১২৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১২৮. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

১২৯. মাহবুব হাসান, 'নোয়াখালী', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

১৩০. জমির আহমদ 'ফেনী', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

১৩১. গোলাম সাকলায়েন সাকী, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

১৩২. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ৯১।

১৩৩. মফিজুর রহমান লিমন, 'শহীদ বরকতের রক্তাক্ত শার্টের এক টুকরো কাপড় দেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া টগবগিয়ে উঠেছিল', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ১২৬।

১৩৪. মুহম্মদ একরামুল হক, *রাজশাহী জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ২৮।

১৩৫. আখতার বানু, 'স্মৃতিচারণ : রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা', তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), *রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ১৩৫।

১৩৬. আখতার বানু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-৩৬।

১৩৭. আখতার বানু "রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা", তসিকুল ইসলাম, *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ১০৬।

১৩৮. তসিকুল ইসলাম. 'রাজশাহী', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

১৩৯. সাক্ষাৎকার, আব্দুর রাজ্জাক, ১২ আগস্ট ২০০৫; উদ্ধৃত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

১৪০. ভাষা আন্দোলনে রাজশাহীতে স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা (স্মৃতিফলক), ভুবন মোহন পার্ক, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ফলক উন্মোচন, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

১৪১. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

১৪২. *দৈনিক আজাদ*, ১ মার্চ ১৯৫২।

১৪৩. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৪৪. আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

১৪৫. আবদুল কুদ্দুস চাদু, 'পাবনা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

সেলিনা বানু: ১৯২৬ সালের ২২ অক্টোবর পাবনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৩ সালে পাবনা গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪৫ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৯ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬১ সালে ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। সেলিনা বানু পাবনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে কুমিল্লার ফরিদা বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে আমৃত্যু কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পাবনা মহিলা আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে মহিলা পরিষদ গঠিত হলে তিনি এ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ত্রিপুরার আগরতলা ক্রাফটস ক্যাম্প ও কলকাতার সল্টলেক শরণার্থী ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন

করেন। তিনি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। ১৯৮৩ সালের ২৬ জানুয়ারি তার মৃত্যু হয়। (সেলিনা বানু সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: মামুন সিদ্দিকী (সম্পা.), *সেলিনা বানু: সংগ্রামী নারী*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০০৯)।

১৪৬. এম আবদুল আলীম, *পাবনায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১১৯।

১৪৭. *প্রাগুক্ত*

১৪৮. আব্দুল কুদ্দুস চাদু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।

১৪৯. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।

১৫০. আবুল হোসেন খোকন, 'বগুড়া', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩।

১৫১. গাজীউল হক, 'স্মৃতিচারণ', তসিকুল ইসলাম, *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৮৯-৯০।

১৫২. সুজন হাজারী, 'জয়পুরহাট', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।

১৫৩. মোঃ খোসবর আলী, *নওগাঁ জেলায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮, পৃ. ১৩৫।

১৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

১৫৫. *ঐ*, পৃ. ৮৩।

১৫৬. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, 'সিরাজগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

১৫৭. এম আবদুল আলীম, *সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ. ১২৯।

১৫৮. রফিকুল আলম খান, 'সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের সময় মাইক না থাকায় টিনের চোঙ্গা ব্যবহার করা হয়েছিল', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।

১৫৯. সুশান্ত ভৌমিক, 'ভাষা আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না রংপুর', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

১৬০. *প্রাগুক্ত*।

১৬১. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ১৭৬।

১৬২. নূরুল ইসলাম, 'রংপুরে ভাষা আন্দোলনের কিছু স্মৃতি কথা', *দৈনিক যুগের আলো*, একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, রংপুর, ১৯৯৬।

১৬৩. তসিকুল ইসলাম, *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৫৭।

১৬৪. নূরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*।

১৬৫. কামরুল হুদা হেলাল, 'দিনাজপুর', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।

১৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।

১৬৭. জি এম হিরু, 'দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকায় ছিল শহরের ছাত্র সমাজ', আমানুল্লাহ কবীর এবং ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

১৬৮. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

১৬৯. কামরুল হুদা হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।

১৭০. জি এম হিরু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

১৭১. *দৈনিক আজাদ*, ৬ মার্চ ১৯৫২।

১৭২. ভুবন রায় নিখিল, 'ভাষা আন্দোলনে নীলফামারী: জনতার সংগ্রাম', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।

১৭৩. তসিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১৭৪. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১৭৫. শাহাবুল শাহীন তোতা, 'গাইবান্ধা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।

১৭৬. সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, 'জনবিরল পঞ্চগড়েও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

১৭৭. বেগম শামসুন্নাহার ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। বরিশালের চিকিৎসক বিশিষ্ট সমাজকর্মী এম আহম্মেদের সহযোগিতায় মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে সরকারি মহিলা কলেজ নামে সুপরিচিত। তিনি বাংলা ভাষা আদায়ের দাবিতে বরিশালের প্রায় সব মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তার উদ্যোগে বরিশাল বেলস পার্ক মাঠে নারীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নয় নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। (সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-১০৮)।

১৭৮. রাণী ভট্টাচার্য ১৯২৭ সালে বরিশালের রাজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বিএ পাস করেন। তার স্বামী কমিউনিস্ট নেতা হিরণলাল ভট্টাচার্য। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি বরিশালের জগদীশ সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারস্বত স্কুল থেকে শুরু হওয়া সবচেয়ে বড় মিছিলটির নেতৃত্ব দেন তিনি। তিনি নারী অধিকার রক্ষায় কাজ করেছেন। মহিলা পরিষদের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮)।

১৭৯. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

১৮০. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

১৮১. জি এম বাবর আলী, 'ভাষা আন্দোলনে বরিশালবাসীর ছিল উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভূমিকা', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

১৮২. বেগম ফিরোজা, 'বরিশাল', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

১৮৩. শ্যামল চন্দ্র সরকার, 'ঝালকাঠি', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

১৮৪. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

১৮৫. জোবায়দা খাতুন চৌধুরী ১৯০১ সালে সিলেটের জোড়হাটে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা করেন ঢাকার ইডেন গার্লস হাইস্কুলে। সেসময় তিনিই ছিলেন স্কুলের একমাত্র মুসলমান ছাত্রী। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ১৯৩৫ সালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি ১৯৩০ সালে সিলেট মহিলা সংঘের সভানেত্রী এবং ১৯৪৩ সালের পরবর্তী সময়ে সিলেট জেলা মহিলা মুসলিম লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম নারী রাজনীতিবিদ যিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদে একটানা ১৯ বছর সদস্য ছিলেন। তিনি সিলেটে নারীশিক্ষা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি একজন প্রবন্ধকার ও গল্পকার। ১৯৮৬ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্র: সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২)।

১৮৬. তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০।

১৮৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১৮৮. সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী ১৯১৪ সালে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবুল বাশার চৌধুরী। নিজ বাড়িতেই পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছে তার। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে অ্যাডভোকেট আবু আহমদ আবদুল হাফিজের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন থেকেই সিলেট শহরে বসবাস শুরু করেন। স্বামীর উৎসাহে রাজনীতি এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত হন। সিলেট জেলা মহিলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষানুরাগী এই নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারেও কাজ করেছেন। চালিবন্দর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সিলেট মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। সিলেট মহিলা সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালের ২১ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। (তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-৫২)।

১৮৯. লুৎফুন্নেছা খাতুনের জন্ম ১৯৩০ সালের ১৬ নভেম্বর। কর্মজীবনে সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের (বর্তমানে পাইলট স্কুল) প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্বামী সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। চাকরির তোয়াক্কা না করেই ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন তিনি। খেলাধুলা, ছবি আঁকাসহ সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় তার বিচরণ ছিল। লিখেছেন গল্প ও কবিতা। ১৯৯১ সালে ৬১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯০. সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর সহধর্মিনী রাবেয়া আলীর জন্ম তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার উল্লাপাড়ায়। সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন তিনি। আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েই তার অংশগ্রহণ ছিল।

১৯১. রাবেয়া খাতুন ১৯২১ সালের ১ আগস্ট সিলেট জেলার বালাগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবুল আব্বাছ আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। একই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আমিরুল ইসলামের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সিলেট শহরের নারীদের সংগঠিত করতেও ভূমিকা রাখেন তিনি। বাংলা ভাষার দাবি আদায়ের প্রতিটি পর্যায়েই তার সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। (তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-৩২)।

১৯২. খালেদ আহমদ, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রথম জনসভা হয়েছিল সিলেটে', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

১৯৩. তাজুল মোহাম্মদ, 'সিলেট', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪।

১৯৪. হাজেরা খাতুন, 'সুনামগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭।

১৯৫. হাজেরা মাহমুদের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায়। পড়ালেখা করেছেন কলকাতায়। মার্কসবাদের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল তার। কমিউনিস্ট নেতাদের সান্নিধ্যেও এসেছিলেন তিনি। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও লাভ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে মাহমুদ আলীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সিলেটে চলে আসেন। সিলেটে থাকাকালীন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। সে আন্দোলনে প্রথম শ্রেণির একজন নেতায় পরিণত হয়েছিলেন তিনি। এছাড়া সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে বিয়ের পর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আদর্শ এবং পার্টির সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ১৯৭১ সালে স্বামীর সাথে পাকিস্তানে চলে যান তিনি। ১৯৯৪ সালের ১৩ জানুয়ারি পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্র: তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা সংগ্রামীদের কথা বৃহত্তর সিলেট*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১৫৪)।

১৯৬. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ৭৯।

১৯৭. আকমল হোসেন নিপু, 'মৌলভীবাজার', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১; সৈয়দা নজিবুন্নেছা খাতুনের জন্ম মৌলভীবাজারের বিখ্যাত সৈয়দ বংশে। পিতা সৈয়দ সিকন্দর আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন তার সহোদর। মাত্র আট বছর বয়সে

সিলেট শহরের আবু মোহাম্মদ ইসরাইল এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পরে সরযূ বালা বর্মণের কাছে পড়াশোনা শুরু করেন। পরবর্তীসময়ে নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করেছেন। এছাড়া মহিলা মুসলিম লীগের একজন নেত্রী হিসেবে রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। (তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮)।

১৯৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১৯৯. তরফদার মুহাম্মদ ইসমাঈল, ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জ, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ৫২।

২০০. অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'খুলনা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

২০১. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

২০২. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১।

২০৩. *ঐ*।

২০৪. ড. শেখ গাউস মিয়া, *ভাষা আন্দোলন খুলনা ও বাগেরহাট জেলা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ৭৩।

২০৫. আনোয়ারা বেগম, 'ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ভোলার নয়', খোন্দকার আবুল হাশেম (সম্পা.), *অমর একুশে*, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, খুলনা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃ. ৪৪।

২০৬. বেগম মাজেদা আলী, *শিউলী ঝরা দিনগুলো*, খুলনা: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৯, পৃ. ৪১।

২০৭. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

২০৮. সাক্ষাৎকার, রোকেয়া মাহবুব শিরি, উদ্ধৃত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

২০৯. শরিফুজ্জামান পিন্টু, 'বাগেরহাট', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬-১৭।

২১০. পল্টু বাসার ও কল্যাণ ব্যানার্জী, 'সাতক্ষীরা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।

২১১. আকসাদুল আলম, 'যশোর', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১-২২৬।

২১২. *ঐ*, পৃ. ২২৮।

২১৩. প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, 'নড়াইল', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯।

২১৪. শেখ মুহাঃ শাখাওয়াৎ রেজা সেলিম, 'ঝিনাইদহ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

২১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬।

২১৬. শাহ আরিফ নিশির, 'কুষ্টিয়া', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।

২১৭. *প্রাগুক্ত*, ২৪১-৪২।

২১৮. এম. এম. আলাউদ্দিন, 'চুয়াডাঙ্গা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩।

২১৯. আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

২২০. এম. এম. আলাউদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩-৪৫।

২২১. ঐ, পৃ. ২৪৫।

২২২. আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

২২৩. গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

২২৪. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

২২৫. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

২২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩।

২২৭. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।

২২৮. গাজীউল হক, এম. আর. আখতার মুকুল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

২২৯. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

২৩০. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

২৩১. বশীর আর হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৫।

২৩২. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

২৩৩. সাক্ষাৎকার, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, উদ্ধৃত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

২৩৪. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। সংস্কৃতির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রযাত্রায় সহযাত্রী হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই (১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে) সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিভিন্ন হল ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ (Dacca University Students' Union) গঠিত হয়। সে সময়ের তিনটি হল ঢাকা হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং জগন্নাথ হল থেকে একজন করে শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধি এবং উপাচার্য মনোনীত একজন শিক্ষক নিয়ে এই সংসদ গঠন করা হয়। ১৯৫৩ সালে ছাত্র সংসদের নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (Dacca University Central Students' Union-DUCSU). প্রথম থেকেই ছাত্র সংসদ বিভিন্ন বিতর্ক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। ডাকসু ছিল ছাত্র অধিকার, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং মননশীলতার বিকাশ ঘটানোর উন্মুক্ত প্লাটফর্ম, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। তবে মুক্তবুদ্ধি চর্চাকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রয়াস ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজ[১] প্রতিষ্ঠা যা সমগ্র বাংলায় মুসলমান শিক্ষিত সমাজের প্রগতিশীল চিন্তার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ তার মুখপত্র *শিখা* এর মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন[২] মতবাদ প্রচার করে বাঙালি মুসলমান সমাজকে যুক্তিবাদ ও প্রগতির পক্ষে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে। এই প্রগতিশীল চিন্তা, চেতনার উত্তরাধিকার বহন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে উঠা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, সংস্কৃতি সংসদ, ড্রামা সার্কল প্রভৃতি সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অবদান রেখেছে যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য অধ্যায়ে ১৯৫২-৭১ কালপর্বে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবদানকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: ১৯২১-১৯৫২

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এখানে সহশিক্ষার বিষয়টি স্বীকৃত ছিল। Dacca Univeristy Act, 1920 এর ৫ নং ধারায় বলা ছিল 'The University shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed or class'. ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন লীলাবতী নাগ ও সুষমা সেনগুপ্ত। ১৯৩০- এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৬-৩৭ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা হয় ২৭। ১৯৩৭ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী সমিতি'[৩] নামে নারী শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন গড়ে উঠে। পাশাপাশি ১৯৩৬-৩৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে মনোনয়নের মাধ্যমে ছাত্রীদের সদস্য করা শুরু হয়। একই সাথে হল ইউনিয়নেও ছাত্রীরা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ঢাকা হল ইউনিয়নের সর্ব প্রথম সদস্য হয়েছিলেন কমলা গুপ্ত।[৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাহিত্য পত্রিকা *সুপর্ণা*কে ঘিরেই তাদের সাহিত্যচর্চার সূচনা হয়েছিল। *সুপর্ণা* ছিল ছাত্রী সমিতির মুখপত্র। ছাত্রী সমিতি গঠন করার পর থেকেই ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, ক্রীড়া ও অন্যান্য পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের নাট্যচর্চার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল ১৯৩৬ সালে ‘বিদ্যাপতি’ নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে।[৫] ১৯৩৭ সালে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তপতী’ এবং পরের বছর ‘বাঁশরী’। ‘বাঁশরী’ নাটকটির অভিনয়ের সাফল্য নিয়ে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক চারুপমা বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে পত্রালাপ হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর চারুপমা বসু এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন :

> গত ২৪ শে ও ২৫ শে ভাদ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রী সম্মেলন উপলক্ষে আপনার ‘বাঁশরী’ অভিনয় করে। মেয়েদের মধ্যে প্রথম যখন বইখানা অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচন কোরে দিই তখন অনেকের মতো আমারও মনে সন্দেহ ছিল, বইএর চরিত্রগুলি মেয়েরা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেনা এবং বইখানার তা’ তে অমর্য্যাদা হবে। কিন্তু দু’দিনই মেয়েরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ‘বাঁশরী’ অভিনয় কোরেছে। অভিনয় দেখে উপস্থিত ভদ্র মহিলামন্ডলী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। মেয়েরা আপনার লেখার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারায় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছে এবং আমি নিজে এত প্রীতি ও স্বস্তিলাভ কোরেছি যে আপনাকে এই সাফল্যের সংবাদ না জানিয়ে স্থির থাকতে পারলাম না।[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই চিঠির উত্তর প্রদান করে ছাত্রীদের উৎসাহিত করেছিলেন। কবি ১৯ সেপ্টেম্বর চারুপমা বসুর নিকট লিখেন, “বাঁশরী তোমরা ভালো করে অভিনয় করতে পেরেছে শুনে খুশি হলুম। অভিনয়ের পক্ষে এ নাটিকাটি একটুও সহজ নয়। শ্রোতাদের পক্ষেও এটা দুবোর্ধ্য- গ্রন্থকাররূপে তোমাদের সফলতার অংশ আমি গ্রহণ করলুম।”[৭] ১৯৩৯ সালে ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ মঞ্চস্থ করে।

একই বছর ছাত্রীদের মধ্যে প্রথমবারের মতো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া ছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা হতো। এই অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হতো ঢাকা হলে এবং সেখানে ছাত্ররাও শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে যোগদান করতেন। ছাত্রদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বির্তক প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করেছেন ছাত্রীরা। ১৯৪০- এর দশকে অণিমা নাহা, রেণুকা দত্ত, অমিতা চৌধুরী ছাত্রদের সাথে বির্তক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।[৮] এই বিষয়ে অণিমা নাহার স্মৃতিচারণ, “বর্তমান কালে খুব স্বাভাবিক মনে হলেও আমরা কয়েকটি ছাত্রী (রেণুকা দত্ত, অমিতা চৌধুরী ও আমি) সে সময়ে বেশ একটু সাহস সঞ্চয় করে ছাত্রদের সঙ্গে বিতর্ক সভায় নেমে পড়েছিলাম এবং কিছুটা কৃতিত্বও দেখানো গিয়েছিল। এই সময় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের জীবনের একটা মোড় ঘুরে গেল বলা যায়।”[৯]

১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭১১ জন। ১৯৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষে সে সংখ্যাটা ছিল ৬৭ জন।[১০] পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে গোটা ষাটের দশক জুড়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১১,৭৬২ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৮০০ জন। সংখ্যায় অল্প হলেও ছাত্রীদের অদম্য উৎসাহের কারণেই তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী সমিতি। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চর্চা বিকশিত হতে থাকে। ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক করুণাকণা গুপ্তা এবং ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক চারুপমা বসু। এই সংস্কৃতি চর্চাই জন্ম দেয় সাংস্কৃতিক সচেতনতাবোধের যার প্রতিফলন দেখা যায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামে।

ভাষা আন্দোলন

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা ভাষা আন্দোলন, যার প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক মুসলিম সাহিত্য সমাজ তথা শিখা গোষ্ঠী বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টিতে অমূল্য অবদান রেখেছে। কেননা তাদের আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দান। তবে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম উত্থাপন করে তমদ্দুন মজলিশ।[১১] তমদ্দুন মজলিশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ফেরদৌসী বেগম।[১২]

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সামাজিক রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তবে ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে ছাত্রীরা মিছিল-মিটিংয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল মিটিংয়ে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়া তারা আন্দোলন সংগঠনে অর্থ সংগ্রহের জন্য চাঁদা তোলা, পোস্টার লিখন, পোস্টার সাটানো, জনসভা বা মিছিল-মিটিংয়ের জন্য প্রচারণা চালানো, মিছিল-মিটিং সংগঠিত করা, লিফলেট লেখা প্রভৃতি কাজে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভাষা আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে হালিমা খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া খান, জহরত আরা, কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা বারী মালিক, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, কায়সার সিদ্দিকী, নাদেরা বেগম, নূরজাহান খুরশিদ, নূরুন্নাহার কবীর, মোসলেমা খাতুন, সারা তৈফুর, জহরত আরা, লায়লা নূর, তালেয়া রহমান ছিলেন অন্যতম। ভাষা আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা পালনকারী নাদেরা বেগম ছিলেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। পরবর্তীকালে হালিমা খাতুন ও শাফিয়া খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সুফিয়া আহমেদ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

হালিমা খাতুন

১৯৫২ সালে হালিমা খাতুন[১৩] ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন এবং চামেলী হাউসে থাকতেন। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে তিনি সভা ও মিছিলে অংশ নেন। রাতে সভায় যোগ দেওয়ার জন্য হোস্টেলে না থেকে স্থানীয় অভিভাবকের বাসায় দাওয়াত খাওয়ার কথা বলে চলে যেতেন তিনি। কারণ রাতে মেয়েদের হল থেকে বের হবার অনুমতি ছিল না। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার বিভিন্ন সভায় বাংলাবাজার গার্লস স্কুল ও মুসলিম গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসার দায়িত্ব অর্পিত ছিল তার ওপর। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বাধা সত্ত্বেও তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১৪]

মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীদের আমতলার সমাবেশে সমবেত করার ব্যাপারেও হালিমা খাতুন সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আমতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্র জনতার সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে, মেয়েরা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাজপথে বের হয়ে আসে। হালিমা খাতুন ছিলেন ছাত্রীদের প্রথম সারিতে। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর সঙ্গে তিনজন বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার সঙ্গে যে তিনজন স্কুল ছাত্রী ছিলেন তারা হলেন জুলেখা, আখতারী,

পারুল।[১৫] হালিমা খাতুন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে রাজপথে বেরিয়ে এসেছিলেন বন্দুকের নলকে উপেক্ষা করে। পুলিশের সামনে দিয়ে তারা এসেম্বলীর(বর্তমানে জগন্নাথ হল) দিকে এগুতে থাকলে এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলে টিয়ার গ্যাস, লাঠি চালায়। হালিমা খাতুন তখন অন্য সবার সাথে চোখে মুখে পানি দিয়ে আবার এগিয়ে চলেন। কিন্তু টিয়ার গ্যাস আর লাঠি চার্জের কারণে এগুতে না পেরে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে পড়েন। পুলিশ দুপুর ৩টার দিকে ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলে হালিমা খাতুন তখন মেডিক্যালের জরুরি বিভাগে চলে যান। সন্ধ্যায় যখন হোস্টেলে ফিরছিলেন তখন রাস্তার দৃশ্য বর্ণনা করেন এভাবে:

> আজ যেখানে শহীদ মিনার সেখানে রক্ত আর রক্ত। ওখানে বরকত সালামের চূর্ণ হয়ে যাওয়া মাথার খুলি ও বকুল ফুলের স্তুপের মতো মগজ পড়ে আছে। আজ যেখানে যত শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ভাষা বাঁচাবার দুঃসাহসী অভিযানের কথা দৃপ্ত উচ্চারণে ঘোষণা করছে। এই শহীদ মিনার আমার কাছে এক অন্য রকম বকুল তলা।[১৬]

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে রফিকউদ্দিনের মাথার খুলি উড়ে গেলে গোপনে তার ছবি তোলা হয়। সেই রাতে রফিকের ছবির একটি ব্লক তৈরি করা হয়। ব্লকটি রাখা হয় সলিমুল্লাহ হলে, শাহ কিবরিয়ার রুমে। পুলিশ হল তল্লাশি শুরু করলে সবাই সেখান থেকে সরে পড়েন। হল পুলিশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ অবস্থায় রফিকের ছবির ব্লকটি নিয়ে আসার জন্য হালিমা খাতুনকে হলে পাঠানো হয়। ভীষণ ঝুঁকির মুখে জীবন বাজি রেখে তিনি ব্লকটি উদ্ধার করেছিলেন। এখন পর্যন্ত রফিকের যে ছবিটি দেখা যায়, সেটি ওই ব্লক দেখে তৈরি। শহিদ রফিকের ছবি আজকে ইতিহাসের দলিল। আর ইতিহাসের এই দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন হালিমা খাতুন।[১৭]

পরবর্তীসময়ে তিনি আহত ভাষাসংগ্রামীদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করার জন্য অন্য মেয়েদের সাথে চাঁদা তোলেন। রাতে পোস্টার, লিফলেট লিখতেন এবং দিনের বেলায় তা বিতরণ করতেন। ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোতে এসব কাজ করে তিনি আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এর বাইরে তিনি পাড়ায় পাড়ায় নারীদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন।

সুফিয়া (ইব্রাহিম) আহমেদ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় সূচিত হয়েছিলো বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সেদিন যাদের সাহসী পদক্ষেপ এনে দিয়েছে আমাদের মাতৃভাষা তাদেরই একজন সুফিয়া ইব্রাহিম[১৮] ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> ২১ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে আমতলায় এক বিশাল ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি সভায় অংশগ্রহণ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলের বহু ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলো। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কি-না এ নিয়ে সভায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সভা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না তাদের পরবর্তী কর্মসূচী কি হবে। এক পর্যায়ে আমরা ছাত্রীরা সভা ত্যাগ করে কলাভবনে আমাদের কমন রুমে গিয়ে বসি। বহু তর্কবিতর্কের পর সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ৫ জনের খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে। আমাদেরকে কমনরুম থেকে খবর দিয়ে আনা হলো। আমরা মিছিলে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। প্রথমে ছাত্রদের ২/৩ টি দল রাস্তায় নামে। এরপরই ছাত্রীদের প্রথম দলটি রাস্তায় বের হয়। এই দলে আমি, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন নাহার এবং ইডেন কলেজের একজন ছাত্রী (নাম জানা নাই) এ পাঁচজন অংশ নেই। .... ছাত্রদের মিছিল অনুসরণ করে আমরা ছাত্রীরা পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ (বর্তমানে জগন্নাথ

হল মিলনায়তন) এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় অসংখ্য পুলিশ। মাঝে মাঝে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। কিছুটা এগুবার পরেই সিটি এস.পি মাসুদ মাহমুদের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। ... আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রসেশনে আসাটা তোমার ভুল হয়েছে। সরকার আমাদেরকে বিক্ষোভকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বাসায় চলে যাও। তা- না হলে তোমারও বিপদ হতে পারে। এস.পি-র কথায় আমি কর্ণপাত করলাম না। মনে মনে বললাম, তিনি সরকারী কর্মচারী, সরকারী নির্দেশ পালনের জন্য এখানে এসেছেন, আমি এসেছি আন্দোলনে- আমার মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। এস.পি-র কথা শেষ হওয়ার পর একটু সামনের দিকে এগুচ্ছি এমন সময় পুলিশ মিছিলের ওপর প্রচণ্ডভাবে লাঠিচার্জ ও ব্যাপকভাবে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। টিয়ারগ্যাসের কালো ধুঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। মিছিল-কারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। টিয়ারগ্যাসের ঝাঁঝে আমার চোখে ভীষণভাবে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। চোখ লাল হয়ে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে শুধু পানি ঝরতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করি। কোনো রকমে হাঁটতে হাঁটতে এস.এম হলের প্রভোস্টের বাড়ীর সামনের মাঠে আশ্রয় নেই।[১৯]

পুলিশি নির্যাতনের ঘণ্টাখানেক পর সেখান থেকে তিনি মেডিক্যাল কলেজের দিকে যান। বিকেলে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনে আনোয়ারা খাতুন ছাত্রীদের উপর পুলিশের অত্যাচারের কথা বলেন। তিনি সুফিয়া ইব্রাহিম এর উপর পুলিশের লাঠিচার্জের কথাও উল্লেখ করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি সুফিয়া আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে আন্দোলন পরিচালনা করতে তহবিল সংগ্রহের জন্য চাঁদা তোলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তার উপর। তিনি সানন্দে একাজে সম্মত হন। দল বেঁধে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় চাঁদা সংগ্রহে গিয়েছেন। তারা যে বাসায়ই গিয়েছেন সেই বাসারই গৃহকর্ত্রী তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কম-বেশি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কেউ তাদেরকে নিরাশ করেননি, দিতে না পারার অক্ষমতাও প্রকাশ করেননি। ভাষা আন্দোলনের প্রতি মানুষের সেদিন কত ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল চাঁদা সংগ্রহের ঘটনাটি থেকে তা সহজে বুঝা যায়।[২০] সেদিনের ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, "সেসময়কার প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন তার মতো যেসব নারী, সেটি তাদের জন্য মোটেই সহজ ছিল না। তারপরও নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ভুলে সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ তাদেরকে প্রথম বাইরে টেনে আনে যা তাদের অগ্রগতিতে একটি মাইলফলক।"[২১] মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা, বাঙালি জাতির স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এবং নিজের বিবেকের তাড়নায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন তিনি।

রওশন আরা বাচ্চু

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে রওশন আরা বাচ্চু[২২] সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন গোপন মিটিং-এ তিনি যোগদান করেছেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় যোগদানের জন্য কামরুন্নেসা ও বাংলা বাজার গার্লস স্কুল এবং ইডেন কলেজ থেকে ছাত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন। সেই দিনের ঘটনা সম্পর্কে তার লিখিত ভাষ্য:

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল; কেউ পুলিশ কর্ডনের লাঠির ওপর দিয়ে, কেউবা লাঠির নিচে দিয়ে। কিছু ছাত্র বেরুচ্ছিল দেয়াল টপকে, কিছু ছাত্র মধুদার ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে ফোকর গলে। আপসহীন ইস্পাত কঠিন শপথে উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের আটকায় কে! সাফিয়া আপা, হালিমা ও আমি গেটের কাছে আসি এবং সব ছাত্রী যাতে মিছিলে যোগ দিতে পারে সে সুযোগ সৃষ্টির সাহায্য করি। সাফিয়া আপা যান লাঠির ওপর দিয়ে, হালিমা লাঠির নিচ দিয়ে। দুটোর কোনোটাই আমার মনঃপূত হলো না। সেজন্য

আমি ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে লাঠির কর্ডন সরিয়ে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করি এবং কর্ডন ভেদ করে তৃতীয় দলের সঙ্গে মিছিলে যোগ দেই। প্রথম ও দ্বিতীয় দলের ছাত্রছাত্রীদের পুলিশ ট্রাকে তুলে নেয়। আপসহীন বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীর ধাক্কায় পুলিশ কর্ডন ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ। আমি নিজেও তার হাত থেকে রেহাই পাইনি। কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জের মধ্যেই আমি ছুটে গেলাম অ্যাসেম্বলি হলের (জগন্নাথ হল) দিকে। বেলা প্রায় সাড়ে ৩টায় মিছিল মেডিকেলের মোড়ে পৌছালে জেলা প্রশাসক কোরেশীর নির্দেশে পুলিশ অবিরাম গুলি ছুড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ দেয় বরকতসহ আরও অনেকে। মেডিকেলের উল্টোদিকে এসএম হলের প্রভোস্ট এম. এ. গণির বাড়ি। গুলির মধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে গণি সাহেবের বাড়ির ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ... ভেতরে গিয়ে দেখি আহত সারা তৈফুর, সুফিয়া ইব্রাহিম, বোরখা শামসুন, সুরাইয়া ও ডলি। ওরা আমার আগেই কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে চলে এসেছে। আহত অবস্থায় একজন অন্যজনের দিকে তাকাচ্ছিলাম। ওরা আমাকে দেখে বিচলিত হয়ে গণি সাহেবের বাড়ি থেকে পানি চেয়ে এনে খাওয়াল। পরিবেশ তখন এমনই থমথমে যে হোস্টেলে ফিরে যাবার সাহস পাচ্ছি না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী যাচ্ছেন। 'মুনীর ভাই' বলে ডাক দিলাম। তিনিই আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিলেন।[২৩]

গুলিবর্ষণের পর ছাত্র আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনে রূপ নেয়। চারদিকে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি রওশন আরা বাচ্চুর আহত হবার সংবাদ পেয়ে সাংসদ আনোয়ারা খাতুন এবং ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস জোহা তাকে হোস্টেলে দেখতে আসেন।[২৪] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছিলেন, যারা আহত হয়েছিলেন এবং যে সব রাজবন্দি ছিলেন তাদের সবাইকে স্মরণ করতে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে প্রভাতফেরি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণকারী ৩০ জন ছাত্রীর মধ্যে তিনিও ছিলেন।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভা ও সমাবেশে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। কোনো ভয়ভীতি তাকে ভাষা-চেতনার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি যে সময় ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, সে সময় ছাত্রীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অনুমতি ছাড়া ছেলেদের সাথে কথা বললে সে সময় দশ টাকা জরিমানা করা হতো ছাত্রীদের। আন্দোলনে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়ার পারিবারিক হুমকিও ছিল তার।[২৫] কিন্তু মাতৃভাষার সংগ্রামে তিনি সকল বাধাকে জয় করে এগিয়ে এসেছিলেন। তার দৃঢ়তা ও সাহস এবং জীবন বাজি রেখে মিছিলে অংশ নেয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীকেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

শাফিয়া খাতুন

বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতার সাথে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের যে আবহ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন শাফিয়া খাতুন।[২৬] ১৯৫১-৫২ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভিপি ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করলে ছাত্র-জনতার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে যে প্রতিক্রিয়া হয় শাফিয়া খাতুন তাতে আন্দোলিত হন। তিনি উইমেন স্টুডেন্টস ইউনিয়েনের ভিপি হিসেবে এ সময় ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীনিবাস (Dhaka University Women Student's Residence) চামেরী হাউজের (চামেলী হাউস নামেও পরিচিত, বর্তমানে সিরডাপ ভবন) ছাত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং তাদেরকে ভাষা আন্দোলনে

সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেন।[২৭] ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি বার লাইব্রেরি হলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ৪৩ সদস্যের যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তিনি এর সদস্য ছিলেন। তার মাধ্যমেই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কর্মতৎপরতা বিশেষ করে গোপন ও প্রকাশ্য নির্দেশাবলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জানানো হতো। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ধর্মঘট চলাকালীন ছাত্রীদের মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন।[২৮]

শাফিয়া খাতুন ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহিলা কলেজে ও গার্লস স্কুলে ছাত্রীদের সুসংগঠিত করে আন্দোলনমুখী করার কাজে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করেন। এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন বা একাধিক সহপাঠী ছাত্রীকে দায়িত্ব বণ্টন করে তিনি আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠনে ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে চামেরী হাউজে বেশ কয়েকটি বৈঠক, মিছিল ও সমাবেশে তিনি নেতৃত্ব দেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশকে সফল করার জন্য তিনি ছাত্রীদের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। আমতলার সমাবেশে যখন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয়ে আলোচনা হয় এবং চারজন করে বের হবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় তখন তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সব ছাত্রছাত্রীর একসাথে বের হবার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন চারজন ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বের হলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে না। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার প্রক্রিয়া শুরু হলে ছাত্রীদের দলের নেতৃত্ব দেন শাফিয়া খাতুন। তার সঙ্গে ছিলেন সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার, হালিমা খাতুন প্রমুখ। পুলিশের লাঠির আঘাত ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তবে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।[২৯] একপর্যায়ে তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. এম এ গণির বাসভবনে যান। সেখানে গিয়ে আরও কয়েকজন ছাত্রীর সাথে তার দেখা হয়। তিনি তাদের নিয়ে পুনরায় একটি মিছিল করেন, মিছিলটি সায়েন্স অ্যানেক্স ভবনের পাশ দিয়ে টিএসসি ঘুরে রেসকোর্স মাঠ বরাবর চলে যায়। পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় এবং কিছু ছাত্রীকে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তখন শাফিয়া খাতুন সামান্য আহত হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে আসেন।[৩০]

১৯৫২ সালে ২২, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি বিচ্ছিন্নভাবে ও সুসংগঠিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় যেসব সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল হয় সেগুলোর কয়েকটিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাফিয়া খাতুনের নেতৃত্বে ছাত্রীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের উপর সরকারের বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিন্দা করা হয়। এভাবেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৩১]

শামসুন্নাহার আহসান

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময়ে শামসুন্নাহার আহসান[৩২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এই উত্তাল সময়ে তিনি তার সহপাঠীদের সাথে ছাত্রসভা, মিছিল ও পিকেটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনকে সফল করার জন্য চামেরী হাউজে যে কয়েকটি সমাবেশ ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব বৈঠকে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন। তাছাড়া চামেরী হাউজের ছাত্রীদের সংগঠিত করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সমাবেশ সফল করার জন্য বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের সংগঠিত করে আমতলায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছেন। আমতলার সমাবেশ

থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত হলে শামসুন্নাহার আহসান এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। তিনিও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বের হয়ে এসেছিলেন।[৩৩] এ প্রসঙ্গে সুফিয়া আহমেদের স্মৃতিচারণ:

> আমাদের মিছিলে শামসুন্নাহারের অংশগ্রহণ করাটাই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের ছাত্রী। আমার সহপাঠিনী। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার আবদুল ওহাব তার পিতা। শামসুন নাহারের পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনের মধ্যে সবসময়ই একটি রক্ষণশীল ভাব প্রকাশ পেতো। সে রোরখা পরতো। মিছিলে ও সে বোরখা পরেই অংশ নেয়। মেধাবী ছাত্রী শামসুন নাহার অধিকাংশ সময়ই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এরূপ পর্দানশীল ও রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারিনী শামসুন নাহারও সেদিন বাঙালির জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কারণে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।[৩৪]

২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবি জানাজা শেষে যে প্রতিবাদী মিছিল হয়, তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারির মিছিল ও সমাবেশেও তার উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। অন্যদের সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। এভাবেই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

মোসলেমা খাতুন

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় এমএ পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় ছিলেন মোসলেমা খাতুন। শান্ত প্রকৃতির এই সাদাসিধে ছাত্রীটি ভাষা আন্দোলনে তেমন সোচ্চার না হলেও সক্রিয় ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আমতলার সমাবেশে অংশগ্রহণ করেননি, তবে সহপাঠীদের কাছে হোস্টেলে সকালের ঘটনার বিবরণ শোনে আর স্থির থাকতে পারেননি। যখন ছাত্র মারা যাবার খবর শুনেছেন তখনই দৌড়ে ছুটলেন মেডিক্যাল কলেজের দিকে। পথে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ এম এ গণির বাসা, তিনি জানালেন সামনে গেলে বিপদ হতে পারে, তাই সবাই যেন ফিরে যায়। কিন্তু এ নির্দেশ অমান্য করেই মোসলেমা খাতুনসহ অন্যরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে আহতদের শুশ্রূষা করে হোস্টেলে ফিরে আসেন।[৩৫] পরবর্তীসময়ে তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে চাঁদা তোলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> শুনলাম আন্দোলনের নেতারা বলেছেন আন্দোলন পরিচালনার জন্য আহতদের চিকিৎসার জন্য টাকা দরকার। রাতে সিনিয়ির জুনিয়র সব ছাত্রীরা এক সঙ্গে বসে আলোচনা করে ঠিক করা হল ভোরে উঠে আমরা দু'জন দু'জন করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বো আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলবো। ২২ ফেব্রুয়ারিতেও গোটা শহর ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, বিক্ষুব্ধ। আমি আর সুফিয়া খাতুন বের হলাম একসঙ্গে। আমরা গেলাম শান্তিনগর আর মালিবাগ এলাকায়। সারাদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুললাম। যে বাড়িতেই গিয়েছি সেখানেই পেয়েছি, ছাত্রদের জন্য সহানুভূতি। সবাই শোক আর দুঃখ প্রকাশ করেছে। আগ্রহভরে চাঁদা দিয়েছে। অনেক বাড়িতে মহিলারা গুলিবিদ্ধ ছেলেদের কথা বলতে গিয়ে আপনজন হারানোর মত কেঁদেছেন।[৩৬]

অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও দেখেছিলেন তিনি। তিনি আর সুফিয়া খাতুন চাঁদা তুলতে তুলতে চলে গিয়েছিলেন এক অবাঙালির বাড়ি। সালোয়ার-কামিজ পরা এক মহিলা দরজা খুলে জানতে চাইলেন 'কেয়া বাত হ্যায়? চাঁদা সংগ্রহের কথা বলতেই তিনি ধমকের সুরে অনেক কথা বলতে শুরু করেন। তখন মোসলেমা খাতুন আর সুফিয়া খাতুন দ্রুত ওই বাসা ছেড়ে বের হয়ে আসেন।[৩৭] এই সব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই মোসলেমা খাতুন ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সারা তৈফুর

সারা তৈফুর তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী। তিনি সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস চামেরী হাউজে থাকতেন। চামেরী হাউজের ছাত্রীদেরকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে শাফিয়া খাতুনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন তিনি।[৩৮] তিনি হোস্টেলের ছাত্রীদের নিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির সপক্ষে পোস্টার লিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সারা তৈফুর বলেন, "এসএম হলের ছাত্ররা কাগজ ও কালি দিয়ে যেত, আমরা পোস্টার লিখতাম, 'নাজিমুদ্দিন গদি ছাড়ো', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান।"[৩৯] ২১ ফেব্রুয়ারিতে আমতলার সমাবেশে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের সংগঠিত করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি মেয়েদেরকে সংগঠিত করার ব্যাপারে সারা তৈফুর বলেন:

> ২১ ফেব্রুয়ারি সকালেও আমরা দুই তিন জন মুসলিম গার্লস স্কুলে যাই। আমরা মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চাইলে হেডমিস্ট্রেস বাধা দেন। আমরা এসেম্বলীতে কিছু বলতে চাইলাম। তিনি আমাদের পাঁচ মিনিট বলার অনুমতি দিলেন। আমরা মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললাম, ভাষা আন্দোলনের কথা তোমরা জান। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা যৌক্তিক নয়, এটাতো তোমরা বোঝ। আজকে একটা মিটিং হচ্ছে আমতলায়। তোমরা যারা যেতে চাও, আসতে পারো। আমাদের বক্তব্য শুনে ওদের প্রায় ২৫-৩০ জন আমাদের সাথে আসে।[৪০]

আমতলার সমাবেশ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ঘোষণা প্রদান করা হলে সারা তৈফুর অন্যদের সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হন। তারা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পুলিশ লাঠিপেটা করে এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় আত্মরক্ষা করার জন্য ছোটাছুটি করতে গিয়ে তার পা কেটে যায়। এক ছাত্র সেটা দেখে রুমাল ভিজিয়ে তার পা বেঁধে দিয়েছিলেন।[৪১] পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলনের অর্থ সংগ্রহের কাজে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি আজিমপুর এলাকায় গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। তখন হলের ছাত্রীরা প্রথম ভাষার গান 'রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর ভুলব না' রপ্ত করতে থাকেন। তিনিও ছিলেন সেই দলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হলে তিনি রংপুরে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েও ভাষা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। [৪২]

সুফিয়া খান

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের একজন ছিলেন সুফিয়া খান। তখন তিনি বাংলা বিভাগের ছাত্রী এবং চামেরী হাউজের আবাসিক ছাত্রী। তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের সচেতন করে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন। তাকে অনেকবার স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সুফিয়া খান ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে এগিয়ে আসেন। পরবর্তীসময়েও তিনি চাঁদা সংগ্রহ, মিছিল মিটিং এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৫২ সালে সুফিয়া খান এমএ পাস করে বিদ্যাময়ী স্কুলে যোগ দেন। প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তিনি সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তীসময়ে ময়মনসিংহ মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৪৩]

নূরুন্নাহার কবীর

ভাষার দাবি ও আন্দোলনের কর্মসূচি সঠিকভাবে প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে একুশে ফেব্রুয়ারির আগে এবং পরে ছাত্রীরা প্রচুর পোস্টার লিখে আন্দোলনকে বেগবান করতে ভূমিকা রেখেছিলেন। আর এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন নূরুন্নাহার কবীর। তিনি সারা রাত জেগে পোস্টার লিখতেন। এই বিষয়ে ভাষাসংগ্রামী রওশন আরা বাচ্চু বলেন, "বেশিরভাগ গোপন সভার প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত

দুয়েকজন ছাত্রের মাধ্যমে ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। ছাত্রীদের দেওয়া হতো পোস্টার লেখার দায়িত্ব। সারারাত জেগে নূরুন্নাহার কবীর পোস্টার লিখতেন আর আমরা তাকে সাহায্য করতাম।”[৪৪] পোস্টার লিখা ছাড়াও ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন সভায়ও তিনি যোগদান করেছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি আমতলায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবেই রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার বাধা-নিষেধ পেরিয়ে তিনি নিজেকে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

কায়সার সিদ্দিকী

ভাষা আন্দোলনের সময় কায়সার সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্রীনিবাস চামেরী হাউজ-এ থাকতেন। চামেরী হাউজের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী শাফিয়া খাতুনের অনুপ্রেরণায় তিনি ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি মাসের উত্তপ্ত আন্দোলনের সময় তিনি ছাত্রসভা, মিছিল, মিটিং, শোভাযাত্রা, পিকেটিং এ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ থেকে শুরু করে রাত জেগে চামেরী হাউজের অন্য ছাত্রীদের সাথে পোস্টার ও ফেস্টুন তৈরি করা সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সক্রিয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে পোস্টার লাগানোর ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রাখেন।[৪৫] একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের পরও তিনি আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে সহপাঠীদের নিয়ে বিভিন্ন অফিস, দোকান ও বাসা থেকে চাঁদা তুলেছেন। ভাষা আন্দোলনের এক পর্যায়ে পুলিশ চামেরী হাউজসহ বিভিন্ন হোস্টেলে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করলে তিনি নিজ বাড়ি ময়মনসিংহে চলে যান।[৪৬]

নাদেরা বেগম

ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নের একজন অন্যতম সংগঠক ছিলেন নাদেরা বেগম।[৪৭] তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রী। ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত সভাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই সভায় পুলিশের লাঠিচার্জে তিনি আহতও হয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে আরবি, রোমান ইত্যাদি বিভিন্ন হরফে লেখার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। ঢাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে নাদেরা বেগম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি কামরুন্নেসা স্কুল, বাংলাবাজার স্কুল, ইডেন মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতেন। এসব ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। কিন্তু পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন সময় পালিয়ে যেতেন তিনি। ইংরেজি বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক এ্যানী জেরাল্ডাইন স্টক স্মৃতি কথা *Memoirs of Dacca University 1947-1951* গ্রন্থে নাদেরা বেগমের এই ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাদেরা বেগম পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।[৪৮] তিনি ১৯৪৯-১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঢাকা আর রংপুর কারাগারে ছিলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও তিনি পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারির সমাবেশে ছাত্রীরা যাতে অংশগ্রহণ করে সে জন্য হালিমা খাতুন নাদেরা বেগমের কাছ থেকে একটি চিঠি লিখিয়ে এনেছিলেন। এ বিষয়ে হালিমা খাতুন বলেন, “নাদেরা বেগম তখন আন্দোলনের কিংবদন্তি নায়িকা। অনেকবার জেল খেটেছেন। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে আমি নাদেরা বেগমের কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে আনি। মেয়েরা পরদিন সকালে আমতলার সভায় অংশগ্রহণ করেন। তার চিঠির ভাষা ছিল এমন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এটাকে

প্রতিহত করার জন্য আন্দোলনে যাও।"[৪৯] এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে তিনি ছাত্রীদের কাছে আদর্শ এবং প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিভা মুৎসুদ্দি

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। সে সময় তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রীদেরকে সংঘবদ্ধ করতে ভূমিকা রেখেছিলেন। ভাষার দাবিতে তিনি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন। অন্যান্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে মিছিল ও সভা করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ১৯৫৫ সালে তিনি যখন সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার্থী তখন একুশে ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতি মিটিং চলছিল। কথা ছিল সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার্থীরা মিটিং এ যাবে না। কিন্তু যখন খবর আসলো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তখন পরীক্ষার্থী ছাত্রীরা মিছিল করে আমতলার সভায় যোগ দিতে আসে।[৫০]

গ্রেফতারকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তির দাবিতে প্রতিভা মুৎসুদ্দি, কামরুন নাহার লাইলী, রওশন আরাসহ আরও আট-দশজনের একটি দল উইমেন্স হল (১৯৫৬-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত উইমেন্স হল এবং পরবর্তীকালে রোকেয়া হল) থেকে মিছিল নিয়ে সারিবদ্ধ মিলিটারির ভেতর দিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের আমতলায় সমবেত হন। কিন্তু সেখানে হঠাৎ পুলিশের লাঠিচার্জে ছাত্রছাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। তিনি নিজেও লাঠির আঘাতে আহত হন। তারা প্রথমে কমনরুমে পরে গ্রন্থাগারে গিয়ে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সবাই মিলে একসাথে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা বের হতেই তাদের উপর লাঠিচার্জ শুরু হয়। তখন তারা সবাই মিলে মিছিল শুরু করেন। আশেপাশে থাকা ছেলেরাও তখন আসতে শুরু করলে পুলিশ প্রায় কয়েকশত ছাত্রছাত্রীকে লালবাগ থানায় নিয়ে যায়। প্রতিভা মুৎসুদ্দিকেও তাদের সাথে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।[৫১]

প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা গ্রেফতারি পরোয়ানা বের হয়। তারপর রাতে তাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতিভা মুৎসুদ্দিকে যে কক্ষে রাখা হয় সেই কক্ষটি ছিল অনেক বড়। আগে থেকেই অনেক রাজবন্দিরা সেই কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাসহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রীও গ্রেফতার হন। গ্রেফতারকৃত ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কামরুন নাহার লাইলী, লায়লা নূর, হোসনে আরা, ফরিদা বারী মালিক (বীথি), ফরিদা, রওশন আরা প্রমুখ। তিনি নিরামিশ ভোজী হওয়ায় উইমেন্স হল থেকে প্রথম দু'দিন তার জন্য কারাগারে খাবার পাঠানো হয়। কিন্তু হল প্রশাসনের মিসেস জেন্সকিন যখন ঘটনাটি জানতে পারেন তখন তিনি তার খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেন। তিনি হল কর্মকর্তাদের জানান প্রতিভা মুৎসুদ্দি রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, তাই তাকে উইমেন্স হল থেকে খাবার সরবরাহ করা যাবে না। পরে তাকে কারাগার থেকেই নিরামিশ ভাত দেওয়া হতো। যেসব ছাত্রছাত্রী কারাগারের বাইরে ছিল, তারাও তাকে সহায়তা করেছে। তার সহপাঠীরা কারাগারে তাকে এক টিন মুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল।[৫২] সামনে তার পরীক্ষা ছিল বলে পনের দিন পর তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এভাবেই তিনি ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময় থেকে শুরু করে ভাষার দাবি আদায়ের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে উইমেন্স হলের প্রথম ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

ফরিদা বারী মালিক

ফরিদা বারী মালিকের জন্ম ও শৈশব কেটেছে শান্তিনিকেতনে। তার বাবা মালিক আবদুল বারী পেশায় প্রকৌশলী ছিলেন। মা ফিরোজা বারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য ছাত্রী। দেশভাগের পর তাদের পরিবার চট্টগ্রামে চলে আসে। তার শিক্ষা জীবন কাটে চট্টগ্রাম কলেজ, শান্তিনিকেতন ও

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনকার প্রাচীনপন্থী সমাজে ফরিদা বারী পোশাকে সাজ-সজ্জায়, আচার-আচরণে ছিলেন রুচিশীল ও প্রগতিবাদী। পরতেন সাধারণ শাড়ি, কপালে থাকত কালো টিপ, রবীন্দ্রসংগীত করতেন চট্টগ্রাম কলেজসহ অন্যান্য মঞ্চে। ১৯৫৫ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রী। তিনি তখন ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। নিজ খরচে তিনি ভাষা আন্দোলনের পোস্টার, ফেস্টুন তৈরি করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনিও সহস্রকণ্ঠের সাথে আওয়াজ তুলেছিলেন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক' 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, 'পুলিশি জুলুম বন্ধ কর' স্লোগানের সাথে। ঐদিনেই তিনি অন্যান্য ছাত্রীর সাথে গ্রেফতার হয়েছিলেন। পুলিশের কাছে জীবনে এ কাজ আর করবো না বলে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে আসার অঙ্গীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি। পুলিশ শেষ পর্যন্ত মুচলেকা ছাড়াই তাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছিল। পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যখন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীতকে নিষিদ্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করা হচ্ছিল তখন যারা চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান ধরে রাখার তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন ফরিদা বারী মালিক।[৫৩]

কামরুন নাহার লাইলী

১৯৫৫ সালের ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন কামরুন নাহার লাইলী।[৫৪] প্রতিভা মুৎসুদ্দির বর্ণনায় ১৯৫৫ সালের ভাষা আন্দোলনে কামরুন নাহার লাইলীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। তার ভাষায়:

> ... সেদিন ১৪৪ ধারা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, ১১টার দিকে খবর পেলাম সকালে মিটফোর্ড ও মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা মিলিটারিতে ছেয়ে গেছে। বিদ্রোহের আগুন তখন আমাদের মধ্যে। আমি ও কামরুন নাহার লাইলী একটি দল নিয়ে উইমেন্স হল থেকে শোভাযাত্রা বের করে এগিয়ে দেখি রাস্তার দু'ধারে হেলমেট পরিহিত বন্দুকধারী মিলিটারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখান দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হলাম।[৫৫]

পরবর্তীসময়ে একপর্যায়ে কামরুন নাহার লাইলীসহ অন্য ছাত্রছাত্রীদের গ্রেফতার করে লালবাগ থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। সেখান থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানে প্রতিদিন সকালবেলা তারা গলা ছেড়ে গান গাইতেন 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা/আজ জেগেছে সেই জনতা', 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ভেঙে ফেল/কররে লোপাট', 'ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না/সে একুশে ফেব্রুয়ারি/ ভুলব না'। তাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন চিকিৎসক। প্রথম দিকে তাদের খবরের কাগজ পড়ার অনুমতি ছিল, কিন্তু পরের দিকে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো কেটে পত্রিকাটি তাদের কাছে প্রেরণ করত জেল কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার কারণে তাদেরকে বই পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তারা সবাই একসাথে কক্ষের ভেতর তাস খেলতেন, আবার কারাগারের উঠোনে হাডুডুও খেলেছেন।[৫৬] এভাবে জেলখানাতেও তিনিসহ অন্যরা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। পনের দিন পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই ভাষাকন্যা সম্পর্কে হালিমা খাতুন বলেন, "সে নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। তার সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সে যেভাবে সমাজ উন্নয়নে ও নারী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল তা আমাদের কাছে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।"[৫৭] ১৯৮৪ সালে মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে এই ভাষাকন্যার জীবনাবসান ঘটে।

জহরত আরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরই একজন জহরত আরা। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

> I was one of the leading students who violated orders under section 144 on February 21, 1952 and was in the front row of the student's procession we faced the police firing and I remember to have climbed the medical college walls to run for safety. Subsequently, I was imprisoned along with others, and spent more than a month in the dhaka central Jail.[৫৮]

১৯৫৫ সালের ভাষা আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। জহরত আরা এবং ফরিদা বারী মালিকের নেতৃত্বে মিছিলের একটি ছবি পাওয়া যায়। সেই সময় ছবিটি তুলেছিলেন রফিকুল ইসলাম। এই ছবিটি একুশে ফেব্রুয়ারির বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়ে আসছে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিকসহ অনেক প্রকাশনায়।[৫৯] ১৯৫৭ সালে জহরত আরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এমএ পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করছেন।

লায়লা নূর

১৯৫৫ সালে লায়লা নূর[৬০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ভাষার দাবিতে সবার সাথে আমতলায় গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে লাঠিচার্জ শুরু হয়। পুলিশ তিনি এবং তার সহপাঠি হোসনেয়ারাকে ধরতে আসলে তিনি বলেন, 'গায়ে হাত দিবেন না। কোথায় যেতে হবে বলুন'।[৬১] আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য অন্য ছাত্রীদের সাথে তিনিও গ্রেফতার হন এবং ২১ দিন কারাভোগ করেন। ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী থাকাকালে তিনি অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকারের সঙ্গে 'কেরানীর জীবন' নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে একজন মুসলমান মেয়ের পক্ষে কোনো নাটকে অংশগ্রহণ রীতিমত দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। তিনি ১৯৫৭ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রথম নারী শিক্ষক হিসেবে ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৯২ সালে কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

তালেয়া রেহমান

তালেয়া রেহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন ১৯৫৪-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রগতিশীল ছাত্র ইউনিয়ন থেকে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার সাথে একই পরিষদে ছিলেন কবি শামসুর রাহমান এবং শিক্ষাবিদ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তিনি ছিলেন চামেরী হাউজের আবাসিক শিক্ষার্থী। চামেরী হাউজের অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে তিনিও ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। চামেরী হাউজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য ছাত্রীর সাথে তিনিও গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাদের কারাজীবন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> সেই পুলিশ ট্রাক আমাদের সকলকে প্রথমে পুরনো ঢাকায় লালবাগ থানায় নিয়ে রাখলো। কাউকে কোনো খবর দেয়ার উপায় ছিল না। এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ছিল না। সারাদিন থানায় রেখে বিকেলে আমাদের সেন্ট্রাল জেলে নেয়া হলো। একটি ছোট হলরুমে আমাদের সবাইকে গুনে ভেতরে ঢোকানোর পর প্রত্যেকের জন্য ওরা দুটি করে কম্বল দিল। তারপর টিনের থালা গামলাতে মোটা চালের ভাত ও পানির মতো টলটলে ডাল দিয়ে গেল। কিছু পরে গার্ডরা থালা-গামলা গ্লাস ফেরত

> নিয়ে আমাদের হলরুমের দরজায় বিশাল এক তালা ঝুলিয়ে চলে গেল। ...পরদিন ভোর বেলা তালা খোলা হলো। কাছেই একটি মাত্র টয়লেটে সীমিত সময়ের মধ্যে সকলের প্রাতকৃত্য সম্পন্ন করতে হলো। এরপর এলো এক বালতি চা আর তিন ইঞ্চি পুরু করে কাটা পাউরুটির একটি টুকরো। সবার জন্য টিনের মগ দেয়া হয়েছিল। আমরা সবাই ধূমায়িত চায়ের মগে চুমুক দিয়ে কষ্ট ভোলার চেষ্টা করলাম। দুপুরে এলো মোটা চালের ভাত, টলটলে ডাল এবং ছোট এক টুকরো মাছের তরকারি। রাতে এসেছিল আটার চাপতি ও সবজি। দিনের মধ্যে একবার ঘণ্টাখানেকের জন্য আমাদের হলরুমের বাইরে নেয়া হতো। জেল পরিভাষায় ওটা ছিল আমাদের এক্সারসাইজ। রাতে আরেকবার সবাইকে টয়লেটে যেতে দেয়া হতো।[৬২]

এভাবেই সকল কষ্ট স্বীকার করে ভাষার জন্য লড়াই করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। তারা ভাষা আন্দোলনের সময় মিছিল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে ছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে ইডেন কলেজ, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল, মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদেরকে মিছিল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজনেও এগিয়ে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন বলেন:

> আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে দেবার জন্য টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের হাতে শুরুতে কিছুই ছিল না। ছাত্রাবাসগুলো থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের কাছে আবেদন করেও তেমন সাড়া মেলেনি। ফজলুল হক হলের অধীনে সংগৃহিত তহবিল খুব বড় ছিল না। সলিমুল্লাহ হলের ভি. পি, জি. এস (মুজিবুল হক ও হেদায়েত হোসেন চৌধুরী) তো তহবিল সম্পর্কে আমার সাথে কোনো কথা বলতেই রাজি হয়নি। অবস্থা দৃষ্টে, ‘চামেলী হাউজ’ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের হোস্টেলে রোকেয়া নামে বগুড়ার এক ছাত্রীকে পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে আন্দোলনের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের অনুরোধ জানাই। ওরা কয়েকজন ছাত্রী চাঁদা তুলতে কলোনীতে গিয়ে আশাতীত সাড়া পেয়েছিল। দুই দিন পর সন্ধ্যায় কথা বলতে গিয়ে আমিও অবাক হই। প্রায় দশ হাজার টাকা ওরা সংগ্রহ করে এনেছে। সে টাকা খুব কাজে লেগেছিল। মফস্বলে ছাত্রকর্মীদের পাঠাতে, ইস্তাহার ছাপাতে আরো নানা কাজে বেশ পরিমাণ টাকা খরচ হয়।[৬৩]

অর্থ সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন স্থানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া আহমেদ, শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, রওশন আরা, আমেনা মাহমুদ, কায়সার সিদ্দিকী, খোরশেদী আলমসহ আরও অনেক ছাত্রী এই চাঁদা তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া ছাত্রীরা পোস্টার এবং লিফলেট লেখা, লাগানো এই কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী নূরুন্নাহার কবীরের হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলে তিনি বেশির ভাগ পোস্টার লেখার দায়িত্বে ছিলেন। তাকে সাহায্য করতেন রওশন আরা বাচ্চু, মাহফিল আরা, রাবেয়া ইসলাম, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, কায়সার লিলিসহ আরও অনেকে। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের প্রচারণায়ও ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনে সকল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এ মাতৃভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৫২ সালে এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারা যেমন ১৪৪ ধারা ভঙ্গে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তেমনি ১৯৫৫ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়েও ছাত্রীরা প্রতিবাদী হয়ে কারাবরণও করেছেন। সে যুগে

সামাজিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক খুব সহজ স্বাভাবিক ছিল না। প্রয়োজনে কোনো সহপাঠীর সাথে কথা বলতে হলে প্রক্টরের অনুমতি লাগত। তাছাড়া কথা বলার সময় তার প্রতিনিধিও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। এর বাইরে হোস্টেলের মেয়েদের ওপর ছিল নানা বিধি নিষেধ। এ সম্পর্কে ভাষাসংগ্রামী হালিমা খাতুনের স্মৃতিচারণ:

> হলের নিয়ম কানুন ছিল খুব কঠিন। সূর্যাস্ত আইনের চেয়েও কড়া, ক্লাস ছাড়া কাটা তারের বাইরে আর কোথাও যাবার অনুমতি ছিল না। কোথাও যেতে হলে স্থানীয় অভিভাবকের সীল গালা করা চিঠির প্রয়োজন হতো। সহপাঠী বা কোনো ছেলের সাথে কথা বলা ছিল বেআইনী। ... জামা কাপড় কেনার দরকার হলে সুপারের অনুমতি নিয়ে একজন বিবাহিত মেয়ের সাথে নির্ধারিত সময়ে বাজারে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হতো। ... সে সমস্ত কালা-কানুন সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও যেমন করেই হোক সকল বাধা অতিক্রম করে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, রাতে মার্কসবাদের ক্লাস করা এবং ভাষা আন্দোলনের সব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে মিটিং মিছিল কিভাবে যে করছি তা ভাবতে এখন অবাক লাগে।[৬৪]

এ সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধ, সামাজিক রক্ষণশীলতা, পারিবারিক বাধা কোনো কিছুই ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ভাষা আন্দোলনে যে সব ছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে হালিমা খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, কামরুন নাহার লাইলী, রওশন আরা বাচ্চু ও প্রতিভা মুৎসুদ্দির নাম সর্বাধিক প্রচারিত। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য যে সকল ছাত্রী জড়িত ছিলেন তাদের নাম হয়তো অনেকেরই অজানা। পরোক্ষভাবেও আরও অনেক ছাত্রী সম্পৃক্ত ছিলেন যাদের নামও হয়ত অজানা।

সংস্কৃতি সংসদের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন

পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার যে ধারা গড়ে ওঠে, আদর্শগত দিক থেকে তা দেশ বিভাগ-পূর্ব গণনাট্য সংঘ এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের নবনাটক ও গণসংস্কৃতি চর্চার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। বিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ গড়ে তুলেছিলেন মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন আর পঞ্চাশের দশকে একই ধারায় গড়ে উঠলো সংস্কৃতি সংসদ। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল সামাজিক গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আর সংস্কৃতি সংসদ গড়ে উঠেছিল প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি চর্চার জন্য।

সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। **১৯৫১** সালের মার্চ মাসে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ৩৮নং কক্ষে সূচনা হয় সংস্কৃতি সংসদের পরবর্তীকালে নাম হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ। আনওয়ারুল আজিম চৌধুরী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান ও ওবায়দুল হক সরকার সংস্কৃতি সংসদের সূচনা করেন।[৬৫] সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চারজন প্রগতিশীল শিক্ষক অমিয় চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, খান সারওয়ার মুরশিদ এবং মুনীর চৌধুরী ছিলেন প্রেরণাদাতা।[৬৬] মূলত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও রুশবিপ্লব প্রভাবিত আদর্শ দ্বারা সংসদ পরিচালিত হতো। এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল মননশীলতায় বিশ্বাসী এবং গণআন্দোলন ভিত্তিক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।[৬৭] সংস্কৃতি সংসদ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের একটা বড় ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃতি সংসদ। সকল ছাত্রের সংগঠন হলেও সংস্কৃতি সংসদে প্রাধান্য ছিল বামপন্থী ছাত্রদের, এর কাজকর্মেও তা প্রকাশ পেত।”[৬৮]

সমসাময়িক বহু প্রগতিশীল ব্যক্তি সংস্কৃতি সংসদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সংস্কৃতি সংসদের প্রথম সভাপতি ছিলেন খান সারওয়ার মুরশিদ, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফা নূর উল ইসলাম। এছাড়া অন্য যারা সংস্কৃতি সংসদের সাথে জড়িত ছিলেন তারা হলেন গিয়াসউদ্দীন আহমেদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, মুজিবুর রহমান খান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মমতাজ উদ্দীন আহমদ, মকসুদউস সালেহীন, বজলুল করিম, শহীদ খান, জিয়া হায়দার, জহিরুল হক, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রামেন্দু মজুমদার, ফারুক আলমগীর, রশীদ হায়দার, আসাদ চৌধুরী, মুসা আহমদ, আতাউর রহমান প্রমুখ। যে সকল ছাত্রী সংস্কৃতি সংসদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, ফরিদা বারী মালিক, কামরুন নাহার লাইলী, জহরত আরা খানম, ফাহমিদা খাতুন, মালেকা বেগম, ফেরদৌসী মজুমদার, সুলতানা রেবু প্রমুখ।[৬৯]

সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সংসদের তৎপরতা ছিল বহুমাত্রিক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা ঢাকায় বৃহত্তর জনমানুষের জন্য উন্নত মানের নাটক, গণসংগীত দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেছে। এর বাইরে ভাষা আন্দোলনের পুস্তিকা প্রকাশ করে এই সংগঠন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংস্কৃতি চেতনার মান উন্নয়ন, সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সংস্কৃতির কলুষতা থেকে মুক্তি অর্জন এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য এর নিরলস সংগ্রাম ছিল অপ্রতিরোধ্য।[৭০]

প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রম মূলত নাটক মঞ্চায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। **১৯৫১** সালের ৪ সেপ্টেম্বর মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে সংস্কৃতি সংসদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের গণনাট্য 'জবানবন্দী' মঞ্চস্থ করে। তখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক মঞ্চায়নে সহ-অভিনয় প্রথা চালু হয়নি, ছেলেদের হলে নাটকে ছেলেরা স্ত্রী চরিত্রে মেয়ে সাজতো আর উইমেন্স হোস্টেলে মেয়েরা নাটকে পুরুষ চরিত্রে ছেলে সাজতো। সংস্কৃতি সংসদ 'জবানবন্দীতে' প্রথম সহ-অভিনয় প্রথা চালু করে।[৭১] নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন সে সময়ের ঢাকার আধুনিক নাট্য পরিচালক হাবিবুল হক, সহ-পরিচালক মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শরফুল আলম। 'জবানবন্দী' নাটকে পুরুষ চরিত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কামাল আহমেদ, কাজী আব্দুল মুকিত, আজিজুল জলিল, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ওবায়দুল হক সরকার আর নারী চরিত্রে লায়লা সামাদ, রোকেয়া কবীর এবং নুরুন্নাহার অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু এই সহ-অভিনয়ের বিষয়টি মোটেই সহজ ছিল না। এই বিষয়ে ওবায়দুল হক সরকার লিখেছেন:

> নাটকের তিনটি মহিলা চরিত্র। ঠিক হলো, আর ছেলে দিয়ে মেয়ের পাঠ করানো নয়। ছাত্রদের এই নাটকে ছাত্রীরা অভিনয় করবে। কিন্তু কোনো ছাত্রী রাজী হয় না। শেষে নুরুন্নেহার নামে এক ছাত্রী রাজী হলেন; কিন্তু বাকী দুটি চরিত্রে ছাত্রী আর পাওয়া গেল না। অগত্যা দুই শিক্ষিকা মিসেস রোকেয়া কবীর ও মিসেস লায়লা সামাদ রাজী হলেন। শিক্ষার সাথে জড়িত অতএব, ছাত্রদের নাটকে চলে। মহিলা শিল্পী সমস্যার সমাধান হলো। কিন্তু রিহার্সালের জায়গা আর পাওয়া গেল না। যেখানেই যাই সেখানেই 'সোমত্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের এই বেলেল্লাপনা চলবে না' শুনতে হয়। নাটক যেন নেহায়েত অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ। অবশেষে নীলক্ষেতে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর বাসায় রিহার্সালের সুযোগ পেলাম। মুনীর চৌধুরী তখন জেলে। মিসেস লিলি চৌধুরী সব ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু রিহার্সালের ব্যবস্থা করে দেয়া নয়; মিস নুরুন্নেহারকে তার বাসায় এনে রাখলেন। তিনি থাকতেন চামেলী হাউজে (রোকেয়া হল)। তখন তালিকাভুক্ত অভিভাবক ব্যতীত ছাত্রীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। প্রতিদিন রিহার্সালে উপস্থিতি তাই সম্ভব ছিল না। লিলি আপা তাকে তার বাসায় নিয়ে এসে রিহার্সালের সুযোগ করে দিলেন। লিলি আপার সাহায্য সহযোগিতা না পেলে হয়তো আমরা নাটকই মঞ্চস্থ করতে পারতাম না।[৭২]

রিহার্সালের সুযোগ পাওয়া গেলেও নাটক মঞ্চায়নের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতেও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল আর কলকাতার গণনাট্য সংঘ ছিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের। তাই গণনাট্য সংঘের নাটক মঞ্চস্থ করা ছিল অসম্ভব। তখন পরিচালক হাবিবুল হকের সহযোগিতায় নাটক মঞ্চায়নের ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীসময়ে পুলিশ প্রহরায় মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তবে নারী চরিত্রে ছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় করানোর বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেনি। কিন্তু ঢাকার পত্রপত্রিকা 'জবানবন্দী' নাটকের প্রশংসা করায় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[৭৩] *Pakistan Obserber*-এ ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'নিউ ট্রেন্ডস অ্যান্ড নিউ ফেসেস' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 'জবানবন্দী' নাটকের অভিনয় শিল্পীদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ

> Mr. Obaidul Hoq Sarkar as Paran Mondal gave us first rate acting. It was, I believe, a little difficult for a University student to be life-like to a peasant who died of starvation in the street of Calcutta. There were other particularly difficult points also. ...Mrs. Rokea Kabir as the Mother of Benda was probably at her best as also Miss Nurun Nahar who as Benda's wife had little to say but much to do. Kamal Ahmed as Benda, Kazi Mukit as Poda, Obaidullah as the villain and Mrs. Laila Samad as Hashi were also good.[৭৪]

দৈনিক সংবাদ-এও বিশ্ববিদ্যালয় এবং হলগুলোর নাটকাভিনয়ে যেন বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্রীরা সমভাবে অংশগ্রহণ করে সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। *দৈনিক সংবাদ*-এর ২৪ ভাদ্র ১৩৫৮ সংখ্যায় বলা হয়, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ছাত্রদের সঙ্গে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা নিঃসন্দেহে বলা চলে বলিষ্ঠ ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মিস নূরুন্নেহার ও রোকেয়া কবীরের অভিনয়ে সুদক্ষ অভিনয়ের ছাপ প্রস্ফূটিত ছিল। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে হল ও ইউনিভার্সিটির নাটকাভিনয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীগণ সমভাবে অংশগ্রহণ করবে।"[৭৫]

১৯৫১ সালে সংস্কৃতি সংসদের সাফল্য দেশব্যাপী এমন সাড়া জাগালো যে, ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নাটক প্রদর্শনের জন্য একমাত্র সংস্কৃতি সংসদকেই নির্বাচিত করা হয়। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সংস্কৃতি সংসদ এই নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ করে প্রশংসিত হয়। কুমিল্লার মঞ্চে মেয়েদের অভিনয় করার বিষয়টিও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ সম্পর্কে ওবায়দুল হক সরকারের স্মৃতিচারণ, "জবানবন্দী নাটকে মিসেস রোকেয়া কবীর, মিসেস লায়লা সামাদ এবং মিস নূরুন্নাহার ছিলেন। এই মহিলারা যেমন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত তেমনি ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য। তাদের কুমিল্লার মঞ্চে আগমন, স্বভাবতই মহিলা মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[৭৬] সংস্কৃতি সংসদ ১৯৫৩ সালে মঞ্চস্থ করে তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', ১৯৫৪ সালে মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ এবং বনফুলের 'কবয়ঃ', ১৯৫৬ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', ১৯৫৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'। নাটকের এই ধারার পাশাপাশি দেশাত্মবোধক সংগীত ও গণসংগীতের অনুষ্ঠানও সংস্কৃতি সংসদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চা বিকশিত হয়েছে মূলত সংস্কৃতি সংসদকে কেন্দ্র করে। সংস্কৃতি সংসদের নাটকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন লিলি চৌধুরী, হোসনে আরা বিজু, সাবেরা খাতুন, রোকেয়া কবীর, মাসুদা চৌধুরী, সৈয়দা রওশন, মুনীরা খান, জহরত আরা খানম, রাজিয়া খান প্রমুখ।[৭৮]

১৯৫৫ সালে সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াও রবীন্দ্র, নজরুল এবং সুকান্ত স্মৃতি তর্পণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে সংস্কৃতি সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল

একুশের পটভূমিকায় রচিত 'কবর' নাটকের অভিনয়, বাংলা ভাষার আলোচনা এবং স্বদেশি সংগীতের আসর। ১৯৫৭ সালে ঢাকা হল মিলনায়তনে সংস্কৃতি সংসদ উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান করে। একই বছর সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে নিয়মিত সাহিত্য সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান ছাড়াও রবীন্দ্র, নজরুল এবং সুকান্ত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সংস্কৃতি সংসদ দশদিনব্যাপী নাটক, কাব্যনাটক, সংগীত, সাহিত্যালোচনা এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ১৯৫৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান হয়। পরের বছর সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি সংসদের বসন্ত উৎসবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬১ সালে ঢাকা কলেজের মিলনায়তনে সংস্কৃতি সংসদ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে যা বছরের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে অভিহিত হয়। ১৯৬২ সালে সংস্কৃতি সংসদ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে দুইদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে ৩ অগ্রহায়ণের দেশাত্মবোধক সংগীতের আসর ও ৪ অগ্রহায়ণের শ্যামা নৃত্যনাট্য ব্যাপক প্রশংসিত হয়। পরের বছর সংস্কৃতি সংসদ বাংলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দেশাত্মবোধক সংগীতের আয়োজন করে। ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমির বটতলায় গণসংগীতের আসর হয়। ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম সংস্কৃতি সংসদ রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করে। ১৯৬৬ সালে সংস্কৃতি সংসদ 'জ্বলছে আগুন ক্ষেতে খামারে' শীর্ষক নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে।[৭৯] ১৯৭০ সালে সংস্কৃতি সংসদ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দ্বাদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে মহসীন হলের খেলার মাঠে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দু'পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল গণসংগীতের আসর এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিল সমরেশ বসু রচিত সামন্তবাদবিরোধী বক্তব্য নিয়ে লেখা 'আবর্ত' নাটকের মঞ্চায়ন। গণসংগীতের আসরে সমবেত কণ্ঠে সর্বমোট নয়টি এবং একক কণ্ঠে পাঁচটি গান পরিবেশন করা হয়। গণসংগীতের আসরে অংশগ্রহণ করেন শেখ লুৎফর রহমান, মোস্তফা জামান আব্বাসী, অজিত রায়, মাহমুদুন্নবী, মালেকা আজিম খান, ইকবাল আহমেদ, মিলিয়া গণি, রমানাথ, আলোক মোহাইমেন, সফিক, মঞ্জুর মোরশেদ, হাসান মনসুর বাচ্চু, মুজাহিদ, মল্লিক, দুলু, ফিরোজ, বুলু, রাজিয়া, তাজিম সুলতানা, ইরফাত লতা, শ্রাবণী, নার্গিস সুলতানা প্রমুখ। এছাড়া সংস্কৃতি সংসদ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়নসহ আবৃত্তি অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করতো। এই সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে জহরত আরা, মাসুদা চৌধুরী, মুনীরা খান, জাহানারা লাইজু, তালেহা খান, রওশন আরা রানু, নাদেরা চৌধুরী, রাশেদা চৌধুরী, জাহানারা নূর, মাসুমা, মোরশেদ খান, কামরুন নাহার লাইলী অন্যতম।[৮০]

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে যে কোনো ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে রুখে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতি সংসদ। বাংলা ভাষা ও লিপি সংস্কারের মাধ্যমে সুদীর্ঘকালের বাঙালি ও বাংলা ভাষা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে পাকিস্তানি আদর্শায়িত করার উদ্যোগ নেয়া হলে সংস্কৃতি সংসদ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৬৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেল চারটায় সংস্কৃতি সংসদ সাধারণ ছাত্রসভার আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর সংস্কৃতি সংসদ একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে।[৮১] এর বাইরে পোস্টার কিংবা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতি সংসদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের একটা বড় ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃতি সংসদ। আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ সংস্কৃতি সংসদ সর্ম্পকে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র–ছাত্রী হিসাবে পড়তে এলে সংস্কৃতি সংসদের নাম না জেনে উপায় ছিল না। সংস্কৃতি সংসদের আভিজাত্য ছিল অসাধারণ আর রূপ ছিল আকর্ষণীয় মুখের মত। এর যেকোনে আলোচনা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকতে হত না, তারা নিজেরাই ভিড় করতেন। ক্লাসকক্ষ দর্শকে ভরে যেত। আর বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় জায়গা পাওয়া যেত না অনুষ্ঠান দেখার। সে জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হত বাংলা একাডেমির খোলা মাঠে আর টিএসসির বড় লনে।[৮২]

প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অবদান একক গৌরবে মণ্ডিত। সংস্কৃতি সংসদ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাহমুদ হাসান লিখেছেন:

> সংস্কৃতি সংসদ একটি ঐতিহ্য একটি আন্দোলন। সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে একটি দুর্জয়, বলিষ্ঠ, একক সংগঠন।...এ প্রতিষ্ঠানটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর কর্ম-প্রয়াস ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিমণ্ডলের মধ্যে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নয়ন, সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সংস্কৃতির কলুষতা থেকে মুক্তি অর্জন এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য এর প্রয়াস নিরলস-সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্ন। গতি অপ্রতিরোধ্য।...এর মূল সুর হলো প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মানবিক সংস্কৃতির উদাত্ত ঘোষণা।[৮৩]

প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উদার ও মননশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সংস্কৃতি সংসদ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল যার প্রভাব সমগ্র পূর্ব বাংলায় পড়েছিল। সংস্কৃতি সংসদের প্রাক্তন সভাপতি জহির রায়হান লিখেছেন, "সকালে, দুপুরে, বিকালে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা, বিচিত্রানুষ্ঠান, কবি সম্মেলন, বসন্ত উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে এই বিদ্যামন্দিরে এক নতুন সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল এই সংসদ।"[৮৪]

সংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের দিকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে তা স্তিমিত হয়ে যায়। মূলত সংস্কৃতি সংসদ কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংগঠন ছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতির বিভেদের প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৬৫ সালে বিভক্ত হয়ে গেলে সংস্কৃতি সংসদও তখন বিভক্ত হয়ে যায়। শিল্প ও সাহিত্য পরিষদ[৮৫] নামে নতুন সংগঠনের জন্ম হয়। কিন্তু একথা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে প্রদেশভিত্তিক কোনো প্রতিষ্ঠান না হয়েও পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন, বাংলা ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে এ দেশের একাংশ মানুষ সচকিত হয়ে উঠলে সংস্কৃতি সংসদ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়।[৮৬] বলা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র ও শিক্ষকরা সংস্কৃতি সংসদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল। ১৯৫১-১৯৭০ এ দীর্ঘ সময়ে সংস্কৃতি সংসদের প্রয়াস ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রন্থিত। বিভিন্ন সময় প্রতিক্রিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ, সামরিক শাসনের খড়গ, ধর্মান্ধতার উচ্চারিত ধ্বনি এবং উগ্রতার মোহাচ্ছন্নতায় এ সংগঠন আরও জোরদার হয়েছে। এর প্রয়াস আরও ব্যাপক আরও বিশিষ্টতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।[৮৭]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করতে সংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সংস্কৃতি সংসদের এই সংগ্রাম শুধু সাংস্কৃতিক সংগ্রামই ছিল না, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিল। সংস্কৃতি সংসদের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাই পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সংস্কৃতি সংসদের সূচনালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সংস্কৃতি সংসদের ১৯৬৫ সালের কার্যকরী পরিষদেও বেশ কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। সহ-সভাপতি পদে ছিলেন জিনাত ইসলাম, নিলুফার আহমদ। সহ-সম্পাদক পদে ছিলেন নার্গিস আবেদ। প্রমোদ সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবেদা বেগম। সাহিত্য সম্পাদক পদে সহযোগী সদস্য ছিলেন হাসনা হেনা বকুল, নাট্য সম্পাদক পদের সহযোগী ছিলেন আখতার

জাহান বেগম।[৮৮] কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছাড়াও সংস্কৃতি সংসদের সূচনালগ্ন থেকে যে সকল নারী সংস্কৃতি সংসদে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা হলেন, সন্‌জীদা খাতুন, ফরিদা বারী মালিক, কামরুন্নাহার লাইলী, জহরত আরা খানম, ফাহমিদা খাতুন, মালেকা বেগম, ফেরদৌসী মজুমদার, সুলতানা রেবু, মালেকা আজিম খান, বুলু, রাজিয়া, তাজিম সুলতানা, ইরফাত লতা, শ্রাবণী, নার্গিস সুলতানা, মাসুদা চৌধুরী, মুনীরা খান, জাহানারা লাইজু, তালেহা খান, রওশন আরা রানু, নাদেরা চৌধুরী, জাহানারা নূর, মাসুমা, নায়লা জামান খান প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাট্য আন্দোলন

বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান ধারা নাটক। যা শুধু সংস্কৃতির মাধ্যমই নয় প্রতিবাদেরও মাধ্যম যেখানে রূপকের মাধ্যমে নির্যাতন, শোষণ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ জানানো হয়। পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম মাধ্যম ছিল নাট্য আন্দোলন, যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হল মূলত এই তিনটি ছাত্রাবাস বা হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করার পর থেকেই ঢাকার নাট্যচর্চার গুণগত পরিবর্তন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো সীমাবদ্ধভাবে নাটক মঞ্চায়নের সুযোগ পেলেও তারা মূলত শিল্পমনস্ক নাটক মঞ্চায়নের প্রতিই যত্নবান ছিলেন।[৮৯]

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক নাট্যচর্চা

১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘বঙ্গনারী’ মঞ্চস্থ করে। ঢাকা হল ১৯২২ সালে কে পি বিদ্যাবিনোদ রচিত ‘পদ্মিনী’ মঞ্চায়িত করে কার্জন হলে। ১৯২৩ সালে জগন্নাথ হল ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘চন্দ্রশেখর’ এবং মন্মথ রায়ের ‘দেবদাসী’ মঞ্চায়িত করে। ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে জগন্নাথ হল নাট্য সংসদ এন. সি. সেনগুপ্তের ‘ঠকের মেলা’ এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’ নাটক মঞ্চায়ন করে। ১৯২৫ সালে ঢাকা ও জগন্নাথ হলের যৌথ প্রযোজনায় কার্জন হলে মঞ্চস্থ হয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘ক্ষুধা’। জগন্নাথ হল ইউনিয়নের সংস্কৃতি বিভাগ ১৯২৯ সালে হল মিলনায়তনে ‘সীতা’ নাটকের অংশবিশেষ মঞ্চরূপ দেয়।[৯০] ১৯৩৩-৩৪ সালে মহুয়ার অপূর্ব নৃত্য সম্বলিত ‘মহুয়া’ নাটক করা হয়। এই নাটকে নৃত্য পরিচালনা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাধনা সেন। এরপর ১৯৩৪-৩৫ সালে বার্ষিক নাটকে নিশিকান্ত বসুর ‘পথের হলো শেষ’, প্রভাসী দেবীর ‘ব্রতচারিণী’ এবং যোগেন্দ্রনাথ রায়ের ‘রুম নং ৯’ নাটকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ফজলুল হক মুসলিম হল প্রতিষ্ঠার পর শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্ধু’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৩-৪৪ সালে।[৯১] ১৯৪৬ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র-সংসদ মুনীর চৌধুরীর ব্যাঙ্গাত্মক নাটক ‘রাজার জন্ম দিনে’ মঞ্চস্থ করে। ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ ১৯৪৭ সালে কার্জন হলে মঞ্চায়িত করে শরৎচন্দ্রের ‘বিন্দুর ছেলে’। একই বছর ঢাকা হল ছাত্র সংসদ মঞ্চরূপ দেয় তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘বিংশ শতাব্দী’। ১৯৪৮ সালে ফজলুল হক ছাত্র সংসদ কার্জন হলে মঞ্চস্থ করে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘বিশ বছর আগে’। একই বছর ঢাকা হল সংসদ কার্জন হলে মঞ্চস্থ করে জলধর চট্টপাধ্যায়ের ‘সিঁথির সিঁদুর’ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ মঞ্চস্থ করে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’। জগন্নাথ হল সংসদ কার্জন হলে ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে মঞ্চস্থ করে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘দ্বীপান্তর’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ১৯৪৯ সালে কার্জন হলে মঞ্চস্থ করে ‘The Tragical History of Dr. Faustus’ এবং ১৯৫০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষরক্ষা’।[৯২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ের নাট্যচর্চায় সামাজিক জীবনস্পর্শী নাটকের প্রাধান্যই লক্ষণীয়। সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমুখের নাটক ব্যাপকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মঞ্চস্থ হয়েছে। এছাড়া মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, নুরুল মোমেন প্রমুখের নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ব বাংলায় একটি নব্য শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠে এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ফলে একটি অসম্প্রাদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় একটি স্বতন্ত্র অভিরুচি বা চেতনার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট, যে চেতনাকে আমরা প্রাগ্রসর চেতনা হিসেবে অভিহিত করতে পারি। আর এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে, সমাজ সংকটমূলক ও জীবন যন্ত্রণাস্পর্শী নাটক। এই ধারা বা চেতনা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে এ দেশের প্রাগ্রসর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ অবদান রাখে।[৯৩]

বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অভিনয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী দুই দশকে সংখ্যাগত দিক দিয়ে ছাত্রীসংখ্যা কম ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল কেন্দ্রিক নাটকগুলোতে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চা সীমিত পরিসরে হলগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৫১ সালে সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাট্যচর্চা আরও বেগবান হয়। সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ সংগঠনের ভূমিকা পালন করে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী' মঞ্চায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতি সংসদ প্রথম নাটক মঞ্চায়ন শুরু করে। ঐ নাটকেই প্রথমবারের মতো নারী চরিত্রে ছাত্রদের বদলে ছাত্রীরা অভিনয় করে। এই সম্পর্কে ওবায়দুল হক সরকার লিখেছেন:

> বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাট্যানুষ্ঠান এদেশের নাট্য ধারায় বিপ্লবের সূচনা করে। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রথম মঞ্চে একত্রে অভিনয়ের দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। দুঃসাহস এ কারণে যে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে মুসলমান ছেলেদের পক্ষেই নাটক করা সহজসাধ্য ছিল না। মেয়েদের ত কথাই নেই। ... ১৯৪৭ এ দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু দেশের মেয়েরা স্বাধীনতা পেলো না। তাছাড়া তাদের ঘরে বন্দী করে রাখা হতো। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতো না। রেডিওতে মুসলমান মহিলা শিল্পী গান গাইতে সাহস পেতো না। প্রযোজক ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে মহিলা শিল্পীর বাড়িতে ধরনা দিতেন। 'আমার চাকরি বাঁচান প্রোগ্রামটা করে দিন' বলে কোনো মতো শিল্পীকে নিয়ে আসতেন। পর্দা ঘেরা ঘোড়ার গাড়ী রেডিও স্টেশনের (নাজিমউদ্দিন রোড) ভিতরে এসে থামতো। বড় পর্দা পুষিদার মধ্যেও শিল্পীকে কথা শুনতে হত। সেই পর্দা ভেদ করে প্রকাশ্যে মঞ্চে পর পুরুষের সাথে অভিনয়-এ যে কত বড় বিপ্লব আজ তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ নাটক নন্দিত, তখন নাটক ছিল নিন্দিত, আজ নাটক করলে সম্মান ও সম্মানী লাভ হয়, তখন জুটতো সম্মার্জনী।[৯৪]

এই নাটকে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয় হয় এবং প্রত্যাশা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাভিনয়ে ছাত্রীরাও সমভাবে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, হল সংসদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে তখনও সহ-অভিনয়ের অনুমতি দেয়নি। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি হল ছাত্র সংসদ ও কেন্দ্রীয় সংসদ সহ-অভিনয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বিষয়ে অভিভাবকদের মতামত চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়। অভিভাবকদের আপত্তি না থাকায় সহ-অভিনয়ের অনুমতি পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য মৌসুম শুরু হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাটক দিয়ে। ওবায়দুল হক সরকারকে ডেকে হলের প্রাধ্যক্ষ ওসমান গণি বললেন, 'সহ-অভিনয় হবে তবে এস এম হলের মেয়ে দিয়ে এস এম হলের নাটক হবে'। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা কম থাকায়, ছাত্রীদের জন্য পৃথক কোনো হল ছিল না, ছাত্রদের হলেই তারা আবাসিক ও অনাবাসিক হয়ে ভর্তি হতেন। যারা আবাসিক তারা চামেলী হাউজে থাকতেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করতেন মমতাজ, লিলি খান, মনিমুন্নেসা, সাবেরা, স্বপ্না। কিন্তু তারা সবাই ছিলেন ফজলুল হক মুসলিম হলের। তখন

অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে এস এম হলের ছিলেন জহরত আরা, কিন্তু তিনি তখন তিন মাসের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ওবায়দুল হক সরকার চামেলী হাউজে গিয়ে নাটকের চারটি নারী চরিত্রের জন্য ছাত্রীদের রাজী করান।[৯৫] মাত্র বার দিন রিহার্সাল করে সলিমুল্লাহ হলে মঞ্চস্থ হল ছবি ব্যানার্জীর 'কেরানীর জীবন' নাটকটি। এই নাটকেই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সহঅভিনয় হলো। ফরিদা বারী মালিক, কামরুন্নাহার লাইলী, মাসুদা চৌধুরী এবং লায়লা নূর এই নাটকে অভিনয় করেন। প্রাধ্যক্ষ ওসমান গণি নাটক দেখে বলেছিলেন, "এই এস এম হলের আমি ছাত্র ছিলাম, হাউস টিউটর ছিলাম, আজ সাত বছর প্রভোস্ট এত সুন্দর নাটক দেখি নি, দেখব কিনা সন্দেহ।"[৯৬] জাতীয় দৈনিক পত্রিকাতেও নাটকের প্রশংসা করা হয়। ১৯৫৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর *দৈনিক মিল্লাত* পত্রিকায় বলা হয়:

> ... বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাভিনয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের মিলিত অভিনয় ইহাই সর্বপ্রথম। এই দিক দিয়া একটি পুরাতন সংস্কারকে ছিন্ন করিবার ব্যাপারে উদ্যোগী হইবার জন্য সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ এবং হল প্রভোস্ট আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।... অভিনয়ের মান অনুসারে প্রথমেই নামোল্লেখ করিতে হয় উদীয়মান অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকারের।... ইহার পরই নাম করিতে হয় মূল চরিত্র বিধু মুখার্জীর ভূমিকায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ অভিনেতা মুজিবর রহমান খানের।.. আমাদের বিচারে তৃতীয় স্থান অধিকারিণী হইতেছেন বিধবা যুবতী মেয়ে মাধুরীর ভূমিকায় ফরিদা বারী মালিক।... অভিনয়ে অপর যাহারা প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া নাটকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাহারা হইতেছেন, সৌদামিনীর ভূমিকায় কামরুন্নেহার লাইলী, মিনুর ভূমিকায় মাসুদা চৌধুরী, বুলুর ভূমিকায় লায়লা নূর ও মি. গুহুর ভূমিকায় ইকবাল আনসারী খান, কেরানী দ্বিজেনের ভূমিকায় মাহবুব আনাম, কেরানী ভানুর ভূমিকায় জিল্লুর রহমান, কেষ্ট মুদির ভূমিকায় আবদুর রহমান এবং মিন্টুর ভূমিকায় মাস্টার মনু।[৯৭]

এরপর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অভিনয় চালু হয়ে যায়। তাই বলা যায় পূর্ব বংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই ঘটনা সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্ধ অতীতমুখীনতা ও কুসংস্কারকে পরাজিত করে প্রগতিশীল ঐতিহ্য সৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদের নাট্যচর্চা

ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিভিন্ন হল ও ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এর সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে ডাকসু ছিল ছাত্র অধিকার এবং সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর উন্মুক্ত প্লাটফর্ম যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও সম্পৃক্ত ছিলেন। ডাকসুর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বেগম জাহানারা আকতার (১৯৬০-৬১), মাহফুজা খানম (১৯৬৭-৬৮), এবং ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মতিয়া চৌধুরী (১৯৬৩-৬৪)। ডাকসুর পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনায় হল সংসদগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই হল সংসদের হাত ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চা প্রাথমিকভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ ১৯৫৩ সালে কার্জন হলে মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিরকুমার সভা'। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ হল মিলনায়তনে সেপ্টেম্বর মাসে মঞ্চরূপ দেয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু' নাটক। ১৯৫৩ সালে মনোজ বসুর 'প্লাবন' অভিনীত হয়। এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন লিলি চৌধুরী।[৯৮] ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বনফুলের 'কবয়ঃ' নাট্যরূপ দেয়। ইকবাল হল ছাত্র সংসদ হল মঞ্চে

আসকার ইবনে শাইখের সামাজিক নাটক 'মঞ্চেগ্রাম' মঞ্চায়িত করে। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ মুনীর চৌধুরী অনূদিত 'কেউ কিছু বলতে পারে না', বনফুলের 'কবয়ঃ', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' ও প্রথমনাথ বিশীর 'পরিহাস বিজল্পিতম' পরপর মঞ্চস্থ করে। পরিহাস বিজল্পিতম নাটকে অভিনয় করেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী মুনিরা খান। তার স্মৃতিচারণ :

> ছেলেদের সাথে প্রথম নাটক করেছিলাম 'পরিহাস বিজল্পিতম'। প্রক্টরের কামরায় বসে রিহার্সাল হতো। আমি নায়িকার ভূমিকায়। ইকবাল আনসারি খান হেনরি নায়ক। জহরত আরা (খুশী আপা) তখনকার সিনেমা 'মুখ ও মুখোশ' এর নায়িকা, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী, একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ঐ নাটকের একটি সিন এখনও আমার মনে পড়ে। কথা হচ্ছিল রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হবে না বাংলা হবে। বন্ধু নায়ককে জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা পুঁইশাকের হিন্দি কি? আমরা যখন পুঁইশাক খাবো তখন কি বলবো? নায়কের জবাব, 'অসুবিধা হবে না–পুঁইশাক খাবেন না, ব্যস।[৯৯]

১৯৫৫ সালের ৮ ও ৯ অক্টোবর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ মঞ্চস্থ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ'। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ১২ ফেব্রুয়ারি কার্জন হলে মঞ্চস্থ করে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কার্জন হলে ২৪, ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে বনফুলের 'কবয়ঃ', মুনীর চৌধুরীর অনুবাদ নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না' এবং প্রমথনাথ বিশীর 'পরিহাস বিজল্পিতম' মঞ্চস্থ করে।[১০০] 'কবয়ঃ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী জহরত আরা। তার অভিনয় ছিল প্রশংসনীয়। এই সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় বলা হয়, "... ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হলো ধারাবাহিক নাট্যানুষ্ঠান। প্রথম দিন পরিবেশিত হলো বনফুলের কবয়ঃ। দৃশ্য সজ্জার জন্য ও অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি সবারই মন জয় করেছে। এতে সবচেয়ে যারা ভাল অভিনয় করেছেন তারা হলেন জহরত আরা, রফিকুল ইসলাম, মমিনুল হক ও আবিদ হোসেন।"[১০১] 'কেউ কিছু বলতে পারে না' নাটকেও অভিনয় করেছিলেন জহরত আরা। 'পরিহাস বিজল্পিতম' নাটকে অভিনয় করেছিলেন সৈয়দা রওশন আরা, কামরুন্নাহার লাইলী ও জহরত আরা। *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় তাদের অভিনয় সম্পর্কে বলা হয়, "মিনির ভূমিকায় সৈয়দা রওশন আরা প্রথম দিকে আড়ষ্ট অভিনয় করলেও শেষের দিকে অপূর্ব প্রাণবন্ত অভিনয় হয়েছে তার। কামরুন্নাহার লাইলী ও জহরত আরা দুজনেই আগের সুনাম বাড়িয়েছেন।"[১০২] আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' নাটকে অভিনয় করেছিলেন সাবেরা খাতুন এবং জুলেখা হাবীব। মরিয়ম চরিত্রে সাবেরা খাতুনের কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, চালচলন সব কিছুই চরিত্রোপযোগী হওয়ায় তার অভিনয়ের জন্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চে নতুন জুলেখা হাবীব অনূঢ়া কন্যার ভূমিকায় আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা, বাচনভঙ্গির রূঢ়তা ও আবার সময়োপযোগী কোমলতা স্কুল মাস্টারের খিটখিটে অনূঢ়া মেয়ের যোগ্যা রূপায়ণে সহায়তা করেছে।[১০৩]

১৯৫৭ সালে উইমেন্স হলে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকুমার সভা। অভিনয়ে ছিলেন ফরিদা বানু, হামিদা বানু, আয়েশা আখতার প্রমুখ। তারপর মঞ্চস্থ হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দত্তা। নাটকে বিজয়ার ভূমিকায় ছিলেন বাংলা বিভাগের ছাত্রী মেরী। নরেনের ভূমিকায় ছিলেন আয়শা আখতার এবং বিলাসবিহারী সেজেছিলেন রোজী মজিদ।[১০৪] একই বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়। তবে পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মেয়েরাই। শুধু রাজার চরিত্রে নেপথ্যে থেকে পুরুষ কণ্ঠশিল্পী অংশ নেয় ও কণ্ঠদান করে।[১০৫] 'রক্তকরবী'র প্রধান চরিত্র 'নন্দিনী'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী রওশন আরা। নাটকের সংলাপে অভিনয়ের ধরনে নন্দিনীর ভেতর ছাত্রী রওশনের আত্মবিলুপ্তি ঘটেছিলো নিখুঁতভাবে। এছাড়া এই নাটকে আরও অভিনয় করেন ফরিদা বানু, দর্শন বিভাগের ছাত্রী রাশিদা আহম্মদ, অর্থনীতি বিভাগের আখতারী খানম, গণিত বিভাগের ছাত্রী সেলিনা বাহার, বাংলা বিভাগের শিক্ষক হামিদা রহমান।[১০৬] নাটকটির পরিচালনায়

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক নীলিমা ইব্রাহিম। আত্মজীবনী *বিন্দু-বিসর্গ* তে লিখেছেন তিনি:

> উইমেনস হলের রক্তকরবীতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের ভেতর নন্দিনী রওশন কাদের, ফাগুলাল অধ্যাপিকা হামিদা খানম, মদের বোতল হাতে তার সহজ অভিনয় আজও আমার চোখে ভাসে। বিশু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শামসুল হক সায়েবের পত্নী বুলবুল। ঠিক হলো তারা যখন জালের আড়ালে থাকবেন তখন পুরুষ একজন অভিনয় করতে পারে। মেয়েদের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও স্পর্শ দোষ ঘটবার সম্ভাবনা কম। তখন এতসব শব্দ গ্রহণ যন্ত্রের ব্যবহার অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছিল না। ড্রামা সার্কেলের সর্বজন পরিচিত অভিনেতা বজলুল করিম রাজার অভিনয় করবেন ঠিক হলো। পরিচালনায় সালেহীন, প্রযোজক ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা আর সহকারী আমি। যথা সময়ে মহাসমারোহে নাটক আরম্ভ হলো। কিন্তু দুটি দৃশ্য অভিনয়ের পর রাজা যখন নন্দিনীর সংলাপের জবাব দিচ্ছেন না তখন জানা গেল হঠাৎ করে বজলুর গলা বসে গেছে। ব্যাগের সব লবঙ্গ দিয়েও ওর কথা ফুটল না। চোখে সবাই সর্ষে ফুল দেখছি এমন সময় রাজার কথা ফুটল। অন্ধকারে উইংস-এর পাশ দিয়ে হামাগুড়ি মেরে সালেহীন রাজার সংলাপ শুরু করেছে। জানি না পরবর্তীসময় আমাদের গেরিলা বাহিনী এমন ক্রলিং করতে পেরেছিল কিনা! উঃ সেকি আমাদের সাফল্যের উত্তেজনা।[১০৭]

উইমেন্স হলের প্রাধ্যক্ষ আখতার ইমাম নাটকের অভিনয় শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয় এবং এর সাথে যুক্ত শিক্ষকবৃন্দের প্রশংসা করেছিলেন।

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভানু চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক নাটক 'আজকাল' মঞ্চস্থ করে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়ন মঞ্চস্থ করে আসকার ইবনে শাইখের 'শেষ অধ্যায়'। ইকবাল হল ছাত্র ইউনিয়ন ডিসেম্বর মাসে মঞ্চরূপ দেয় আসকার ইবনে শাইখের সামাজিক নাটক 'অনুবর্তন'। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল ইউনিয়ন মঞ্চরূপ দেয় সামাজিক কৌতুক নাটক 'তাইতো'। শুধুমাত্র ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত এ নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ শেষ বর্ষের ছাত্রী খোরশেদী বেগম। নায়কের ভূমিকায়ও অভিনয় করেছিলেন তিনি।[১০৮] একই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মুনীর চৌধুরী অনূদিত নাটক 'রূপোর কৌটা' মঞ্চস্থ করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ একই বছর 'রূপান্তর' নাটক মঞ্চায়িত করে। ১৯৬০ সালে ফজলুল হক হল ইউনিয়ন মঞ্চায়িত করে সামাজিক নাটক 'সয়লাব'। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কর্তৃক অভিনীত হয় সামাজিক নাটক 'মায়াবী প্রহর'। ১৯৬৫ সালে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ 'রূপার কৌটা', ঢাকা হল ছাত্র সংসদ 'মানচিত্র', ফজলুল হক হল ইউনিয়ন 'বিন্দু বিন্দু রং', ইকবাল হল ছাত্র সংসদ 'কথা কও' মঞ্চস্থ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল ইউনিয়ন মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মফল গল্পের নাট্যরূপ 'শোধবোধ'।[১০৯] ১৯৬৬ সালে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ সামাজিক নাটক 'দায়ী কে' মঞ্চরূপ দেয়, ১৯৬৮ সালে মঞ্চস্থ করে 'অবিচার'। ১৯৬৯ সালে ইকবাল হল মঞ্চস্থ করে রহস্য নাটক 'পাথর বাড়ী'। একই বছর রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ মঞ্চস্থ করে কাজী নজরুল ইসলামের 'সেতুবন্ধ'।[১১০]

এই পর্যায়ের প্রায় সব নাটকেই ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন জহরত আরা, মাসুদা চৌধুরী, মুনীরা খান, সন্‌জীদা খাতুন, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, সীমা মুখার্জী, জাহানারা লাইজু, তালেহা খান, রওশন আরা রানু, নাদেরা চৌধুরী, রাশেদা চৌধুরী, জাহানারা নূর, মাসুমা, কামরুন নাহার লাইলী প্রমুখ।

ড্রামা সার্কল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'ডাকসু'র তৎকালীন প্রমোদ সম্পাদক মীর মকসুদুস সালেহীনের উদ্যোগে ১৯৫৬ সালের ৬ অক্টোবর নাটককে জীবনমুখী করে তোলার প্রয়াস নিয়ে গঠিত হয় ড্রামা সার্কল।[১১১] এই গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ ছিল পেশাদার মঞ্চরীতির বাইরে নতুন ধারার নাটক মঞ্চায়ন করা। এজন্য গোষ্ঠীর কর্মীরা নাটকের দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও অভিনয়ে নতুনত্ব আনয়ন করেন। ড্রামা সার্কলের প্রথম সভাপতি ছিলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান, পরে হাসান হাফিজুর রহমান ও মুনীর চৌধুরী। পরবর্তীকালে সভাপতির পদটি উঠে গেলে একজন পরিচালকের অধীনে সংগঠনটি চলতে থাকে। এর প্রথম পরিচালক ছিলেন মকসুদুস সালেহীন। তিনি বিদেশে চলে গেলে পরিচালকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন বজলুল করিম। ড্রামা সার্কলের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা ছিলেন মাসুদ আলী খান, আবদুল্লাহ আল মামুন, দীন মুহাম্মদ খান, ফকরুজ্জামান চৌধুরী, জিয়া হায়দার, তওফিক আজিজ খান, সৈয়দা রওশন, ফজলুল করিম, মনতাসিন বিল্লাহ, আফজাল করিম, মাসিহুল করিম, মোহাম্মদ হোসেন খান, আতাউর রহমান, সৈয়দ আহসান আলী প্রমুখ।[১১২] ড্রামা সার্কলের সূচনালগ্ন থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সৈয়দা রওশন। এই বিষয়ে তার স্মৃতিচারণ, "আমি ড্রামা সার্কলের রানু। জীবন প্রবাহে যত দূরেই ছড়িয়ে যাই না কেন আমি ও আমরা চিরদিন ড্রামা সার্কলের। ড্রামা সার্কল আমাদের স্মৃতির সম্পদ।"[১১৩] এছাড়া শুরু থেকেই ড্রামা সার্কলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সাবেরা খাতুন, মুনীরা খান।[১১৪]

ড্রামা সার্কল প্রযোজিত প্রথম নাটক 'কবয়ঃ' (পোয়েটেস্টার অব ইস্পাহান নাটকের বনফুলকৃত বাংলা অনুবাদ) ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকার কার্জন হলে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন জহরত আরা, মাহমুদ হাসান, তওফিক আজিজ খান, আবিদ হোসেন, মোরশেদ চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৫৭ সালে করাচীতে মঞ্চস্থ করে মুনীর চৌধুরীর রূপান্তরিত নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না'। এ বছরই গোষ্ঠীটি কলকাতায় আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' মঞ্চস্থ করে, পরে এটি পাকিস্তানেও অভিনীত হয়। এই সফরকারী দলের সাথে নারী শিক্ষার্থী ছিলেন মুনিরা খান, রাজিয়া খান, সালমা খান, রওশন আরা প্রমুখ।[১১৫] ১৯৫৮ সালের ৪ ও ৫ এপ্রিল ড্রামা সার্কল মঞ্চরূপ দেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'।[১১৬] 'রক্তকরবী'তে নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সৈয়দা রওশন (রানু)। এই নাটকে অভিনয়ের জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে ঢাকা টেলিভিশনের ধারাবাহিক সিরিজ অনুষ্ঠান 'সজনে বিজনে'র একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন তিনি। তখন তিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ। উপস্থাপক অনুষ্ঠানে সৈয়দা রওশনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন 'রক্তকরবীর নন্দিনী' হিসেবে।[১১৭] 'নন্দিনী' চরিত্রে তিনি কতটা অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এই ঘটনা থেকে বিষয়টা সহজেই অনুমেয়।

১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে ড্রামা সার্কল মঞ্চস্থ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সামাজিক নাটক 'বহিপীর'। একই বছর রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ড্রামা সার্কল মঞ্চায়িত করে 'রাজা ও রাণী', 'তাসের দেশ' এবং 'রক্তকরবী'।[১১৮] তাসের দেশ নাটকে 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে' গানটি গেয়েছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। এ বিষয়ে তিনি আত্মকথায় লিখেছেন:

> শতবার্ষিকী উপলক্ষে ড্রামা সার্কেলের তাসের দেশ নাটকেও এক কাণ্ড হয়েছিল। ভিতরে গিয়ে শুনি সবই ঠিক আছে, তবে 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে' গানখানি গাইবার কেউ নেই। আমাকেই 'মুশকিল আসান'হতে হলো। কিন্তু সরকারি চাকরি করি, আমি গাইলে কী জানি কী ঝামেলায় পড়তে হয় পরে! তখন আর সময় নেই। চট করে ঝোলা থেকে একটা রুমাল বার করে মুখে পুরে নিয়ে গেয়ে ফেললাম। কণ্ঠস্বর বিকৃত হলো তাতে। নাটকের পর আহাদ ভাই আমাকে দেখে

জিজ্ঞেস করলেন-'ওই গানখানি কে গাইলো বল তো? বেশ তো গাইলো! আমি কথা না বাড়িয়ে চট করে সেখান থেকে কেটে পড়লাম।[১১৯]

রূপকের আড়ালে নাটকগুলোর বিপ্লবাত্মক বক্তব্য মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছিল। ড্রামা সার্কল মৌলিক নাটকের পাশাপাশি গ্রিক ও ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর ধ্রুপদী কাব্য নাটক, নৃত্য ও সংগীত সমৃদ্ধ নাটক, রূপকধর্মী নাটকও প্রদর্শন করে। তবে এই সংগঠনের কার্যক্রম খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ১৯৬৪ সালে বজলুল করিম যুক্তরাজ্যে চলে গেলে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী

ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরও গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে টিএসসি পরিচালক এ জেড খানের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংগীত ও নাট্যগোষ্ঠী গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর সাথে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী উভয়েই সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬৩ সালেই ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র তত্ত্বাবধায়ক রামেন্দু মজুমদার, শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন।[১২০] একই বছর ছাত্র-শিক্ষক সংগীত গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধায়ক আগা কোহিনুর আলম 'বৃষ্টি এলো' গীতিনক্শাটি পরিচালনা করেন। এটাই এ গোষ্ঠীর প্রথম সংগীতানুষ্ঠান। এর পর কাজী নাসিরের পরিচালনায় 'মলুয়া' গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। এ গীতনাট্য রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত হয়। তার কিছুদিন পর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর 'দণ্ড' ও 'দণ্ডধর' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, মিসেস লিলি চৌধুরী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একত্রে অভিনয় করেন।[১২১] 'দণ্ড' ও 'দণ্ডধর' নাটকে অভিনয় করেছিলেন ফেরদৌসী মজুমদার।[১২২] আত্মজীবনীতে লিখেছেন তিনি :

> ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম থেকেই আমার নাট্যপ্রীতির জন্ম। ক্রমশ আমি যে কখন অভিনয়ে আসক্ত হয়ে পড়লাম, টেরও পাইনি। আমি যখন অনার্সে পড়ি, তখন আমি দুটো নাটকে অভিনয় করলাম– নাম দণ্ড ও দণ্ডধর। দুটোই একাঙ্কিকা। লেখা মুনীর ভাইয়ের।...দণ্ডতে প্রধান চরিত্র মোট তিনটি-স্বামী, স্ত্রী ও চোর। আমি ছিলাম বাংলা বিভাগের ছাত্রী। এ নাটকে আমি হলাম স্ত্রী। স্বামী রফিকুল ইসলাম (বাংলার অধ্যাপক) আর চোর হয়েছিলেন মুনীর ভাই নিজে।... এ নাটকে আমার একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার স্বামীর ভূমিকায় আমরাই শিক্ষক রফিক স্যার। আমার যে কত সংকোচ আর ভীতি ছিল, বলার নয়। সংকোচ ছিল–স্বামীটি আমার সাক্ষাৎ স্যার আর ভীতি ছিল-এ প্রদর্শনীর পর আমি ইউনিভার্সিটিতে হাঁটাচলা করব কী করে? ক্লাস করব কী করে? আর স্যারের মুখোমুখিই-বা হব কী করে? স্যার বলে কথা! সে সময় এ ধরনের সংকোচটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সব যেমন-তেমন, সহপাঠীরা বিষয়টা কীভাবে নেবে, আমাকে কতখানি উত্যক্ত করবে-এ চিন্তাতেই আমি অস্থির ছিলাম। কিন্তু দেখলাম, আমি যতটা ভয় করেছিলাম, পরিস্থিতি ততটা ভয়াবহ হয়নি। সেটা বোধ হয় আমার প্রতিক্রিয়ার কারণেও কিছুটা কম হয়েছিল। ওরা টিটকারি, হাসি-ঠাট্টা করছিল আমি রফিক স্যারের স্ত্রী হয়ে তাঁর পাশে শুয়েছিলাম বলে। কিন্তু আমি বিশেষ রিঅ্যাক্ট করিনি। তাতে ওরা একটু হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। আর তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর শোয়াটা বেশ শৈল্পিকভাবে করা হয়েছিল। দুটো চৌকি কোনাকুনি করে পাতা হয়েছিল। আমাদের মাথা-দুটো এক জায়গায় ছিল কিন্তু শরীর দুটো ছিল একেবারেই আলাদা। বিছানাটা সাজানো হয়েছিল অনেকটা ইংরেজি বর্ণ A এর মতো করে। তাতেই দর্শকের কাছে দৃশ্যটা খুব মনঃপুত হয়েছিল বোধ হয়। দণ্ডধর নাটকের একটা কথা মনে পড়ে। আমার দিকে তাকালেই একটি ছেলে সংলাপ ভুলে যেত আর বিমুগ্ধ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। সেই সময় আবদুল্লাহ আল মামুন আর রামেন্দু মজুমদারের এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ছিল, ছেলেটি আপনার প্রেমে জর্জরিত, যেটা আমি

ঠিক বিশ্বাস করতাম না।... দণ্ডধর মঞ্চস্থ হয়েছিল তখনকার পাবলিক লাইব্রেরিতে, এখন যেটা নাটমণ্ডল।[১২৩]

১৯৬৪ সালে ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ইকবাল বাহার চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, লিলি চৌধুরী, রেজা চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন, বদরুদ্দিন আহমদ, রামেন্দু মজুমদার, আমিনুদ্দিন, রাজিউল হাসান, বদিউজ্জামান, এনামুল হক, মাহবুবা আখতার, রোজি মজিদ ও অধ্যাপক রাজিয়া খান। এই নাটকে ফেরদৌসী মজুমদারেরও অভিনয় করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে অভিনয় করতে পারেননি। এই বিষয়ে তিনি বলেন:

> ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী আরেকটা চমৎকার নাটক মঞ্চায়ন করেছিল–মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী। এ নাটকে মুনীর চৌধুরী, ইকবাল বাহার চৌধুরী, রামেন্দু মজুমদারসহ অনেকে অভিনয় করেছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি অভিনয় করতে পারিনি। এ নাটকে মদনিকা নামে একটি মজার চরিত্র করার কথা ছিল আমার। পরবর্তী সময়ে আমার অপারগতায় অধ্যাপিকা রাজিয়া খান আমিন অভিনয় করেছিলেন এবং চমৎকার অভিনয় করে দর্শকনন্দিত হয়েছিলেন।[১২৪]

এই নাটক সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, ".... কৃষ্ণকুমারী সাম্প্রতিককালে ঢাকায় মঞ্চস্থ সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত নাটক, একথা বললে অত্যুক্তি হইবে না। মদনিকা চরিত্রে অধ্যাপিকা রাজিয়া খান, ধনদাস চরিত্রে রামেন্দু মজুমদার, কৃষ্ণকুমারী চরিত্রে মাহবুবা আখতার এবং বলেন্দ্র সিংহ চরিত্রে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী অপূর্ব অভিনয় করেন।"[১২৫]

১৯৬৭ সালে ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক 'প্রচ্ছদপট' এবং 'ঝিঙেফুল' নাটক মঞ্চস্থ হয়। কাজী নজরুল ইসলামের 'ঝিঙেফুল' নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সৈয়দা ফিরোজা বেগম, সাঈদা গাফফার, ওয়াসিম, জহির, আতিকুল ইসলাম।[১২৬] ১৯৬৮ সালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অর্ধ সপ্তাহব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', নজরুল ইসলামের 'ঝিলিমিলি', শাহাদাত হোসেনের 'মসনদের মোহ', ইব্রাহিম খাঁর 'কাফেলা', মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর', শওকত ওসমানের 'তস্কর ও লস্কর', নুরুল মোমেনের 'নয়া খান্দান' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকসমূহ পরিবেশন করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমানকালের আটটি নাটকের মঞ্চায়নের মাধ্যমে নাট্যসাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকটি নিয়ে ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য দু'মাসের একটি ড্রামা ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়। এ বছরেই মো. ওবায়দুল হকের 'রুগ্ন পৃথিবী' মঞ্চস্থ করা হয়। ১৯৬৯ সালে ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় 'লালন ফকির'। ১৯৭০ সালে নীলিমা ইব্রাহিমের লেখা 'দুয়ে দুয়ে চার' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। ১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মাহবুবুর রহমানের 'যে পথের শেষ নেই' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এটাই ছিল কেন্দ্রের শেষ নাট্যানুষ্ঠান।[১২৭]

ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন নাটকে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আসকার ইবনে শাইখ, আবদুল্লাহ আল মামুন, ইকবাল বাহার চৌধুরী, মাহবুব জামিল, আগা কোহিনুর আলম, মিজানুর রহমান, খালেদ ইউসুফ, আল-মামুন, মুসফিকুর রহমান, কাজী নাসির, সাইফুল ইসলাম খান, আবদুস শাকুর, এনামুল হক, রামেন্দু মজুমদার, দিলীপ দত্ত, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, রেজা চৌধুরী, রাইসুল ইসলাম আসাদ, আহমেদ-উজ-জামান চৌধুরী, হুমায়ুন আহমদ প্রমুখ। যে সকল নারী এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা হলেন রাশিদা চৌধুরী, ফরিদা বারী মালিক, সৈয়দা রওশন

কাদির, সুফিয়া বেগম, ফেরদৌস আরা বেগম, রাজিয়া খান, লিলি চৌধুরী, মহুয়া চৌধুরী, ফেরদৌসী মজুমদার প্রমুখ।[১২৮]

ডাকসু নাট্যদল

পঞ্চাশের দশকে গঠিত হয় ডাকসু নাট্যদল। ডাকসু নাট্যদল ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুনীল সেনগুপ্তের আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল। ডাকসু নাট্যদলের বিশ জনের এই দলে নারী প্রতিনিধি ছিলেন রাজিয়া খান, সালমা চৌধুরী, সৈয়দা রওশন, মুনীরা খান, ফেরদৌসী বেগম প্রমুখ। ডাকসু নাট্যদল দু'দিন সন্ধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী মঞ্চে মুনীর চৌধুরীর 'কেউ কিছু বলতে পারে না' এবং 'কেরানীর জীবন' নাটক পরিবেশন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সহ-অভিনয় দেখে বিস্মিত হয়েছিল। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসে তখন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সহ-অভিনয় চালু হয়নি।[১২৯]

সংস্কৃতি সংসদ, ড্রামা সার্কল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংসদ, চারুকলা সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ইকবাল হক ছাত্র সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী ১৯৪৮-১৯৭১ কালপর্বে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য আন্দোলনকে বেগবান করেছিল।[১৩০] প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শমণ্ডিত প্রতিবাদী নাট্যচর্চার ধারা গড়ে ওঠে, তা সমগ্র দেশের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীকে যথেষ্ট প্রণোদিত করে। ক্রমশ নাটক হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শক্তিশালী মাধ্যম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, নূরুল মোমেন এবং আসকর ইবনে শাইখ প্রমুখ মেধাবী নাট্য ব্যক্তিত্ব। নাট্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে জেলখানায় বসে রচনা করেছিলেন 'কবর' নাটকটি। একুশের শহিদদের নিয়ে রচিত মুনীর চৌধুরীর অমর সৃষ্টি 'কবর' নাটক দিয়েই বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারা 'বাংলাদেশের সাহিত্যে'র যাত্রা শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। ১৯৫৩ সালে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দিদের নিয়েই তিনি হারিকেনের আলোতে কবর নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এর বাইরে তার 'দণ্ড' ও 'দণ্ডধর', 'কৃষ্ণকুমারী', 'ভ্রান্তিবিলাস, 'রক্তাক্ত প্রান্তর' মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। আসকার ইবনে শাইখ ছিলেন আধুনিক ধারার নাট্যকার। তার উদ্যোগে 'প্রচ্ছদপট' 'মাইলপোস্ট', 'বিরোধ', 'রক্তপদ্ম', 'অনুবর্তন' ইত্যাদি নাটকের সার্থক পরিবেশনা সম্ভব হয়েছিল। তার 'বিদ্রোহী পদ্মা প্রমত্তা' পদ্মা নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষের সমাজ ও জীবন সংগ্রামের চিত্র অংকনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ছিল। এতে দেখা যায় যে, এসব সংগ্রামী মানুষ সাম্প্রদায়িক শ্রেণি তথা জমিদার জোতদারদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের কষ্টার্জিত ফসল ঘরে তোলে। অর্থাৎ মানুষকে সামন্তবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার মন্ত্রণা দেন নাট্যকাররা।[১৩১] নূরুল মোমেন সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্বসমূহ ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে তার নাটকে তুলে ধরেন। সামাজিক পটভূমিকায় দ্বন্দ্বসংঘাতময় তার নাট্য চরিত্রগুলো সুন্দরভাবে রূপ লাভ করে। 'রূপান্তর', 'নেমেসিস', 'যদি এমন হতো', 'আলোছায়া', 'শতকরা আশি', 'যেমন ইচ্ছা তেমন' ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য নাটক। তাদের প্রচেষ্টায় নাট্যচর্চার ধারা ক্রমাগত যেমন পাল্টাতে থাকে, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনে নাট্যআন্দোলন গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত হয়। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম। তিনি বিভিন্ন নাটক পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছিলেন পাশাপাশি তার

লিখিত নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। তার পরিচালনায় ১৯৬৯ সালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে মুনীর চৌধুরী রচিত 'চিঠি' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৭০ সালে তার লেখা 'দুয়ে দুয়ে চার' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। তাছাড়া ১৯৬২-৬৩ সালে 'রঙ্গম' নাট্যসংস্থার সভানেত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।[১৩২]

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, নুরুস সোবহান, কাফী খান, মুজিবর রহমান খান, আবুল খায়ের, গোলাম মোস্তফা, বজলুল করীম, আবিদ হোসেন, সাখাওয়াত হোসেন, মমিনুল হক চৌধুরী, শহীদ খান, তৌফিক আজিজ খান, মাসুদ আলি খান, ইকবাল আনসারী খান প্রমুখ। অভিনেত্রীদের মধ্যে রোকেয়া কবীর, লিলি চৌধুরী, হোসনে আরা (বিজু), লায়লা সামাদ, সাবেরা খাতুন, মনিমুন্নেসা, জহরত আরা, মাসুদা চৌধুরী, রাজিয়া খান, সৈয়দা রওশন, মুনীরা খান, সালমা চৌধুরী প্রমুখ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ষাটের দশকে এদের সঙ্গে যুক্ত হন আবদুল্লাহ আল মামুন, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার প্রমুখ, যাদের অনেকেই পরবর্তীকালে নাট্যজগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।[১৩৩]

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে সংস্কৃতির পাকিস্তানিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে পশ্চিম পাকিস্তানি আদর্শ ও ভাবধারায় গড়ে তোলার প্রয়াস করা হয়। আইয়ুব খান কর্তৃক পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর রাজনৈতিক দমন পীড়নের পাশপাশি শুরু হয় সাংস্কৃতিক অবদমন। আইয়ুব খান আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মত দেন। তিনি বলেন পাকিস্তানিদের ইতিহাস, চিন্তাধারা, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অভিন্ন সুতরাং সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে না। পাকিস্তানি সামরিক সরকারের বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ছিল বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ যার সূত্রপাত ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎসব শুরু হয়। বিশ্বজুড়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের আয়োজন চলতে থাকে আর পাকিস্তানে চলে এর বিপরীত প্রয়াস। খাজা শাহাবুদ্দিনের জামাতা পূর্ব পাকিস্তানের তথ্য সচিব ও জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার প্রধান মুসা আহমেদ তার ব্যক্তিগত ও সরকারি প্রভাব প্রদর্শন করে ঢাকার শিল্পী ও সাহিত্যিক মহলে ভীতি সৃষ্টি ও হুমকি দেবার মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।[১৩৪] সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চাররের জন্য সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ, কে জি মোস্তফা, আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ সংস্কৃতিসেবীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে সরকারিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের যখন কোনো সম্ভাবনা ছিল না তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল হাই তার নিজের অফিসকক্ষে একটি প্রাথমিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার আয়োজন করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দেব, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, খান সারওয়ার মুরশিদ, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, মুশতাক হোসেন, হাসান হাফিজুর রহমান।[১৩৫] এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আর একটি সভা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ গোবিন্দচন্দ্র দেবের বাসায়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাকে চিঠি দেয়া হয়েছিল। সন্‌জীদা খাতুন আত্মকথায় লিখেছেন:

> একষট্টি সাল এল। আমি আর ওয়াহিদুল ছেলেমেয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম সেগুনবাগানে। এক সাইকেল আরোহী আমাদের রিক্সা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন–এখানে সন্‌জীদা খাতুন কোনো বাড়িতে থাকেন, বলতে পারেন? পরিচয় দিতে একটা চিঠি দিলেন আমার হাতে। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছেন, সেদিন বিকেল চারটেতে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট গোবিন্দ দেব-এর বাড়ির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ বিষয়ে সভা হবে-আমি যেন অবশ্য যাই।[১৩৬]

পরবর্তী প্রস্তুতি সভা বসে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের অফিস কক্ষে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম। বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদকে সভাপতি এবং খান সারওয়ার মুরশিদকে সম্পাদক এবং সভায় উপস্থিত সকলকে সদস্য করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম।[১৩৭]

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকায় তিনটি কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে গঠিত কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এবং ঢাকা প্রেসক্লাবের অপেক্ষাকৃত তরুণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত কমিটি। এই সকল কমিটিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ নিষ্ঠার সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই তিনটি কমিটি আলোচনার মাধ্যমে একত্র হয়ে ২৪-২৭ বৈশাখ চারদিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে গঠিত কমিটি **১১** ও **১২** বৈশাখ দুটি সভার আয়োজন করে।[১৩৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে **১৩৬৮** সালের **১০** বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। ঐ দিন *ইত্তেফাক*'র প্রথম পাতায় দুই কলাম হেডিং এ দুই কলাম ছবিসহ অনুষ্ঠানের যে সংবাদটি ছাপা হয় তার শিরোনাম ছিল, "আমি তোমাদেরই লোক, এই মোর পরিচয় হোক ॥ ঢাকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ ॥ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।"[১৩৯] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদান কালে কবি সুফিয়া কামাল বলেন:

> রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গালীর কবি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বিশ্বকবি। রবীন্দ্র প্রতিভা লইয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি। তার অবস্থান আমাদের আপনভোলা মনের সঙ্গোপনে। রবীন্দ্রনাথ ঋতুর কবি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত প্রত্যেক ঋতুই কবির কবিতায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও উত্তর বাংলারই কবি। তাহার সোনার তরী পূর্ব বাংলার পদ্মা ও মেঘনাতেই বাহিত হইয়াছিল। আজও কবির স্মৃতি নিয়া বাঁচিয়া আছে শিলাইদহ, শাহজাদপুর প্রভৃতি স্থান।[১৪০]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মূল অনুষ্ঠানমালা হয় **১১** ও **১২** বৈশাখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতা জাহানারা বেগম ও অমূল্য চক্রবর্তীর উদ্যোগে কার্জন হলে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।[১৪১] **১১** বৈশাখের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন সুফিয়া কামাল। তিনি তার বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'সকল রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে অবস্থিত মহান কবি' হিসেবে অভিহিত করেন। গীতি, নক্সা, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের সভা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ **১২** বৈশাখ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বজনীনতা, মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনায় তার সহানুভূতি এবং তার সাহিত্যে পূর্ব বাংলার জনজীবন ও প্রকৃতির অবদান উল্লেখ করেন।[১৪২] এই অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ। অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন উপাচার্য মাহমুদ হোসেন।[১৪৩]

তিনটি কমিটি সম্মিলিতভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনের প্রথম দিন ছিল ২৪ বৈশাখ। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ, খান সারওয়ার মুরশিদ এবং শামসুন্নাহার মাহমুদ বক্তব্য প্রদান করেন।[১৪৪] অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমান ও আন্দালিব সাদানী যথাক্রমে তাদের বাংলা ও উর্দু কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনা থেকে পাঠ করে শোনান ঢাকার বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। অনুষ্ঠান শেষ হয় সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ফজলুল হক হলে। সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, সন্‌জীদা খাতুন, ফরিদা বারী মালিক, বিলকিস নাসিরউদ্দীন, ফাহমিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, বেলা রায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাসরীন চৌধুরী, ভক্তিময় দাশগুপ্ত, ফজলে নিজামী, আতিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুল হক ও জাহেদুর রহিম। কবিতা আবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন খুরশিদী আলম, হুসনে আরা, নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা চৌধুরী, সাবিয়া বেগম, গোলাম মোস্তফা, রফিকুল ইসলাম, আহমেদ হোসেন, ইকবাল বাহার চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন বেনজীর আহমেদ, হাবীবুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, লতিফা হিলালী ও লতিফা হক।[১৪৫]

২৫ বৈশাখের অনুষ্ঠান দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বের আলোচনা অনুষ্ঠান হয়েছিল ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে। আলোচনা সভার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান মুহম্মদ আবদুল হাই। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলা বিভাগের মুনীর চৌধুরী এবং ইংরেজি বিভাগের সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা।[১৪৬] দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা'। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন জিন্নাত গণি। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির ভূমিকায় অভিনয় করেন মন্দিরা নন্দী। নৃত্যনাট্য দুটিতে আরও অংশ নিয়েছিলেন ফরিদা মজিদ, ফাহমিদা মজিদ, হামিদা ওয়াহাব, শিরীন বেগম, লায়লা হাসান, অজিত দে, কামাল লোহানী, মৃন্ময় দাশগুপ্ত। নৃত্যনাট্যে গান গেয়েছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, ফজলে নিজামী, জাহেদুর রহিম, এনামুল হক ও চৌধুরী আবদুর রহিম।[১৪৭]

২৬ বৈশাখ ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুনীর চৌধুরী, হাসান জামান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও রশীদ করিম। একই দিন সন্ধ্যায় নির্ধারিত ছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়। কিন্তু এদিন সারা পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ার কারণে ঐ নাটকটি আর মঞ্চস্থ হয়নি। পরের দিন ২৭ বৈশাখ এ নাটকটি চ্যারিটি শো হিসেবে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম, মাসুদ আলী খান, দাউদ খান মজলিস, খোন্দকার রফিকুল হক, আনোয়ার হোসেন, রেশমা, কামেলা শরাফী, হোসনে আরা লাইজু।[১৪৮] নাটকের শো থেকে সংগৃহীত অর্থ দান করা হয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গঠিত তহবিলে। এই নাটকের মঞ্চায়নের মাধ্যমেই তিনটি কমিটির সম্মিলিত আয়োজনে মূল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।[১৪৯]

সামরিক শাসনকালে দেশে এক ধরনের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা দেখা গিয়েছিল। এর মধ্যে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অঙ্গন আলোড়িত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জয়যাত্রার সূচনা করেছিল আর এই নতুন জয়যাত্রায় নারীরাও ছিলেন সমান অংশীদার। কেন্দ্রীয়ভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির সদস্য ছিলেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক নীলিমা ইব্রাহিম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি ও নাটকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এদের মধ্যে ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, হুসনা বানু খানম, সন্‌জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, নাসরীন চৌধুরী, মাহবুব আরা, আখতার জাহান, হুসনে আরা, বেলা রায়, লতিফা হক, হোসনে আরা লাইজু, লায়লা হাসান, ফরিদা মজিদ প্রমুখ। এছাড়া রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সুফিয়া কামাল এবং শামসুন্নাহার মাহমুদ। রবীন্দ্র জয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে ৯-১১ মে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ফজলুল হক হলে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। সিম্পোজিয়ামের দ্বিতীয় দিনের সভায় অন্যান্যের সাথে বক্তা হিসেবে ছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ। তিনি বক্তব্যে বলেন, "কবিগুরুর জীবন কীর্তি সকল মানুষের জন্য উৎসাহ আনয়ন করে। হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে কবিকে বিবেচনা করা নিরর্থক। সবচেয়ে বড় কথা হল রবীন্দ্রনাথ মানবতার কবি বিশ্বকবি।"[১৫০] এভাবেই নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন বাঙালি সত্তাকে ধরে রাখতে। সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বাঙালি সেদিন জয়ী হয়েছিল, ভাষা আন্দোলনের মতোই আর একটি আন্দোলনে। আর এই আন্দোলনেও সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬৩ সালের ২২-২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ। বাংলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে চার দেয়ালের পরিধি, পুঁথির পরিবেষ্টন ও গবেষণার অনুবীক্ষণ থেকে বিস্তৃত করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতূহল, শ্রদ্ধা আর চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের মধ্যে যারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহান্বিত, তাদের হাতে কলমে এ ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[১৫১]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংঘ-উপসংঘ গঠিত হয়েছিল যেখানে উল্লেখযোগ্য হারে নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল। প্রদর্শনী উপসংঘে সদস্য হিসেবে ছিলেন আখতার বানু, সুলতানা বেগম। কবিতাপাঠ উপসংঘের সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন সালেহা খাতুন, মালেকা বেগম ও মমতাজ বেগম। গদ্যপাঠ উপসংঘে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্বে ছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম এবং সদস্য হিসেবে ছিলেন বিলকিস বানু ও মাহমুদা খানম। এছাড়া ফেরদৌস আরা বেগম ও সাদিকা সাঈদ নাটক উপসংঘে এবং রওশন আরা বেগম, সুফিয়া বেগম, ফউজিয়া পারভীন, ফরিদা বেগম ও সাইদা খাতুন সংগীত উপসংঘের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[১৫২]

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ পালিত হয় সম্পূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের যৌথ পরিচালনায় তবে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরাও এতে যোগদান করেছিলেন। এই সপ্তাহ উদ্‌যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ওসমান গণিও এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দান করেন।[১৫৩] উপাচার্য ২২ সেপ্টেম্বর সকাল নয়টায় উৎসবের উদ্বোধন করেন। স্বাগত ভাষণে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষণাবেক্ষণে, তার বিকাশ ও রূপায়নে সহায়তা করা বাংলা বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মুহাম্মদ ওসমান গণি পড়াশোনার বাইরেও দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, ওই অনুষ্ঠানকে তারই পরিচয়বাহী হিসেবে উল্লেখ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানকে আলোচনা, কবিতা-গদ্য-নাটক থেকে পাঠ, সংগীতানুষ্ঠান ও প্রদর্শনী এই কয়ভাগে বিন্যাস করা হয়।[১৫৪] প্রদর্শনীর শাখা ছিল চারটি ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস। চার্ট, রেখা চিত্র, স্থির চিত্র,

হস্ত লিখিত পুঁথি, প্রথম যুগের মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতির সাহায্যে প্রদর্শনীকে কৌতূহলোদ্দীপক ও সর্বসাধারণের সহজবোধ্য করে তোলা হয়। প্রতিদিন দুপুর দু'টা থেকে ছয়টা পর্যন্ত প্রদর্শনী চলত। সাত দিনে প্রায় বিশ হাজার লোক এই প্রদর্শনী দেখতে আসে।[১৫৫]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'র প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম দিন সন্ধ্যায় ছিল যথাক্রমে কবিতা, গদ্য ও নাটক পাঠের আসর এবং সংগীতানুষ্ঠান। প্রথম দিন অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নীলিমা ইব্রাহিম, মুনীর চৌধুরী ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল যথাক্রমে প্রদর্শনীতে বাংলা হরফের বিবর্তনের পরিচয় তুলে ধরেন।[১৫৬] সন্ধ্যায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠের আসর। আসরে মধ্যযুগীয় রীতিতে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য পাঠ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম।[১৫৭] কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য পাঠ করেন মাহমুদা খানম। নূরুন্নাহার জাহেদা খানম, জুবাইদা খাতুন ও সালেহা খাতুন সম্মিলিতভাবে কবি বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু* থেকে পাঠ করেন। *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র মহুয়া পালা থেকে আবৃত্তি করেন কল্পনা দাশ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর স্বদেশ কবিতা আবৃত্তি করেন শামসুন্নাহার। এছাড়া নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা পলাশীর যুদ্ধ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধুময় পৃথিবীর ধূলি কবিতাটি যথাক্রমে আবৃত্তি করেন মালেকা বেগম এবং নাসরীন জেহারা ও হেলেন শের।[১৫৮]

তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় বসে গদ্যপাঠের আসর। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা উইলিয়াম কেরীর আমলের প্রাচীন বাংলা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের *ব্যথার দান* পর্যন্ত গদ্যপাঠে অংশ নেন। গদ্যপাঠ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম। তিনি এই অনুষ্ঠানের গদ্যপাঠ উপসংঘের দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া গদ্যপাঠের আসরে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর *রায়নন্দিনী* থেকে অনবদ্য পাঠ করেছিলেন তিনি।[১৫৯] এই আসরে উইলিয়াম কেরির রচনা *কথোপকথন* থেকে পাঠ করেছিলেন জাহানারা ইমাম ও সাদিকা সাঈদ। তারাশঙ্কর তর্করত্নের *কাদম্বরী* রচনা থেকে পাঠ করেন মালেকা বেগম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বেতাল পঞ্চবিংশতি* এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* গদ্য থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে রাশিদা জামান এবং সালেহা খাতুন। এছাড়া হোসনা জাহান পাঠ করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের *নারীস্থান* রচনা থেকে এবং মোহাম্মদ আকরম খাঁ রচিত *মোস্তফা-চরিত* থেকে পাঠ করেন রওশন আরা।[১৬০]

২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হয় নাটক পাঠের আসর। নাটক পাঠের আসরে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' থেকে পাঠ করেন মুনীর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও আনিসুজ্জামান। আবৃত্তি করেন নীলিমা ইব্রাহিম। বিভাগীয় ছাত্র নরেন বিশ্বাসের আবৃত্তি ও অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ছাত্রী জাহানারা ইমাম গদ্য ও নাটক পাঠে অংশ নিয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই আসরে ছাত্রীদের মধ্যে আরও অংশ নেন ফেরদৌসী বেগম, খুরশীদ জাহান এবং হোসনে জাহান।[১৬১] বেশ কিছু পুরোনো কবিতায় সুর দিয়ে সংগীতানুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়েছিল। এই অসাধারণ কাজটি করেছিলেন শিল্পী আবদুল আহাদ ও আবদুল লতিফ।[১৬২]

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সন্ধ্যায় সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। সভায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রাচীন যুগের সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আলোচনা করেন নীলিমা ইব্রাহিম, সৈয়দ মুর্তজা আলী। মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন মুহম্মদ এনামুল হক, আলোচনায় অংশ নেন আহমদ শরীফ ও মনসুরউদ্দীন। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন সৈয়দ আলী আহসান এবং আলোচনায় অংশ নেন অজিত কুমার গুহ ও মুনীর চৌধুরী।[১৬৩]

২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হয় বাংলা গানের আসর। আসরে বিদ্যাপতি রচিত 'আজু রজনী হাম' গানটি পরিবেশন করেন লায়লা সারওয়ার। 'লীলাবালি লীলাবালি' লোকসংগীতটি পরিবেশন করেন সালমা চৌধুরী। অতুলপ্রসাদ সেন রচিত 'নিদ নাহি আঁখিপাতে' সংগীত পরিবেশন করেন সুফিয়া বেগম। সারা নীলুফার বানু কাজী নজরুল ইসলামের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' সংগীতটি পরিবেশন করেন।[১৬৪] এছাড়া আবু হেনা মোস্তফা কামাল পরিচালিত এই আসরে সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করেন লায়লা সারওয়ার, সুফিয়া বেগম, সারা নীলুফার বানু, জিনাত আরা মালিক, মীর্জা শাহানা, ফরিদা বেগম, জামাল আরা বেগম, ফরিদা বানু, কিশওয়ার জাহান, সাজেদা খাতুন প্রমুখ।[১৬৫]

বাংলা বিভাগের আয়োজনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ বাঙালিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ-উদ্দীপ্ত করেছিল। বাঙালিত্বের চেতনা উন্মেষে এ অনুষ্ঠানের ভূমিকা স্মরণীয়। ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, আলোচনা শুনেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। এই আগ্রহের কারণ মূলত অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ ও অভিনবত্বের জন্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্মর্তব্য যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে-অস্ফুট বিকাশ শুরু হয়েছিল সেকালে, তাই টেনে নিয়ে গেছে সবাইকে অনুষ্ঠানের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে যে-ছাত্র আন্দোলন চলছিল, তার অন্যতম প্রেরণা ছিল নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ।[১৬৬] সর্বোপরি বলা যায় এই সাহিত্য সপ্তাহে বাঙালির আবহমান সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা প্রসারের চেষ্টা করা হয়েছিল, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে বাংলা বিভাগের শিক্ষক নীলিমা ইব্রাহিমসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্র সংগীত বিতর্ক

১৯৬৭ সালের জুন মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ক্রমান্বয়ে এই বিতর্ক জাতীয় পরিষদের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে অনেক তিক্ততা সৃষ্টি হয়। ২০ জুন সরকারি দলের নেতা আব্দুস সবুর খান বলেন, সম্প্রতি তিনি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছেন যে পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপনের নামে বিভাগ পূর্ববর্তী পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার অশুভ তৎপরতা চলছে। বিদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামী আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে আঘাত হানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারতে সাধারণ নির্বাচনের পর এই ধরনের তৎপরতা আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। বিষয়টির দিকে যথাযথ মনযোগ দেয়া না হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।[১৬৭]

একই বছর ২২ জুন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সাংসদ মুজিবুর রহমান চৌধুরী উত্থাপিত এক প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রসংগীতকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থি হিসেবে অভিহিত করেন এবং ঢাকা রেডিও হতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় 'Broadcast Ban on Tagore' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় :

> Rawalpindi, June 22: Khawaza Shahabuddin, Minister for Information and Broadcasting, told the National Assembly today that the songs by poet Rabindranath Tagore which he termed 'against Pakistan's cultural values' would not be broadcast in future and the use of other songs

would also be reduced. He was answering to supplimentaries on a qustion from Mr. Mujibar Rahaman Choudhury.[১৬৮]

এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের উদ্যোগেই সরকারি বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের সূচনা হয়েছিল। এবারেও রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ। ২৩ জুন পত্রিকায় মন্ত্রী শাহবুদ্দিনের ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র-সংসদের পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রদান করা হয়। ২৪ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সরকারের রবীন্দ্রবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে। ডাকসু এবং সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদ সভা এবং বিক্ষোভ শোভাযাত্রার আয়োজন করে। সংস্কৃতি সংসদ গুলিস্তান, বাইতুল মোকাররম এবং নবাবপুরে জনসভা করে। এসব জনসভায় সংস্কৃতি সংসদের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনকে বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এই জঘন্য ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন।[১৬৯] পাশাপাশি বাংলা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের তাৎক্ষণিক প্রয়াসে ঢাকার সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রের ২৪ জুন ১৯৬৭ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৮ জুন বুদ্ধিজীবীর[১৭০] বিবৃতি শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়:

> স্থানীয় এক দৈনিক পত্রিকায় ২৩ জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[১৭১]

বিবৃতি প্রদানকারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম এবং সুফিয়া কামাল। তাদের এই বিবৃতির বিরুদ্ধে পাল্টা বিবৃতিও দেয়া হয়। ওই বিবৃতির বিরোধিতা এবং সরকারকে সমর্থন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন অধ্যাপক ১৮জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন শিক্ষক কর্তৃক মতানৈক্য প্রকাশ' শিরোনামে সংবাদ পত্রে এক পাল্টা বিবৃতিতে বলেন, "...The recent statement in favour of Tagore's songs is liable to be misunderstood and is likely to be exploited in propaganda against Pakistan."[১৭২]

১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির সমালোচনা করে দ্বিতীয় বিবৃতিটি দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক ও সামন্তচেতনা লালিত চল্লিশ জন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ এক বিবৃতির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। বিবৃতিতে বলা হয় যে, রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ঐক্য ও সংহতির নামে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন, ভাষা ও সাহিত্যকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস।[১৭৩] এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কৃতি সংসদ, স্পন্দন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ছায়ানট, আমরা ক'জন, শিল্পী ও সাহিত্য সংঘ, বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, বাণীচক্র, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, পূরবী, ঐকতান ইত্যাদি সংগঠনও সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[১৭৪]

বিবৃতি দানের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও এই রবীন্দ্রসংগীত বির্তকে নারীরা সোচ্চার ছিলেন। তাদের অবদানের বিষয়টিও এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। ঢাকা প্রেসক্লাবে এই বিষয়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সুফিয়া কামাল। এ সভায় বক্তরা রবীন্দ্রসংগীত ও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বর্ণনা করেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটেও এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন সুফিয়া কামাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী বেগম লায়লা আর্জুমান্দ বানু।[১৭৫] সেই সময় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম সরকারের রবীন্দ্রবিরোধী নীতির সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমেনা বেগম তার বিবৃতিতে বলেন, "ক্ষমতা বলে হয়তো সাময়িকভাবে বেতার ও টেলিভিশন হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু গণচিত্ত হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুমধুর আবেদনকে কোনো কালেই মুছে ফেলা যাবে না।"[১৭৬]

রবীন্দ্রসংগীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে এর প্রতিবাদে প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীরা ঢাকায় তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ' নাটকটি অভিনীত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কাজী তামান্না। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। ছায়ানটের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে তিনি বাঙালি সংস্কৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঢাকার বাইরে অন্যান্য বিভাগীয় শহরেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীসমাজ এই বিষয়ে প্রতিবাদ ও বিবৃতি প্রদান করেন। এক্ষেত্রেও নারীসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সিলেটে এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ।[১৭৭] এভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, কবি ও শিল্পীদের বিবৃতি প্রদান অব্যাহত থাকে। পাশাপাশি শুরু হয় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ। বিক্ষোভ চূড়ান্ত আকার ধারণ করলে সরকার নমনীয় হয়। ১৯৬৭ সালের ৪ জুলাই খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে তার পূর্ব ঘোষণার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, তার বক্তব্য সংবাদপত্রে বিকৃত করে পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি কখনও বলেননি, সব রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থি। তিনি শুধু জনৈক উর্দু কবি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এটুকু বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো গান যদি পাকিস্তানি আর্দশের পরিপন্থি হয়, তবে তা রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত হবে না।[১৭৮]

তার এই ব্যাখ্যার সাথে সাথেই এই বিতর্কের অবসান ঘটে। এই আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত চর্চা আরও বেগবান হয়। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশাল আঙ্গিকে রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন তার প্রমাণ বহন করে। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাপক অর্থেই বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে যা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আর এই আন্দোলনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে স্পষ্টত প্রগতিশীল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক ও সহযোগী হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। যুদ্ধ চলাকলে যোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখতে এবং জনসাধারণকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অণুপ্রাণিত করতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, তুলি-কলম-কণ্ঠ, বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনে কর্মরত

নারী লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, অভিনেতা, কথক, আবৃত্তিকারদের ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রীরা সম্পৃক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে চলাকালে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তীসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হয়েছেন তাদেরকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা স্কুল বা কলেজের ছাত্রী ছিলেন তখন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হবার বয়স হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রী সাংস্কৃতিক কর্মী ও শব্দসৈনিক হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশ বাণী এবং অন্যান্য শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, লায়লা হাসান, কাজী রোজী, নাসরীন আহমাদ শীলু, বুলবুল মহলানবীশ, শাহীন সামাদ, লায়লা জামান খান, আলেয়া ফেরদৌসি, সুমিতা নাহা, রূপা খান, ডালিয়া নওশীন প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠকগণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, বর্বরতার করুণ চিত্রসহ যুদ্ধকালীন সার্বিক পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া এই সকল বিষয় দেশবাসীকে জানাতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নাসরীন আহমাদ।[১৭৯] ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ছাত্রী ও ছায়ানটের সংস্কৃতি কর্মী ছিলেন। মে মাসের প্রথম দিকে তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন সেখান থেকে কলকাতায় যান। কলকাতায় গিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি খবর পাঠের জন্য সাক্ষাৎকার দেন এবং পরের দিন থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি সংবাদ পাঠক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি জেরীন আহমদ নামে ইংরেজি সংবাদ পাঠ করতেন। এর বাইরে তিনি সংগীত ও নাটকেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় সব সমবেত ও দু'টো একক সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রনেন কুশারী পরিচালিত একটি নাটকেও অভিনয় করেছিলেন তিনি।[১৮০] ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য যে আহ্বান জানানো হতো, সে কণ্ঠস্বরও ছিল তার।[১৮১]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাব্যধারার সাথেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্পৃক্ততা ছিল। বাংলা বিভাগের ছাত্রী কাজী রোজী[১৮২] কবিতা আবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কাজী রোজী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সিকানদার আবু জাফরের সাথে কলকাতা চলে যান। এ সময় তিনি কলকাতার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি রীপন স্ট্রিটে এক বাসায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের কাজ করতেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড় সেলাই করতেন, ঔষধ সংগ্রহ করে ক্যাম্পে পাঠাতেন। এরপর তিনি বেলাল মোহাম্মদদের অনুপ্রেরণায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। এখানে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন।[১৮৩]

এছাড়া কবিতা আবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন দর্শন বিভাগের ছাত্রী লায়লা হাসান।[১৮৪] সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই তিনি পরিচিত ছিলেন। একই সাথে তিনি ছাত্র রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি তার ছোট মেয়েকে নিয়ে বোরকা পরে সন্‌জীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হকের সাথে কুমিল্লা দিয়ে আগরতলায় পৌঁছেন। পরে কলকাতায় যান এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। সেখানে তিনি আবৃত্তি এবং নাটকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।[১৮৫]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এক অন্যতম শব্দসৈনিক ছিলেন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সংগীতশিল্পী বুলবুল মহলানবীশ।[১৮৬] 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই', 'নোঙ্গর তোলো তোলো', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি', 'জনতার সংগ্রাম চলবে চলবে', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', ইত্যাদি গানে সমবেতভাবে কণ্ঠ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধদের প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন।

তিনি জল্লাদের দরবার ধারাবাহিকে অভিনয় করতেন কেল্লা ফতেহ খানের বেগম চরিত্রে। এছাড়া আশরাফুল আলমের সঙ্গে 'বাংলার মুখ' নামক জীবন্তিকাতেও অভিনয় করেন তিনি।[১৮৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার আব্দুল জব্বার খানের মেয়ে রূপা খান[১৮৮] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তিনি ঈদকে কেন্দ্র করে রচিত 'চাঁদ তুমি ফিরে যাও দেখো মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা' নামে গানে এককভাবে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। ঈদের চাঁদ উঠার মুহূর্তেই প্রচারিত হৃদয় বিদারক এ গানটি শ্রোতাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিল। এর বাইরে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'নোঙ্গর তোল তোল', 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর, 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি', 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম'সহ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অধিকাংশ গানেই তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। এর বাইরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন আলেয়া ফেরদৌসী।[১৮৯] তিনি বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় নাটক 'জল্লাদের দরবার'এ অভিনয় করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী সন্‌জীদা খাতুন[১৯০] মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় গিয়ে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সহায়তায় বাংলাদেশের সংগীত শিল্পীদের একত্র করেন এবং সকলের সহায়তায় 'রূপান্তরের গান' গীতি আলেখ্য তৈরি করেন। তবে এর মূল রচয়িতা ছিলেন শাহরিয়ার কবির। বাংলাদেশের সংগ্রামের বিবরণমূলক এই গীতি আলেখ্যটি রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে প্রথম উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময় এ গীতি আলেখ্যটি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত তৈরিতে তিনি ভূমিকা রাখেন। এ প্রদর্শনীতে সংগৃহীত অর্থ খরচ বাদ দিয়ে দুঃস্থ শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া তিনি 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' গড়ে তুলতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৯১]

মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন শাহীন সামাদ।[১৯২] **১৯৭১** সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য ক্লাস করা সম্ভব হয়নি তার।[১৯৩] পরবর্তীসময়ে আগরতলা হয়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানে সন্‌জীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে গঠিত 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'য় যোগ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে সংগীতের মাধ্যমে উজ্জীবিত করেছেন। তার 'মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ', 'বাংলা মায়ের দামাল সন্তান' গানগুলো স্পন্দিত করেছে রণাঙ্গনের প্রতিটি মানুষকে।[১৯৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী সুমিতা নাহাও[১৯৫] যুদ্ধকালে কলকাতা লেনিন সরণিতে সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি এই দলের সাথে দিল্লী ও আসানসোলসহ বিভিন্ন এলাকায় গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এর বাইরে তিনি আকাশ বাণীতে সুচিত্রা মিত্র ও ভারত সরকারের শিল্পীদের সাথে অতিথি শিল্পী হিসেবেও কাজ করেন।[১৯৬] এছাড়াও মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী লায়লা জামান খান।[১৯৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুলতানা সারাওয়াত আরা জামানও নানাভাবে শরণার্থীদের ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন।[১৯৮]

অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী শীলা দাশ[১৯৯] 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। শিল্পী স্বপন চৌধুরীর কাছে সংবাদ পেয়ে তিনি এই সংস্থায় যোগদান করেন। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার পক্ষ থেকে দিল্লির একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'রূপান্তরের গান' পরিবেশন করা হয়। এই দলের অন্যতম একজন সদস্য ছিলেন তিনি। এই সংস্থার পক্ষ থেকে যে শিল্পীদল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান রের্কড করে আসতেন সেই দলেও তিনি ছিলেন। **১৯৭১** সালের ৬ ডিসেম্বর যশোরের নাভারণ বাজারে যে বিজয়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেই অনুষ্ঠানেও তিনি সংগীত

পরিবেশন করেন। এছাড়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানেও তিনি সংগীত পরিবেশন করেন।[২০০]

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হলের প্রাক্তন ও তখনকার যেসব ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন সাজেদা চৌধুরী, বদরুন্নেসা আহমদ, জাহানারা ইমাম, আইভি রহমান, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, মাহফুজা বেগম, আয়শা খানম, সুলতানা কামাল, রাশেদা খানম, রাফিয়া আখতার ডলি, ফোরকান বেগম, মমতাজ বেগম, ফরিদা আক্তার সাকী, রোকেয়া খানম, বেবী মওদুদ, আলেয়া ফেরদৌসী, অ্যারমা দত্ত, নীলিমা ইব্রাহিম, নাসিমুন আরা মিনু, জিয়াউন নাহার রোজি, কাজী মমতাজ হেনা, রাশেদা আমিন, আভা মন্ডল, রোকেয়া সুলতানা রাকা, শামসুন্নাহার ইকো, নাজনীন সুলতানা, সেলিনা খালেক, হাজেরা সুলতানা প্রমুখ।[২০১]

মূল্যায়ন

১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় লাভ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ন ছিল। যখনই বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত এসেছে, তখনই অগ্রভাগে থেকে প্রতিবাদ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সচেতন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষের বিস্মৃত জাতিসত্তা বা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ভূমিকা পালন করেছেন যেখানে নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সামাজিক ও পারিবারিক রক্ষণশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছিলেন বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামে। যে সময়ে প্রয়োজনে কোনো সহপাঠীর সাথে কথা বলার জন্য প্রক্টরের অনুমতি নিতে হতো সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের তুলনায় সংখ্যার দিক থেকে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল খুব কম। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহী করতে ভূমিকা রেখেছিলেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক করুণাকণা গুপ্তা এবং ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক চারুপমা বসু। তাছাড়া উইমেন্স হলের ছাত্রীদের সংস্কৃতি চর্চার বিকাশে দর্শন বিভাগের শিক্ষক আখতার ইমামের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। তবে ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন মূলত ভাষা আন্দোলনে মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘরের বাইরে তথা রাজপথে আসেন যা নারীর অগ্রগতিতে একটি মাইলফলক। পাশাপাশি ছাত্রীদের এই সাহসী কার্যক্রমে অনেক নারী উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ছাত্রীরা যখন ভাষা আন্দোলনে অর্থ-সংগ্রহের জন্য বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলতে গিয়েছেন তখন তাদের মাধ্যমে সাধারণ নারী তথা গৃহিণীরাও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, হয়েছেন আন্দোলনের সহযোগী। ভাষা আন্দোলন সাড়া পৃথিবীকেই আলোড়িত করেছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং বর্তমানে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ নিঃসন্দেহে এই স্বীকৃতির অংশীদার।

সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম যেমন: নাটক, নৃত্য, সংগীত এই সব কিছুতেই নারীদের পুরুষের সাথে একমঞ্চে স্বাধীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে বাধা ছিল তখন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে সহ-অভিনয়ের জন্যও নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু সাহস করে ছাত্রীরা মঞ্চে অভিনয় শুরু করলে এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অভিনয়ের অনুমতিও পেয়েছিলেন তারা। এর ফলে দীর্ঘকাল ধরে চলা একটি রক্ষণশীল সংস্কার সমাজ থেকে অপসৃত হয়। এই বাধা তারা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তীসময়ে নাটক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ছাত্রীরা শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ডাকসু, সংস্কৃতি সংসদ, ড্রামা সার্কল, ছাত্র শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠীসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রীদের এই অংশগ্রহণ পরবর্তীসময়ে নারীসমাজের প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি তৈরি করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল নাট্যচর্চা ও নাট্য আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক নীলিমা ইব্রাহিম। বাঙালি সংস্কৃতির ওপর যে কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। নাটকে অভিনয়ের সাথে আরও যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক রাজিয়া খান এবং হামিদা খানম। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ পালনে যেমন ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি সানন্দে পালন করেছেন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। আবার যখনই রবীন্দ্রসংগীত বা পহেলা বৈশাখ নিয়ে কোনো বির্তক দেখা দিয়েছে তখনও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন তারা। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই পারিবারিক, সামাজিক রক্ষণশীলতা অতিক্রম করে ঢাকা শহরের আরও অনেক নারী এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাংস্কৃতিক ধারায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ ছিলেন সর্বাগ্রে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল সেগুলোর প্রায় সবগুলোতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সন্‌জীদা খাতুন পরবর্তীসময়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। এছাড়া অধ্যাপক সুলতানা সারাওয়াত আরা জামান কলকাতায় শরণার্থী ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূতিকাগার। যা শুধু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের সাক্ষী নয় নিজেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী, নিজেই ইতিহাস। যে ইতিহাস সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রয়েছে বড় অংশীদারিত্ব।

তথ্যসূত্র

১. বাঙালি মুসলিম সমাজে আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞান পিপাসা জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও প্রবীণ ছাত্র ১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে এই সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রভাষক আবুল হুসেন। সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তখনকার ছাত্র এ. এফ. এম আবদুল হক, আবদুল কাদির, আনোয়ার হোসেন এবং এ. জেড. নূর আহমদ। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেন ও সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র সাহিত্যিক আবুল ফজলসহ অনেকেই এর সাথে যুক্ত হন। শুধু তাই নয় পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম সমাজে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারপন্থি অবাঙালি অধ্যাপকরাও এর প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। এদের মধ্যে সলিমুল্লাহ হলের প্রাধ্যক্ষ স্যার এ. এফ. রহমান ও ইতিহাসের অধ্যাপক মাহমুদ হোসেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্যসমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪)।

২. মুসলিম সাহিত্য সমাজ কর্তৃক ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারবিরোধী একটি প্রগতিশীল আন্দোলন। বাংলার মুসলমান সমাজে যে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা বিরাজমান ছিল সেসব দূরীকরণই ছিল এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মবিশ্বাস, পর্দাপ্রথা, সুদগ্রহণ, নৃত্যগীত ইত্যাদি সম্পর্কে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতেন। সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন সভায় পঠিত এবং *শিখা* পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে তাদের চিন্তা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটতো। কলকাতার *দি বেঙ্গলি* পত্রিকা সাহিত্য সমাজের এই আদর্শকে বুদ্ধির মুক্তি (Emancipation of the Intellect) এবং শিবনারায়ণ রায় বৌদ্ধিক আন্দোলন (Intellectual Movement) নামে অভিহিত করেন। কাজী আবদুল ওদুদ এক প্রবন্ধে বুদ্ধির মুক্তি শব্দটি উচ্চারণও করেন। এসব থেকেই এক সময় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন অভিধাটি প্রচলিত হয়। এই সংগঠনের মুখপত্র শিখার মুখবাণী ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষক ইতিহাস বিভাগের করুণাকণা গুপ্তা ১৯৩৫ সালে ছাত্রীদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক চারুপমা বসু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রী সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন চারুপমা বসু, সাধারণ সম্পাদক নীলিমা দাশ এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজি বিভাগের মিস জে জে ম্যাকে। সর্ব ভারতীয় মহিলা পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী ছাত্রী সমিতির সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। (সূত্রঃ রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী* ১৯২১-১৯৫২, ঢাকাঃ কল্যাণ প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ১৪১)।

৪. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

৫. *ঐ*।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট লিখিত চারুপমা বসুর পত্র, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, D- Register, Bundle-23M, Serial No. 37; উদ্ধৃত, রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

৭. D- Register, Bundle-23M, Serial No. 37; উদ্ধৃত, রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৯. *ঐ*।

১০. এডমিশন রেজিষ্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড রুম, ১৯২১-১৯৫২; রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

১১. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ছিলেন তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংগঠনটির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক তৎপরতা ছিল বহুমাত্রিক। এর উদ্যোগেই ভাষা প্রশ্নে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মজলিশের উদ্যোগেই ভাষা সমস্যার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্ক ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মজলিশের মুখপত্র সাপ্তাহিক *সৈনিক* বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০২, পৃ. ৬৫।

১৩. ভাষাসংগ্রামী হালিমা খাতুন ১৯৩৩ সালের ২৫ আগস্ট বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট থানার বাদেকাড়া পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মৌলভী শেখ আবদুর রহিম, মায়ের নাম দৌলুতননেসা। ১৯৫৩ সালে খুলনা করোনেশন স্কুল এবং আর. কে গার্লস কলেজে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবনের সূচনা। এরপর কিছুদিন রাজশাহী গার্লস কলেজে অধ্যাপনার পর যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। এখানেই কাটে তার জীবনের অধিকাংশ সময়। তিনি ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও তার বেশ খ্যাতি রয়েছে। তার রচিত বইয়ের সংখ্যা চল্লিশের অধিক। শিশু সাহিত্যিক ও ভাষাসংগ্রামী হিসেবে তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক (২০০৮)উল্লেখযোগ্য। এই ভাষাসংগ্রামী ২০১৮ সালের ৩ জুলাই ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ভাষা আন্দোলনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৯ সালে তিনি মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন।

১৪. রীতা ভৌমিক, *২৪ জন ভাষাসংগ্রামীর জীবন কথা*, ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১২, পৃ. ৫৪।

১৫. *প্রাগুক্ত*।

১৬. সেলিনা চৌধুরী, *নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল*, ঢাকা: শ্রাবণ, ২০১১, পৃ. ৭৫।

১৭. সেলিনা হোসেন, 'আমাদের সংস্কৃতিতে অমর একুশে, একটি অবিস্মরণীয় বাঁকবদল', শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬, পৃ. ২৭৮-২৭৯।

১৮. সুফিয়া ইব্রাহিম (আহমেদ) ১৯৩২ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে। পিতা বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মা লুৎফুননেছা ইব্রাহিম। ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ তার স্বামী। ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জ্যেভিয়ার্স স্কুল, বরিশাল বালিকা বিদ্যালয় ও দার্জিলিং ডাউ হিল স্কুলে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৮এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫০এ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিএ অনার্স এবং ১৯৫৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬১তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৫এ সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৮১তে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৯৫ সালে জাতীয় অধ্যাপক মনোনীত হন। তিনিই প্রথম নারী যিনি জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। *The Muslim Community in Bengal* (১৮৮৪-১৯১২) তার প্রকাশিত গ্রন্থ। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ২০০২ সালে পেয়েছেন একুশে পদক, ২০০৩ সালে তমদ্দুন মজলিশ তাকে মাতৃভাষা পদক প্রদান করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সম্মাননা জানিয়েছে। ২০১০ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন তার নামে

ঢাকার ১২ নাম্বার ধানমন্ডি সড়কের নামকরণ করেছে ভাষাসৈনিক ড. সুফিয়া আহমেদ সড়ক। এই ভাষাসংগ্রামী ২০২০ সালের ৯ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

১৯. সুফিয়া আহমেদ, 'একুশের স্মৃতিচারণ', শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন (সম্পা.), *একুশের স্মারকগ্রন্থ' সাতাশি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮-৩৯।

২০. সুফিয়া আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

২১. সাক্ষাৎকার, সুফিয়া আহমেদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ।

২২. রওশন আরা বাচ্চু সিলেট জেলার কুলাউড়ার উছলাপাড়ার এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে ১৯৩২ সালের ১৭ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা এ. এস. এম আশরাফ আলী ছিলেন একজন সাব রেজিস্ট্রার। মা মনিরুন্নেছা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। বরিশাল জেলার পিরোজপুর গার্লস স্কুল থেকে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। বিএম কলেজ থেকে ১৯৪৯ সালে আইএ পাস করেন। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে দর্শন শাস্ত্রে বিএ অনার্স এবং পরবর্তীসময়ে ইতিহাস বিষয়ে এমএ পাস করেন। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে তিনি বি এড করেন। ১৯৫৬ সালে কুলাউড়া গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা লিটল এ্যাঞ্জেলস নামে আজিমপুর কলোনির পাশে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। এর আগে খণ্ডকালীন সহকারী শিক্ষক হিসেবে আজিমপুর গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৪ সালে নজরুল একাডেমীতে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে কাকলী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। আনন্দময়ী গার্লস হাইস্কুলেও তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৯৮-২০০৩ সাল পর্যন্ত মিরপুর কাজীপাড়া এস. কে এফ বি এড কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভাষাসংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য তিনি বিভিন্ন সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এই ভাষাসংগ্রামী ২০১৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

২৩. রওশন আরা বাচ্চু, 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬, পৃ. ৯২-৯৪।

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

২৫. সাক্ষাৎকার, রওশন আরা বাচ্চু, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ভাষা শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি যাদুঘর ও সংগ্রহশালা, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

২৬. শাফিয়া খাতুন ১৯৩১ সালের ১৫ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস ছিল রংপুরে। তার বাবা মীর আসগর আলী ছিলেন নামকরা আইনজীবী। তিনি ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪৮ সালে লেডি ব্রার্বোন কলেজ থেকে আইএ ও পরে বিএ পাস করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ প্রথম পর্বে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে তিনি এম এ পাস করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে তিনি এমএড ডিগ্রি এবং ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২৭. *ভোরের কাগজ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

২৮. সুপা সাদিয়া, *বায়ান্নর ৫২ নারী*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৯২।

২৯. *ভোরের কাগজ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

৩০. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

৩১. ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকার কথা স্মরণ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ধানমন্ডিতে একটি রাস্তার নামকরণ করেছে ভাষাসৈনিক শাফিয়া খাতুন সড়ক। (সূত্র: *ভোরের কাগজ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

৩২. শামসুন্নাহার আহসান ১৯৩২ সালের ১১ মে বরিশাল শহরের আলেকান্দায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আবদুল ওহাব খান। তিনি ১৯৪৮ সালে বরিশাল সদর গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫০ সালে আইএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ভর্তি হন। একই বিভাগ থেকে অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বহু বছর সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে অধ্যাপনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। (সূত্র: সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০)।

৩৩. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৩৪. সুফিয়া আহমেদ, 'একুশের স্মৃতিচারণ', শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৩৫. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

৩৬. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পা.), *বাহান্নার ভাষাকন্যা*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬-৩৭।

৩৭. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

৩৮. *ভোরের কাগজ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

৩৯. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

৪০. *ঐ*।

৪১. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

৪২. *ঐ*। কর্মজীবনের শেষে সারা তৈফুর ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ২০১৩ সালের ৪ মে এই ভাষাকন্যা মৃত্যুবরণ করেন।

৪৩. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

৪৪. রওশন আরা বাচ্চু, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১।

৪৫. সুপা সাদিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৪৬. *ঐ*।

৪৭. নাদেরা বেগমের জন্ম ১৯২৯ সালের ২ আগস্ট বগুড়ায়। ব্রিটিশ রাজের পদস্থ কর্মকর্তা আবদুল হালিম চৌধুরী ও আফিয়া বেগমের চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তিনি বরিশাল সদর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ সালে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীসময়ে লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে আইএ এবং ইংরেজিতে বিএ পাস করে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীসময়ে স্বামীর চাকরি সূত্র ধরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং একটি মেয়েদের কলেজে পড়াতেন। সে সময় রেডিওতে খবরও পড়তেন। পরবর্তীসময়ে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শেষে ১৯৮৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (*দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ আগস্ট ২০১৩)।

৪৮. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ২০১৫, পৃ. ১১২৬-২৭।

৪৯. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

৫০. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

৫১. রীতা ভৌমিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

৫২. *ঐ*।

৫৩. সৈয়দ ইকবাল, 'ফরিদা বারি বীথি; রবীন্দ্রময় যার সত্তা', মুক্তমঞ্চ, *সমকাল*, ২৭ নভেম্বর ২০১২; সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৫৪. কামরুন নাহার লাইলী ১৯৩৫ সালের ২১ জুন পিরোজপুরের কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মকবুল হোসেন, মা নুরুননেসা। তিনি পিরোজপুর থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন ও বরিশাল বিএম কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫৫ সালে অনার্স এবং ১৯৫৬ সালে এমএ পাস করেন। ১৯৬০ সালে ছাত্রনেতা আনোয়ার জাহিদকে জেল গেটে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল' পাস করে অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম নোটারী পাবলিক ছিলেন। ষাটের দশকে *ইত্তেফাক* পত্রিকার মহিলা পাতা সম্পাদনা করতেন তিনি। (সূত্রঃ সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১)।

৫৫. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

৫৬. রীতা ভৌমিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৭।

৫৭. সেলিনা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

৫৮. Zahrat Ara Power Clare, 'My Reminscences, সৈয়দ মঞ্জুর আলী (সম্পা.), *সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ২০১০, পৃ. ১৮৫।

৫৯. সৈয়দ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*।

৬০. লায়লা নূর ১৯৩৪ সালের ৫ অক্টোবর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার গাজিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবু নাসের মো. নূর উল্লাহ, মাতা শামসুন্নাহার। তার পিতা বিহারের জামশেদ পুরে অবস্থিত টাটা স্টিল কোম্পানির প্রকৌশলী ছিলেন। লায়লা নূরের শৈশব কেটেছে সেখানে। পরবর্তীসময়ে কুমিল্লায় আসেন। লায়লা নূর ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৫২ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫৪ সালে বিএ এবং ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। ১৯৫৭ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রথম নারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কলেজে যোগদানের পর তিনি কি শিক্ষক মিলনায়তনে বসবেন, নাকি সেখানে কোনো পর্দার ব্যবস্থা থাকবে এ নিয়ে শিক্ষক মহলে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তখন অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান বলেন, 'জিহ্বা যেমন বত্রিশ দাঁতের আক্রমণ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে এড়িয়ে চলতে পারে তেমনি মিস লায়লাও তা পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি'। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার বহুমুখী অবদান রয়েছে। দীর্ঘদিন অলক্ত সাহিত্য পরিষদের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কুমিল্লার সাহিত্য ও সমাজসেবামূলক সংগঠন 'বিনয় সাহিত্য সংসদ' তাকে 'বিনয় সম্মাননা পদক-২০১৪' প্রদান করে। একই বছর অনন্যা শীর্ষ দশ নারী পদক পান তিনি। ২০১৯ সালের ৩১ মে তিনি কুমিল্লায় মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্রঃ তিতাশ চৌধুরী, *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮)।

৬১. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৩১ মে ২০১৯।

৬২. তালেয়া রেহমান, 'নির্বাচন, জেল ও এক বালতি চা', সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

৬৩. আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ১৮৩।

৬৪. হালিমা খাতুন, 'মনিময় সেই দিনগুলোর কথা', *আনন্দধারা* (স্মরণিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ২০১২, পৃ. ৫২।

৬৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০২, পৃ. ৭১।

৬৬. রফিকুল ইসলাম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৪, পৃ. ৪৮।

৬৭. *বাংলাপিডিয়া*, অনলাইন সংস্করণ, প্রবেশের তারিখ, ২৩ মার্চ ২০১৮।

৬৮. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ২২৯।

৬৯. আনিসুজ্জামান, 'সংস্কৃতি সংসদের কথা', হামিদ কায়সার অপু (সম্পা.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন' ৮৯ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা; রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৭০. মাহমুদ হাসান, 'সংস্কৃতি সংসদ: একটি ঐতিহ্য একটি আন্দোলন', *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭০।

৭১. রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

৭২. ওবায়দুল হক সরকার, 'নাট্য আন্দোলনের স্মরণীয় দিন', *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

৭৩. *প্রাগুক্ত*।

৭৪. *The Pakistan Observer*, 9 Sep 1951.

৭৫. ওবায়দুল হক সরকার, *বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে ইতিহাস*, চট্টগ্রাম-ঢাকা: বাংলাদেশের কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ২০০৭, পৃ. ৯৯।

৭৬. ওবায়দুল হক সরকার, 'প্রসঙ্গ: কুমিল্লার মঞ্চে মেয়েদের আগমন' কুমিল্লা, *অলক্ত*, মে-অক্টোবর ১৯৭৮, পৃ. ৮৬; মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৩২।

৭৭. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

৭৮. রফিকুল ইসলাম, 'পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন', হোসনে আরা শাহেদ (সম্পা.), *স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ২০০৬, পৃ. ১৬১।

৭৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৮।

৮০. সৈয়দ রেজাউর রহমান, *শতকের পথে গৌরবোজ্জ্বল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ২৫৭।

৮১. প্রচারপত্রের বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ.৩৭২।

৮২. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *স্মৃতিময় সেই দিনগুলি* (স্মরণিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন' ৮৯।

৮৩. মাহমুদ হাসান, *প্রাগুক্ত*।

৮৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

৮৫. শিল্প ও সাহিত্য পরিষদের উদ্যোক্তা ছিলেন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হাসনাত আবদুল হাই ও মোস্তফা জামান আব্বাসী।

৮৬. ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ৯৫।

৮৭. মাহমুদ হাসান, *প্রাগুক্ত*।

৮৮. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০।

৮৯. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮, পৃ. ১০।

৯০. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১।

৯১. সৈয়দ রেজাউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭-২৫৮।

৯২. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৪।

৯৩. *ঐ*, পৃ. ৫৫-৫৬।

৯৪. ওবায়দুল হক সরকার, 'নাট্য আন্দোলনের স্মরণীয় দিন', *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

৯৫. ওবায়দুল হক সরকার, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে ইতিহাস, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, পৃ. ১০০-১০২।

৯৬. ওবায়দুল হক সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

৯৭. *দৈনিক মিল্লাত*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৪।

৯৮. রফিকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১৯৫।

৯৯. মুনিরা খান, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', হোসনে আরা শাহেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

১০০. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।

১০১. *দৈনিক ইত্তেহাদ*, ২৫ শে আশ্বিন ১৩৬৩।

১০২. *প্রাগুক্ত*।

১০৩. *ঐ*।

১০৪. সেলিনা বাহার জামান, *পথে চলে যেতে যেতে*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ১২৪।

১০৫. সেলিনা চৌধুরী, *নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল*, ঢাকা: শ্রাবণ, ২০১১, পৃ. ৬৭।

১০৬. রওশন আরা ফিরোজ, অধ্যাপক সালমা আখতার ও ফরিদা প্রধান, 'রোকেয়া হল: অতীত ও বর্তমান', *আনন্দধারা* (স্মরণিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশেন, ২০১২, পৃ. ২৫।

১০৭. নীলিমা ইব্রাহিম, বিন্দু-বিসর্গ, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ১০২।

১০৮. সেলিনা বাহার জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

১০৯. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৭৫।

১১০. *দৈনিক সংবাদ*, ৬ জুন ১৯৬৯।

১১১. ড্রামা সার্কল তাদের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে এক স্যুভেনিরে উল্লেখ করে: 'বিশেষ করে আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এমন একটা কিছু প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্যবদ্ধ যা পুরোপুরি বোধ্য নয়, শুধুমাত্র উপলব্ধির প্রান্ত ছুঁয়ে যায় ক্ষণিকের জন্যে। অথচ সেই অবস্থায় ক্ষণিক উত্তরণেও মানসিক পরিতৃপ্তি মেলে। মূহূর্ত মাত্র হলেও অজানা এক জগতে অবলোকন করতে পারি যে জগতে চিন্তা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ বাহ্যিকরূপের সঙ্গে, বাহ্যিক অবয়বের সঙ্গে মেশে আর সুর-সঙ্গতি সুরলালিত্য বিপরীতে মেশে। সবকিছুর সংশ্লিষ্ট নবরূপ সামগ্রিক প্রকাশ ভঙ্গিমায় স্থিতি পায় বোধের দুয়ারে। মঞ্চমায়ার এই অদ্ভুত জগতে ক্রমান্বয়ে ব্যাপ্ত হচ্ছে-বিলীন হচ্ছে-ক্রম উদ্ঘাটিত নবদিগন্তে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই–মায়ার জগতের সেইসব দুর্লভ মুহূর্তগুলোর প্রাণ স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে সম্মুখ শক্তিটানে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার। তাই আমাদেরও এই এগিয়ে যাওয়া-পরাবাস্তব উপলব্ধির দুর্লভ মুহূর্তগুলোর পানে। এবং আমরা বিশ্বাস করি মঞ্চ মায়ার জগতে দৃশ্য পরিকল্পনায়, দৃশ্যপট প্রস্তুতিতে, শব্দসঙ্গীত আর আলোক প্রক্ষেপণে এবং সর্বোপরি সমন্বিত, সুসংহত মঞ্চ উপস্থাপনায় অর্থাৎ সৃষ্টধর্মী মঞ্চকর্মের সমস্ত শাখায় সকলের সংঘবদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব এই উপলব্ধির দ্বারপ্রাপ্নে পৌঁছানো- The theatre arts is a mimesis granda combination and synthesis of elements of all forms of arts-of the arts of letters of the auditory and the visual. It appeals directly or indirectly both to the senses as well as the

intellect. The art theatre is such a grand mimesis a unique form of art'. (সূত্র: সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭)।

১১২. রাহমান চৌধুরী, 'বাংলাদেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের নাট্য চর্চা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ডিসেম্বর, ২০০২, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ২৯।

১১৩. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, 'ড্রামা সার্কেল: প্রসঙ্গকথা এবং একক বজলুল করিম', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১৭, পৃ. ১০৯।

১১৪. রফিকুল ইসলাম, 'পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন', হোসেন আরা শাহেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

১১৫. মুনীরা খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

১১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ এপ্রিল ১৯৫৮।

১১৭. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

১১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।

১১৯. সন্‌জীদা খাতুন, *সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৬৪।

১২০. সাক্ষাৎকার, রামেন্দু মজুমদার, ১৫ নভেম্বর ২০১৯।

১২১. আমান-উজ-জামান খান, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি চর্চা', হোসনে আরা শাহেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

১২২. ফেরদৌসী মজুমদারের জন্ম ১৯৪৩ সালের ১৮ জুন। তার বাবা খান বাহাদুর আব্দুল হালিম চৌধুরী ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। মা আফিয়া বেগম। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী হলেও বেড়ে ওঠা ঢাকায়। মুসলিম গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। পরবর্তীসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও আরবিতে এমএ করেছেন। কর্মজীবন শুরু করেন আজিমপুর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে, দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে। বর্তমানে সানবিমস স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক। পঞ্চাশ বছর ধরে মঞ্চ ও টেলিভিশনের অগণিত নাটকে তার নানা ধরনের চরিত্রচিত্রণ এখনো দর্শকের স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে। *এখন দুঃসময়*, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *কোকিলারা*, *একা*, *এখনও ক্রীতদাস*, *ম্যাকবেথ*, *মেরাজ ফকিরের মা* ইত্যাদি নাটকে স্মরণীয় চরিত্র মূর্ত করে নন্দিত হয়েছেন তিনি। দেশের বাইরে ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরে অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে লাভ করেছেন স্বাধীনতা পদক, একুশে পদকসহ দেশি-বিদেশি নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। বাংলা একাডেমি কর্তৃক পেয়েছেন সম্মানসূচক ফেলোশিপ। স্বামী রামেন্দু মজুমদার ও একমাত্র সন্তান ত্রপা মজুমদার নাটকের জগতে স্বকীর্তিতে উজ্জ্বল।

১২৩. ফেরদৌসী মজুমদার, *অভিনয়জীবন আমার*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৯, পৃ. ১৬-১৮।

১২৪. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌসী মজুমদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মহিলা সমিতি মিলনায়তন, বেইলী রোড, ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

১২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৬৪।

১২৬. সৈয়দ রেজাউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

১২৭. আমান-উজ-জামান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০।

১২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

১২৯. রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭।

১৩০. ১৯৪৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তার তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া হয়েছে।

১৩১. সৈয়দ জামিল আহম্মেদ, 'নাটক ও নাট্যকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৪৭*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৫০৩।

১৩২. নীলিমা ইব্রাহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-০৫।

১৩৩. রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ৮০ বছর*, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৩, পৃ. ২৪৮।

১৩৪. রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।

১৩৫. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা: সাহিত্য, ২০০৩, পৃ. ৩৩৫।

১৩৬. সন্‌জীদা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩।

১৩৭. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫-৩৬।

১৩৮. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ২০১৫, পৃ. ৪২৫।

১৩৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।

১৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ এপ্রিল ১৯৬১।

১৪১. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, ঢাকা: প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ৩৯।

১৪২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

১৪৩. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬।

১৪৪. *ঐ*, পৃ. ৩৩৭।

১৪৫. *ঐ*, পৃ. ৩৩৮।

১৪৬. *The Pakistan Observer*, 9 may 1961.

১৪৭. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৮।

১৪৮. *ঐ*

১৪৯. সাক্ষাৎকার, মন্দিরা নন্দী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: গুলশান, ঢাকা, ২১ নভেম্বর ২০১৫।

১৫০. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৮।

১৫১. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২।

১৫২. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০২০, পৃ. ১৪২-১৪৩।

১৫৩. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩১।

১৫৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৪০।

১৫৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০-২৮১।

১৫৬. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪।

১৫৭. সাক্ষাৎকার, আনিসুজ্জামান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ নভেম্বর ২০১৯।

১৫৮. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-৩১।

১৫৯. সাক্ষাৎকার, রফিকুল ইসলাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর ২০১৯।

১৬০. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-৩৪।

১৬১. *ঐ*, পৃ. ১৩৬-৩৭।

১৬২. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫।

১৬৩. *ঐ*।

১৬৪. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-৪০।

১৬৫. *ঐ*।

১৬৬. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০১, পৃ. ৮৩।

১৬৭. *National Assembly of Pakistan Debates, Official Report*, 4th July 1967, p. 2663.

১৬৮. *The Pakistan Observer*, 23 June 1967.

১৬৯. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪।

১৭০. বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করেন: মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা (বৈজ্ঞানিক), কাজী মোতাহার হোসেন, (বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), সুফিয়া কামাল (কবি), জয়নুল আবেদিন (শিল্পী, ঢাকা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ), এম. এ. বারি (পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান), মুহম্মদ আবদুল হাই (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ), মুনীর চৌধুরী (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), খান সারওয়ার মুরশিদ (ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক), সিকান্‌দার আবু জাফর (কবি, *সমকাল* পত্রিকার সম্পাদক), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), আহমদ শরীফ (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), নীলিমা ইব্রাহিম (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), শামসুর রাহমান (কবি, সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক পাকিস্তান*), হাসান হাফিজুর রহমান (কবি, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক পাকিস্তান*), ফজল শাহাবুদ্দিন (কবি, সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক পাকিস্তান*), আনিসুজ্জামান (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), রফিকুল ইসলাম (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), শহীদুল্লা কায়সার (সাহিত্যিক, সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক সংবাদ*)।

১৭১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ জুন ১৯৬৭।

১৭২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৬৭; বিবৃতিদাতাগণ হলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (অধ্যক্ষ, ইংরেজি বিভাগ), কে. এম. এ মুনিম (অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ), মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন (আইন অনুষদ), মোহাম্মদ মোহর আলী (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ), এ. এফ. এম আবদুর রহীম (অধ্যাপক, গণিত বিভাগ)।

১৭৩. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪।

১৭৪. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

১৭৫. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৭৩।

১৭৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ জুন ১৯৬৭।

১৭৭. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

১৭৮. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২।

১৭৯. নাসরীন আহমাদ ১৯৪৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। মা বদরুন্নেসা আহমদ মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। বাবা নূরুদ্দিন আহমদ মুজিবনগর সরকারের বন ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের প্রথম সচিব ছিলেন। নাসরীন আহমাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিভাগ থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তার থিসিসের শিরোনাম ছিল 'Determinants of Landlessness in Rural Bangladesh'. ১৯৭৪ সালে বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনের শুরু। ১৯৮৪ সালে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে যোগদান করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ (২০০১-২০০৫) Earth and Environmental Sciences অনুষদের ডীন (২০১০-২০১২), এবং ভূগোল বিভাগে চেয়ারপার্সন (২০১১-১২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর বাইরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং সিনেটের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তার ছাত্রজীবনেও ডাকসুর কমনরুম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ২০১২ সাল থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৮০. সাক্ষাৎকার, নাসরীন আহমাদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপ-উপাচার্য কার্যালয় (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬।

১৮১. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

১৮২. কাজী রোজী বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি। তার জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৬ আগস্ট সাতক্ষীরায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে সম্মানসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিদফতরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং এখান থেকে ২০০৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদে সাতক্ষীরা জেলার জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত নারী আসন থেকে প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার লেখালেখি জীবনের সূচনা ১৯৬০-এর দশক থেকে। *পথঘাট মানুষের নাম*, *নষ্ট জোয়ার*, *লড়াই*, *আমার পিরানের কোনো মাপ নেই* তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার (২০১৩), অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (১৪৯৯) এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০১৮) লাভ করেন।

১৮৩. সাক্ষাৎকার, কাজী রোজী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বনানী, ঢাকা, ২৮ আগস্ট ২০১৯।

১৮৪. লায়লা হাসানের জন্ম ১৯৪৬ সালের ৮ আগস্ট কুমিল্লায়। তিনি ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী এবং অভিনেত্রী। তিনি প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মণিবর্ধন, অজিত সান্যাল, বাবু রাম সিংহ, জিএ মান্নান, শমর ভট্টাচার্য্য প্রমুখের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ছায়ানটের নৃত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষিকা। এছাড়া তিনি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন নটরাজ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি ১৯৮০-৮৫ কালপর্বে বাংলাদেশের টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'রুমঝুম'-এর উপস্থাপিকা ছিলেন। লায়লা হাসান থিয়েটার, টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি নৃত্যবিষয়ক *হৃদয়ে বাজে নূপুর* এবং চারুকলা নিয়ে *মোহনরূপে* গ্রন্থ রচনা করেন। শিল্পক্ষেত্রে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০১০ সালে একুশে পদকে ভূষিত করে।

১৮৫. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

১৮৬. বুলবুল মহলানবীশ ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা অরুণ চন্দ্র মহলানবীশ এবং মাতা বাসন্তী মহলানবীশ। তার স্বামী এস কে সুরিত লালা মুক্তিযুদ্ধের একজন সাব-কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭২-৭৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৭৬ সালে অনার্স পাস করে আবুধাবিতে শিক্ষকতাতে নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সালে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন এবং পুনরায় আবুধাবি গমন করে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত হন। দেশে ফিরে এসেও শিক্ষকতা এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকেছেন। এছাড়া ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। *পারস্য উপসাগরের তীরে*, *সংহতি সংলাপ*, *নীল সবুজের ছড়া*, *জিগীষা*, *রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* এবং *মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি ও স্মৃতি'৭১* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৮৭. সাক্ষাৎকার, বুলবুল মহলানবীশ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ মহাখালী, ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ২০১৭।

১৮৮. সংগীত শিল্পী রূপা খান ১৯৫৩ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকার কমলাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ আব্দুর জব্বার খান তার পিতা। মাতা সাজেদা খান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

১৮৯. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

১৯০. বাঙালি সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা ও বিকাশে নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজন মানুষের অন্যতম সন্‌জীদা খাতুন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনা। তিনি একাধারে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, লেখক, গবেষক, সংগঠক, সংগীতজ্ঞ এবং শিক্ষক। ১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা কাজী মোতাহার হোসেন, মা সাজেদা খাতুন। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক এবং ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (শান্তিনিকেতন, ভারত) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে ১৯৭৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তার প্রত্যক্ষ স্পর্শে প্রাণ পেয়েছে দেশের অন্যতম তিন শীর্ষ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট', 'জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ' ও 'কণ্ঠশীলন'। তার হাত ধরেই গড়ে উঠেছে প্রচলিত ধারার বাইরে ভিন্নধর্মী একটি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'নালন্দা'। তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *কবি সত্যেন্দনাথ দত্ত* (১৯৫৮), *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ* (১৯৮১), *ধ্বনি থেকে কবিতা* (১৯৮৮), *অতীত দিনের স্মৃতি*, *রবীন্দ্রনাথ: বিবিধ সন্ধান*, *ধ্বনির কথা আবৃত্তির কথা*, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই*, *সাহিত্যে কথা সংস্কৃতি কথা*, *জননী জন্মভূমি*, *রবীন্দ্রনাথ* এবং *রবীন্দ্রনাথ*, *সংস্কৃতির বৃক্ষছায়ায়*, *বাংলাদেশের হৃদয় হতে*, *নজরুল মানস*, *সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে* উল্লেখযোগ্য। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন বহু পুরস্কার। তার মধ্যে নজরুল স্বর্ণপদক (১৯৫৪), একুশে পদক (১৯৯০), সা'দত আলী আখন্দ সাহিত্যে পুরস্কার (১৯৯৮), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯), অন্যন্যা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) উল্লেখযোগ্য। এর বাইরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সন্‌জীদা খাতুনকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' প্রদান করেছে। এছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার' কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে পেয়েছেন 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি। তার সমৃদ্ধ জীবন ও কর্মের নানা বিষয় নিয়ে নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'বোধিবৃক্ষ'।

১৯১. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২০।

১৯২. বাংলাদেশের বরেণ্য নজরুলসংগীত শিল্পী শাহীন সামাদের জন্ম ১৯৫২ সালে কুষ্টিয়ায়। বাবা শামসুল হুদা, মা শামসুন্নাহার রহিমা খাতুন। তার শৈশবের বেশিরভাগ সময় কেটেছে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়। তিনি রাম গোপাল, ফজলুল হক মিয়া, সন্‌জীদা খাতুন, ফুল মোহাম্মদ, সুধীন দাশের কাছ থেকে সংগীতের তালিম গ্রহণ করেছেন। ১৯৯৫ সালে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ পরিচালিত 'মুক্তির গান' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তার প্রকাশিত গানের অ্যালবামের মধ্যে 'নহে নহে প্রিয়' (নজরুলগীতি), 'সন্ধ্যাতারা' (নজরুলগীতি), 'অভিসার' (নজরুলগীতি), 'নানা বর্ণের গান' (পঞ্চকবির গান), 'অন্তরে তুমি' (নজরুলগীতি) উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০০৯ সালে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ২০১৪ সালে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে সম্মাননা লাভ করেন। শাহীন

সামাদ ২০১৬ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন শাহীন সামাদ। (*দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭)।

১৯৩. সাক্ষাৎকার, শাহীন সামাদ, ২৮ মার্চ ২০১৭।

১৯৪. *ঐ*।

১৯৫. সুমিতা নাহা ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করেন।

১৯৬. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

১৯৭. প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ কর্নেল কাজী নুরউজ্জামান ও সারাওয়াত আরা জামানের কন্যা লায়লা জামান ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালের জুন মাসে তিনি তার মা, বোন ও অন্যান্যের সাথে সোনমুড়া বর্ডার অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। তার মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সারাওয়াত আরা জামান মৈত্রেয়ী দেবী ও গৌরি আইয়ুবের সহায়তায় হারিয়ে যাওয়া শিশু কিশোরদের নিয়ে একটি অরফানেজ গড়ে তোলেন। পরবর্তীসময়ে তারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে চলে আসেন এবং ফার্স্টএইড এডভান্স ট্রেনিং নিয়ে রেডক্রসের ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা করতেন। (সূত্রঃ সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২)।

১৯৮. *ঐ*।

১৯৯. শীলা দাশ (মোমেন) ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া করেছেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শৈশব থেকেই গান ও নাচ শিখেছেন। প্রথম জীবনে নৃত্যশিল্পী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। পরে সংগীত শিক্ষায় মনোযোগী হন। ছায়ানটের ছাত্রী ছিলেন। তার সংগীত গুরু হলেন ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহিদুল হক, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সুভাষ চৌধুরী, নীলিমা সেন এবং সঙ্ঘমিত্রা গুপ্ত। আগ্রা ঘরানার বিশিষ্ট সংগীতগুরু সংগীত রিসার্চ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পণ্ডিত বিজয় কিচলুর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নিয়েছেন। বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত এই শিল্পী বিভিন্ন সময়ে সংগীত বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণির সংগীত বিষয়ের বইয়ের রবীন্দ্রসংগীত অংশের রচয়িতা। তার প্রকাশিত সিডি 'বড় আশা বড় তৃষা'। তার গবেষণা ও পরিকল্পনায় 'রাগে রবি-রাগে' এই শিরোনামে দুটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৭৬ সালে শিশু প্রতিষ্ঠান ফুলকির প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত হন। প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্ন থেকেই অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে আজ অবধি সে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি শুদ্ধ সংগীত চর্চার সংগঠন রক্তকরবীর মূল প্রশিক্ষক ও কর্ণধার।

২০০. সাক্ষাৎকার, শীলা মোমেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ৪/বি, শহীদ আবুল খায়ের ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

২০১. সেলিনা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

চতুর্থ অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নারী

১৯৪৮-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় বেশ কয়েকটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত এই সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনগুলো পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গঠনে ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১] রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্রুত সম্প্রসারিত ও চাক্ষুষ হয়ে ওঠে তার শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছিল এই সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহ। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অগ্রগতির চারিত্র্য নির্ধারণে প্রতিটি সম্মেলনই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নানা সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারায় এই সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকেরা একটি সম্মেলনের আয়োজন করলে প্রতিক্রিয়ায় প্রগতিশীলরাও সম্মেলনের আয়োজন করেছে। ফলে বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্যের মাধ্যমে সমাজ অভ্যন্তরের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[২] এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহে নারীদেরও অংশগ্রহণ ছিল। বর্তমান অধ্যায়ে এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহে নারীর অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম উপস্থাপন করা হবে।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা, ১৯৪৮)

১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর উদ্যোগে ঢাকার কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন হাবীবুল্লাহ বাহার এবং সম্পাদক ছিলেন অজিত কুমার গুহ ও সৈয়দ আলী আশরাফ।[৩] ১৯৪৮ সালের ৫ ডিসেম্বর অভ্যর্থনা কমিটির এক সভায় সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা ও শাখার সভাপতি হিসেবে যাদের মনোনীত করা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ।[৪] তাকে শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।[৫] ৭ ডিসেম্বর অভ্যর্থনা কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন হাবীবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আলী আহসান, নাজির আহমদ, আবদুল আহাদ, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদ, ফতেহ লোহানী, মুজীবর রহমান খাঁ, শামসুল হুদা, বেদারউদ্দীন আহমদ, লায়লা আর্জুমান্দ বানু,[৬] মমতাজ আলী খান, মোহাম্মদ কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। কমিটির সদস্যবৃন্দ ১৯৪৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। এই সভায়ও উপস্থিত ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু।[৭]

১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল ২.৩০ মিনিটে কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে প্রথম বৈঠকে বক্তব্য রাখেন কবি গোলাম মোস্তফা, হাবীবুল্লাহ বাহার প্রমুখ। গোলাম মোস্তফা নবগঠিত রাষ্ট্রের নব চেতনা এবং সাহিত্য সাধনার ভবিষ্যত এবং সাহিত্যিকদের কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। হাবীবুল্লাহ বাহার ঢাকার ঐতিহ্য ও পূর্ব বাংলার শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার ভাষণে ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধদের মিলিত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উল্লেখ করেন। এছাড়া পূর্ব বাংলার সাহিত্যচর্চার মাধ্যম যে বাংলাই হওয়া উচিত তিনি সে প্রসঙ্গেরও অবতারণা করেন। তিনি বলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতিতে নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে

কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।"[৮] তার বক্তব্যের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি যে স্বতন্ত্র তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জনমানসে স্পষ্টতই এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের দিন অর্থাৎ **১৯৪৯** সালের **১** জানুয়ারি একটি কার্যকরী সংসদ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবে হাবীবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফের সাথে শামসুন্নাহার মাহমুদের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বাংলার প্রগতিবাদী তরুণ লেখক ও ঢাকার বাইরে অবস্থানরত বিখ্যাত সাহিত্যিক এই কার্যকরী সংসদে স্থান পাননি বিধায় অধ্যাপক আবুল কাশেমসহ কয়েকজন ব্যক্তি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তখন হাবীবুল্লাহ বাহার এই কার্যকরী সংসদ থেকে তার নাম প্রত্যাহার করেন। এছাড়া দ্বিতীয় দিনের এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক সভায় অধ্যাপক আবুল কাশেম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৯] সম্মেলনের সমাপনী পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু।[১০]

মূলত উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির মনে ধূমায়িত ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তবে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ।[১১] কিন্তু এই সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে স্বতন্ত্র চিন্তারই প্রতিফলন ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (চট্টগ্রাম, ১৯৫১)

ভারত বিভাগ উত্তরকালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ। এই সংগঠন দুটির সম্মিলিত উদ্যোগে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে **১৯৫১** সালের **১৬-১৯** মার্চ চারদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।[১২] এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল ফজল, সয়ীদুল হাসান, মাহবুব উল আলম চৌধুরী, শওকত ওসমান, হারুনুর রশিদ, টিপি বেগ প্রমুখ। এছাড়া অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও বিশিষ্ট শিল্পী কলিম শরাফী এতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক আবুল ফজল।[১৩] এই সম্মেলনে ঢাকা থেকে অনেক লেখক সাহিত্যিকের অংশগ্রহণের কথা থাকলেও *মর্নিং নিউজ* ও *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় সম্মেলনটিকে কমিউনিস্টদের সম্মেলন বলে প্রচার করায় ঢাকা থেকে লেখক-সাহিত্যিকরা চট্টগ্রামের ওই সম্মেলনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু অধ্যাপক আবুল ফজল ছিলেন অদম্য। আবুল ফজলের আত্মজীবনী *রেখাচিত্রে*তে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> কে বা কার প্ররোচনায় জানি না হঠাৎ 'আজাদ' আর 'মর্নিং নিউজে' শুরু হয়ে গেল সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের প্রচারণা। ঢাকার যেসব অধ্যাপক আর পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে আর সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন তাঁরা সবাই ভয় পেয়ে বেঁকে বসলেন। এমনকি শেষ মুহূর্তে আসতেও করলেন অস্বীকার। ধূয়া তোলা হয়েছে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সবাই কমিউনিস্ট। কর্মীদের মুখের পানি শুকিয়ে গেল। দমে গেলেন কর্মকর্তারাও। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন সম্মেলন মুলতবী রাখার জন্য। আমি বেঁকে বসলাম এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কি জানি কেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম সেদিন। জেদ চাপল মনে। বল্লাম : মাত্র তিন জনকে নিয়েও যদি সম্মেলন করতে হয় তা হলেও সম্মেলন আমরা করবোই। পেছনে হটা চলবে না। ভবিষ্যতে যা ঘটে ঘটুক। কর্মীরা এবার হৃত উৎসাহ যেন ফিরে পেলো। নবোদ্যমে শুরু হয় প্রস্তুতির কাজ। আমাকে বলা হল : ঢাকা থেকে কেউ না এলে তো মুখ থাকে না। আমি বল্লাম : আর কেউ যদি নাও আসেন সুফিয়া কামাল নিশ্চয়ই আসবেন। তাঁকে আমি নিয়ে আসতে পারব। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ হবেন মূল সভাপতি আর সুফিয়া কামাল হবেন প্রধান অতিথি। এ দু'জনের কেউই ভয় পাওয়ার পাত্র নয়।

দু'জনেই এসব ব্যাপারে অকুতোভয়। সবাই এবার আমাকে ধরে বললেন : আপনি প্লেনে ঢাকা চলে যান। যদি সুফিয়া কামালও কোনো কারণে না আসেন তাহলে মুখ থাকবে না আমাদের, সম্মেলন হয়ে পড়বে ঘরোয়া ব্যাপার। বলেছি তখন আমারও জেদ চেপে গেছে। পরদিন রওয়ানা দিলাম ঢাকা প্লেনে চড়ে। জীবনে ঐ আমার প্রথম হাওয়াই জাহাজ চড়া তাও সম্মেলনের পয়সায়। সুফিয়া কামাল সব শুনে বল্লেন : ঠিক আছে আমি যাব। আপনারা আহ্বান করছেন আমি না যেয়ে পারি? [১৪]

সুফিয়া কামালের সম্মতি পেয়ে আবুল ফজল ১৬ ও ১৭ মার্চ সাহিত্য সম্মেলনের দিন ধার্য করেন। এই সম্মেলনে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মূল সভাপতি এবং সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে মনোনীত হন। ঢাকা থেকে আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলামসহ আরও অনেক নবীন ও প্রবীণ সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী এতে অংশ নেন। কলকাতা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, রাধারানী দেবী, সুচিত্রা মিত্র, হেনা বর্মন প্রমুখ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।[১৫] সম্মেলনে বক্তৃতামালায় অংশ নেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুফিয়া কামাল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী এবং আবুল ফজল। সম্মেলনে পূর্ব বাংলার সাহিত্য ঐতিহ্য নির্ণীত হয় এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ নিজেদেরকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক রবীন্দ্র নজরুল সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন।[১৬] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন।[১৭] সুফিয়া কামাল তার বক্তব্যে বিদেশি সাহিত্য বর্জন করে স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন:

ভাষা ও ভাবের চাকচিক্য, বিদেশী সাহিত্যের ধার করা জৌলুস– যার সঙ্গে লেখকের অন্তরের পরিচয় ও পরিণয় ঘটেনি– বৃন্ত ছেঁড়া বাসি ফুলের মত তা ম্লান হয়ে যেতে কিছুমাত্র দেরী লাগে না। গত বিশ বছরের মধ্যে এমন বহু চকচকে ও ধারাল অথচ জাতীয় চিত্তের সঙ্গে যোগসূত্রহীন কৃত্রিম লেখাই পাঠকের স্মৃতি থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে। তাই আমাদের তরুণ সাহিত্যব্রতীদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি যা কিছু চকচকে তাই সোনা নয়। সোনা বলে ভুল করলে একদিন মনস্তাপের অন্ত থাকবে না। আজ বিশ্বসাহিত্য তথা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের কেউ আমাদের চিত্তেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, এই সবই ভাল কথা। বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা গোঁড়ামী দূর হবে, ফলে আমাদের সাহিত্যও হবে সুদূর প্রসারী ও বহু বিস্তৃত। কিন্তু মানুষ ত 'ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে কূলে নেই'– একটা দেশের মাটিতে তার জন্ম হয়েছে, একটা পরিবেশের মধ্যে সে লালিত হয়েছে, তার দেহ ও মন খোরাক সংগ্রহ করেছে এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থান থেকে। কাজেই সেখানকার ভাষা, সেখানকার সাহিত্য, সেখানকার ঐতিহ্য, তার মনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে; তাই সেই সবকে বাদ দিয়ে তার মনের কখনো বিকাশ হতে পারে না, মনের ভাবের কোনো ফুল ফুটাতে পারে না। এ কে না জানে, মনের বিকাশ ও প্রকাশেই হচ্ছে সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি। তাই আগে দেশের ভাষাকে, দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে জানতে হবে, এক কথায় যে খোরাক গ্রহণ করে মন ও অন্তর বেড়ে ওঠে তারি আবিস্কার করতে হবে সর্বাগ্রে। নিজের অন্তরকে যদি আবিষ্কার করতে পারেন, তবে আন্তর্জাতিক হতে আনার এতটুকু বেগ পেতে হবে না। নিজেকে না জেনে, নিজের মনকে না জেনে হঠাৎ আন্তর্জাতিক হতে যাওয়া, লম্ফ দিয়ে সমুদ্র লজ্ঘনেরই মত হাস্যস্পদ কাণ্ড নয় কি? মানুষ বিচিত্র কিন্তু তার মন এক– এদেশে বিদেশে, কন্টিণেন্টে সর্বত্রই মানুষের চিরন্তন মনই সৃষ্টি করেছে সাহিত্য ও শিল্প। ঘরকে আগে জানুন, তারপর বাহির আপনার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। নিজের দেশের দিকে তাকান, দেশের প্রকৃতির দিকে তাকান। দেশের প্রকৃতির দিকে, দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেশবাসীর সুখ দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হউন, তাদের ভালবাসুন– তবেই তাদের হাসি-অশ্রুময় জীবন আপনার লেখনী-মুখে ধরা দেবে। সৃষ্টির জন্যে ভালবাসার চেয়ে যাদুমন্ত্র আর নেই![১৮]

সুফিয়া কামাল তার ‘সাঁঝের মায়া’ কবিতা উদ্ধৃত করে বলেন,“পুষ্প বিকাশের সাধনা কঠিনের সাধনা। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপি তো আল্লাহ কুসুমাস্তীর্ণ করে রচনা করেননি। জীবনের দুর্গম পথেই মানুষের জয়যাত্রা।”[১৯] দেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সাথে আত্মিক সম্পর্ক ব্যতীত মানুষের বিকাশ লাভ সম্ভব নয় এই বিষয়টি উল্লেখ করে দেশকে ভালবাসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে আবুল ফজল তার ভাষণের উপসংহারে বলেন, “মনুষ্যত্বই তথা মানবধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি। একমাত্র এই সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ।”[২০] সম্মেলনে কিছু প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল সমাজ জীবনকে গতিশীলতার দিকে এগিয়ে নেবার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য স্বাধীনতা প্রদান। সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারলেও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করেছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অন্নদাশঙ্কর রায় ও মুহম্মদ এনামুল হক।

সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ছিল চিত্র প্রদর্শনী ও সংগীতানুষ্ঠান। চিত্র প্রদর্শনীতে জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমদ, কামরুল হাসান ও আনোয়ারুল হকের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়। সংগীতানুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত গান ‘যুদ্ধ না শান্তি’ পরিবেশিত হয়। সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ফরিদা হাসিন। তিনি ‘শ্বেত কপোতের পাখায় পাখায় শান্তি আসে’ গানটি পরিবেশন করেন।[২১]

পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার উপর এই সম্মেলন গভীর প্রভাব ফেলে। এই সম্মেলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। বিশেষ করে এই সম্মেলন বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য যথেষ্ট সচেতনতা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। এই বিষয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, “চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পর সারা পূর্ব বাংলায় নববর্ষ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, ইকবালের মৃত্যুবার্ষিকী, সুকান্তের মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষে একের পর এক বহু সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই ধরনের প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই আবৃত্তি ও গান বাজনার জলসা অনুষ্ঠানগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে।”[২২] এভাবেই চট্টগ্রামের সংস্কৃতি সম্মেলন পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করে উদ্বোধনী অভিভাষণে সুফিয়া কামাল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে যে বক্তব্য প্রদান করেন তা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলার নতুন সংস্কৃতি চেতনার পথপ্রদর্শক।

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (কুমিল্লা, ১৯৫২)

১৯৫২ সালের ২২, ২৩, ও ২৪ আগস্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রগতি মজলিসের উদ্যোগে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লক, যুবলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও রেভ্যুলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টি প্রভৃতি প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এতে সহযোগিতা করে।[২৩] বিভিন্ন আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রাম থেকে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, রেলওয়ে শিল্পী সংঘ, সিলেট থেকে মুসলিম সাহিত্য সংসদ, ঢাকা থেকে আর্ট গ্রুপ, অগ্রণী শিল্পী সংসদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।[২৪] এছাড়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, সুরলোক, শৈলরাণী বালিকা বিদ্যালয় এবং কন্যা শিক্ষালয়ও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনকে সফল ও সার্থক করার লক্ষ্যে গঠিত হয় অভ্যর্থনা সমিতি। অধ্যাপক অজিতনাথ নন্দী, অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ ও অধ্যাপক আশুতোষ চক্রবর্তী যথাক্রমে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হন। কুমিল্লার সাংস্কৃতিক

সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার করার জন্য 'আহ্বান' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকায় সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়:

> আমাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রধান বিশেষত্ব হইবে আত্মসমীক্ষা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমরা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, শিল্পে, সংগীতে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে কি আমরা দিতে পারিয়াছি, কি পারি নাই তাহাই আমরা মোহমুক্তচিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। এই আত্মসমালোচনার মধ্যে হইতেই আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান সাধকগণ নিজেদের বলাবল বুঝিতে পারিবেন আর তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হইতে থাকিবে ভাবষ্যৎ কর্মধারা।[২৫]

পাশাপাশি তারা আহ্বান জানাচ্ছেন সবাইকে:

> আসুন, জ্ঞান, বুদ্ধি, অর্থসামর্থ্য যাঁহার যাহা আছে তাহাই দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মহৎরূপ দান করুন। আমাদের এই আহ্বান শুধু দেশের কতিপয় শিক্ষিত ও বিত্তশীল ব্যক্তির প্রতিই সীমাবদ্ধ নহে উপরন্তু যে বিশাল জনতা যুগ যুগ ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য ও নানাবিধ শ্রমজনক কার্যের দ্বারা নীরবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গঠন ও ধারণ করিয়া আসিতেছে তাহাকেই উদ্দেশ করিয়াও বটে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-অধিবাসী সমন্বিত সমগ্র পাকিস্তানি জাতির চিত্তশতদল বিকশিত করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অবিচল নিষ্ঠা সহকারে আমরা কর্মের পথে অগ্রসর হইব। আমাদের সমবেত সাধনা ও তপস্যা সকল কলুষ কালিমা সকল মোহ, সকল ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া জাতিকে এক মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আজ যাহা উজ্জ্বল কল্পনা মাত্র কাল তাহা গৌরবমণ্ডিত বর্তমানে রূপায়িত হইবেই।[২৬]

তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকা থেকে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা থেকে সম্মেলনে যোগদানকারী নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, লিলি খান, নূরজাহান মোর্শেদ, রওশন জামিল প্রমুখ। ঢাকার অতিথিদের আগমনের বিষয়টি জানা যায় আবদুস সামাদের স্মৃতিচারণায়:

> ভাষাসৈনিক গাজীউল হক, সাংস্কৃতিক সংসদে আমার সহকর্মী রফিকুল ইসলাম (পরবর্তীকালে ডক্টর), শাখাওয়াৎ হোসেন, মেসবাহউদ্দিন, গোলাম মওলা, লিলি খান, আবদুস সাত্তার প্রমুখসহ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ২২শে আগস্ট নারায়ণগঞ্জ রেলষ্টেশনের উত্তরস্থ, কালীর বাজারের পূর্ব দিকে শীতলক্ষা নদীর খাড়িতে ভাসমান লঞ্চে উঠি। শরতের অপরাহ্নের লঞ্চের ছাদে ঝিরঝির ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের আমেজে কোলাহল সংগীতে অস্তগামী সূর্যের নয়নাভিরাম দৃশ্যের ভেতর দিয়ে আমরা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দাউদকান্দি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে অন্ধকার যে ঘনিয়ে এসেছে তা বুঝতে পারি। মনে হয়েছিল সেদিন বিকেলে যেন আমরা স্বর্গীয় এক আনন্দঘন পরিবেশ অতিক্রম করছিলাম, লক্ষ্য আমাদের ছিল জীবনের জয়গান গাওয়া, ঐ লঞ্চে ছিলেন সম্মেলনের অন্যতম শাখা সভাপতি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, তাঁর কন্যা সন্‌জীদা খাতুন, ডক্টর খান সাওয়ার মোর্শেদ, তাঁর সুযোগ্য স্ত্রী বেগম নূরজাহান মোর্শেদ, নৃত্যশিল্পী গওহর জামিল, রওশন জামিলসহ সম্মেলনে যোগদানকারী শিল্পী সাহিত্যিকবৃন্দ। তৎকালীন পুরান মডেলের বাসে উঠেই আমরা সমবেত কণ্ঠে একুশের গানসহ দেশাত্মবোধক বিপ্লবী সঙ্গীত যেমন– ১.'নওজোয়ান নওজোয়ান-বিশ্ব জেগেছে নওজোয়ান-কোটি প্রাণ একই প্রাণ-একই শপথে বলীয়ান', ২.'রিকশা চালাই মোরা রিকশাওয়ালা' ৩.'কারার ঐ লোহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট'. ৪. চিনি তোমায় চিনি গো কালো বাজার আলো করো তুমি না' শীর্ষক ইত্যাদি সংগীতগুলো গাইতে গাইতে আমরা দুপাশের জনতাকে বিপ্লবী ডাক দিতে দিতে রাত প্রায় সাতটায় কান্দিরপাড়ে বাস থেকে নামলাম। স্বেচ্ছাসেবক ও বন্ধুরা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ঈশ্বর পাঠশালায় নিয়ে যার যার সিট বুঝিয়ে দিলেন।[২৭]

সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে যোগদানকারী নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন মণি ইমাম, আরতি দত্ত, জওশন আরা রহমান, জাহানারা জুবলী, দীপ্তি খাস্তগীর, সুক্তি খাস্তগীর, মীরা সেন, সাদিদা খানম, যুথী পাড়িয়াল প্রমুখ।[২৮]

সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঢাকা আর্ট স্কুল একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে কুমিল্লা টাউন হলের থিওসফিক্যাল ভবনে। চিত্র প্রদর্শনীর দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা আর্ট স্কুলের শিক্ষক কামরুল হাসান। চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সুফিয়া কামাল। সম্মেলনের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান দুইপর্বে বিভক্ত ছিল। সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত প্রবন্ধ পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা এবং বিকেলে হতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।[২৯]

১৯৫২ সালের **২২** আগস্ট কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান। পতাকা উত্তোলন করেন সম্মেলনের মূল সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। পতাকা উত্তোলন উৎসবে শৈলরাণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অজিতনাথ নন্দী এবং সম্মেলনের সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন।[৩০] সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ **২৩** আগস্ট সকালের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাহবুব উল আলম এবং সাহিত্য অধিবেশনে কাব্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন সুফিয়া কামাল।[৩১] কাব্যশাখার সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন:

> ... আমার ভাষাকেই আমি এত ভালবাসি যে, এরই মধ্যে কোনো কিছুর অভাব আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার ভাষাই কি কম সাহিত্য কাব্য রচনা করল। কত যুগ আগে বিদেশের উচ্ছেদকারকদের হাত থেকে আমাদের দেশের সাহিত্য কাব্য কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে আজও বেঁচে আছে জাগিয়ে রেখে বাংলার ঐতিহ্যকে। আমার ভাষা! অমর ভাষা! কতজনকে অমর করে রেখেছে এই ভাষা! আলাওয়াল, দৌলত কাজী থেকে শুরু করে রাবীন্দ্রিক যুগ ও যুদ্ধোত্তর নজরুল থেকে যত কবি বাংলা ভাষার চর্চা আজ পর্যন্ত করে চলেছে তারা কি কম সম্পদ দিল বাংলা ভাষা সাহিত্যে? কাব্যে? গানে? সংস্কৃতিতে? ....দিনে দিনে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে এতে সন্দেহে নেই। আমার শক্তি সামান্য, আমি যা স্বপ্ন দেখেছিলাম তাকে রূপ দিতে আমার সাধ্যে কুলায় নাই। আমার আগে যারা গান গেয়েছেন, দান করেছেন কাব্য সম্পদ, তাদের কাছ থেকে পেয়েছি প্রচুর, তবুও মন ভরেনি, আরও অনেক আশা করেছি আমার সমযুগের স্রষ্টাদের কাছে, আর চেয়ে আছি আমার পরবর্ত্তী নতুন সূর্যোদয়ের পথপানে, আশা করে আছি, কল্পনায় দেখছি, আমার যা স্বপ্ন তা সত্য হবে এই নতুন দিনের আলোকে। সৃষ্টি হবে সেই সুন্দরের সৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া, যা শুধু আমি দেখলাম স্বপ্নে– এরা আনবে তা ছবিতে, রূপে রসে ফুটিয়ে তুলবে সেই ছন্দ, যা অন্তরের তন্ত্রীতে বেজে পথ পায়নি প্রকাশের চির যুগের ভাঙ্গা গড়া নব চেতনার নতুন আশার তাজা প্রাণের গান-মানবতার জয়ধ্বনি ভরা-অবসান করা কুৎসিত কৃত্রিমতাকে। বুকের রক্তে সেই সুর বাজুক যা জরা অবসাদকে তাড়িয়ে দিয়ে এনে দেবে সরল ঋজু মনের স্ফূরণ। এঁকে দেবে চোখের তারায় তারায় সুন্দরের সৃষ্টির মায়াকাজল, মানুষ মানুষকে করবে না অবিশ্বাস, থাকবে না বেঈমানী বিশ্বাসে, নির্ভরে ঐকান্তিকতায় একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে নব জীবনের সৃজন করবে। আমাদের লেখনীতে লিখবে সেই সে লেখা, রবি-করোজ্জ্বল প্রথম প্রভাত আকাশে যে ছোঁওয়া দেয়, মানুষের মনে লাগুক সেই রঙিন ছোঁয়ার ছোঁয়াচ। আমি করেছি কল্পনা, দেখেছি স্বপ্ন- সেই স্বপ্ন সার্থক হয়ে সফল হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা আমার অন্তর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, আমি বলছি–
>
> আমার এ লেখা নয়, রেখাচিত্র অনন্ত যুগের-
> কাল জয়ী এর পরে দৃষ্টি রহে সত্য সুন্দরের-
> সে আঁখির আলো অনির্ব্বাণ
> রহিবে সে অবিনাশী, দিতে সত্য পথের সন্ধান।
> পশ্চাতে আসিছে যাঁরা অনাগত চারণের দল,

প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির যে নতুন জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল, যে নতুন চেতনার জন্ম হয়েছিল সেই বিষয়টি তার বক্তব্যে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। তিনি মাতৃভাষার জয়গান করে এবং সাহিত্যের আদর্শের প্রশ্নে মিলিত মানবের মনকে আনন্দ দেয়ার মধ্যে সাহিত্যের মূল সার্থকতাকে চিহ্নিত করেছেন।

সম্মেলনের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ আগস্টও সুফিয়া কামালের উপস্থিতি ছিল। ২৪ আগস্ট সকালে আখতার হামিদ খান ছোট্ট চা চক্রের আয়োজন করেন। এখানে ছিলেন মাহবুব উল আলম, আবু নয়ীম মুহম্মদ বজলুর রশীদ, খান সারওয়ার মুরশিদ, অজিতনাথ নন্দী, রফিকুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, অভয় আশ্রমের প্রবোধ দাশগুপ্ত এবং সুফিয়া কামাল। সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং নানা বিষয় নিয়ে এই চা চক্রে আলোচনা করা হয়।[৩৩] প্রধান অতিথিগণকে চা চক্রে আপ্যায়িত করে কুমিল্লা টাউন ক্লাব। সুফিয়া কামাল সবাইকে চা পরিবেশন করেন। ঐদিন সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অবনী মোহন চক্রবর্তী এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন কবি জসীমউদ্‌দীন।[৩৪]

সম্মেলনে আলোচনা অধিবেশনে প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মৌলিক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধ পাঠ অধিবেশনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। অধিবেশনে লায়লা সামাদ 'সংস্কৃতি-সংকট', বেগম হাশমত রশীদ 'নারী প্রগতি', রওশন ইয়াজদানী 'ময়মনসিংহের লোকগাঁথা', মিসেস জিনাত গণি 'নৃত্য প্রসঙ্গে' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩৫] 'সংস্কৃতির সন্ধানে' শিরোনামে বসুধা চক্রবর্তীর প্রবন্ধ পাঠ করেন আবদুল গণি হাজারী।[৩৬] এছাড়া আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন রশিদা ডলী খান।[৩৭]

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহেশ প্রাঙ্গণের নাটমন্দিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন নজরুল সংগীতের আসর বসে, উদ্বোধন করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। দ্বিতীয় দিন ছিল রবীন্দ্রসংগীতের আসর। সংগীতানুষ্ঠানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করে। নাটক মঞ্চায়নে বাধা এলেও তা সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে অন্যান্যের সাথে অভিনয় করেছিলেন রোকেয়া কবীর, লায়লা সামাদ এবং নূরুন্নাহার। এ সম্পর্কে ওবায়দুল হক সরকার বলেন, "জবানবন্দী নাটকে মিসেস রোকেয়া কবীর, মিসেস লায়লা সামাদ এবং মিস নূরুন্নাহার ছিলেন। এই মহিলারা যেমন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত তেমনি ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য। তাঁদের কুমিল্লার মঞ্চে আগমন, স্বভাবতই মহিলা মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[৩৮] এছাড়া 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়। তৃতীয় দিন লোকসংগীত ও গণসংগীতের আসর বসে। চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ তাদের স্থানীয় ভাষায় রচিত লোকগীতি পরিবেশন করে। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ 'কিষাণের কাহিনী' ও 'মজদুর' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদের উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন গওহর জামিল, শিপ্রা দেবী এবং পুষ্পা ও মমতা। তাদের নাচ সম্মেলনে প্রশংসিত হয়।[৩৯] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন মীরা দাস, নীলিমা কর, শিপ্রা দেবী, রাণী রায়, মৃদুলা চ্যাটার্জী, আয়েশা সিদ্দিকা, লতীফা রশীদ প্রমুখ।[৪০] সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে কবি মোহিতলাল মজুমদার ও উর্দু লেখিকা রশিদ বাহারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। দ্বিতীয় এক প্রস্তাবে দেশে সংস্কৃতি তথা বাংলা ভাষা আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়।[৪১]

কুমিল্লা সম্মেলন ছিল দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। সম্মেলনে *সাপ্তাহিক নওবেলাল*–এর প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানকারী আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "ভাষা আন্দোলনলব্ধ অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার বিশেষ প্রকাশ যে এতে ঘটতে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ ছিল না।"[৪২] এই

সম্মেলন পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিসেবীদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। একটি উদার অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী আবহাওয়া সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "চিত্তে গানে নাচে নাটকে ভাষণে বক্তৃতায় প্রবন্ধে কবিতায় এমনকি কবির লড়াইতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেই সুর মানবতার সুর– গণজাগরণের সুর; সুন্দর সুস্থ জীবনের আবাহনের সুর।"[৪৩] কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় সম্মেলন সম্পর্কে বলা হয়, "সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যে সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতাবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন চিত্ত নন, এর প্রতিটি অনুষ্ঠানে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। পূর্ব বঙ্গের তরুণমনে এই সম্মেলন এক নতুন জীবনাদর্শের প্রেরণা সঞ্চার করেছে। প্রগতিবাদী এই সংস্কৃতি পিপাসুরা হচ্ছেন নতুন দিনের প্রাণধারার বাহক।"[৪৪] প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষ যে একটি আলাদা সংস্কৃতির ধারক এবং তাদের যে নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য সম্মেলনটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, উপস্থাপিত প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ, চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব কিছুর মধ্যেই পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। এই সম্মেলন সফল করে তোলার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা, ১৯৫৪)

পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে ১৯৫৪ সালের ২৩-২৬ এপ্রিল ঢাকার কার্জন হলে এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও শের-ই বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল এই সাহিত্য সম্মেলন। এই সম্মেলন ২৩-২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও পরে একদিন সম্প্রসারণ করে তা চলে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল এবং বর্ধমান হাউজ সম্মেলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৪৫] সম্মেলনে অর্ভ্যথনা কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান খান এবং যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন ও আব্দুল গণি হাজারী। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মূল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গবেষক আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।[৪৬] সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে *দৈনিক আজাদে* বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হতে চার শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করবেন। যাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের অধিক নারী প্রতিনিধি। ইডেন কলেজে নারী প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[৪৭]

ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে নারীগণ এই সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে এই সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে আসেন ফওজিয়া সামাদ, কামেলা শরাফী, মালেকা আজিম, জাহানারা জুবলী, হোসনে আরা মাক্কি, দীপ্তি খাস্তগীর, সুপ্তি খাস্তগীর, মণি ইমাম, বেবী, মুন্নি, খালেদা রহমান, জওশন আরা রহমান।[৪৮]

এছাড়া সাহিত্য অধিবেশন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মাহমুদ, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, সালেহা মাহমুদ, মেহের কবির, হোসনে আরা, লায়লা সামাদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সন্‌জীদা খাতুন, ফরিদা বারী মালিক, মাহবুবা হাসনাত প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করতে এসেছিলেন রাধারানী দেবী, প্রতিভা বসু, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত হতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করেন সুচিত্রা মিত্র।[৪৯] চট্টগ্রাম কলেজের অন্যতম ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন প্রতিভা মুৎসুদ্দি। এই সম্মেলনের একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ছিলেন সুফিয়া কামাল। সুফিয়া কামালকে নিয়ে প্রতিভা মুৎসুদ্দির স্মৃতিচারণ :

... কবিকে আমি দ্বিতীয়বার দেখি ঢাকায় ১৯৫৪ সালে কার্জন হলে সাহিত্য সম্মেলনে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয় ও মুসলিম লীগের ভরাডুবির পটভূমিকায় আয়োজিত এই সম্মেলনের ছিল ব্যাপক মাত্রা। কলকাতা থেকে যোগ দিতে এসেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দ্বীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, প্রতিভা বসু ও অন্য প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা। কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন এই আয়োজনের একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। চট্টগ্রাম কলেজের অন্যতম ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমি এই সম্মেলনে যোগ দেই। এই মহাসম্মেলনে কবির কর্মতৎপরতা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা দেখে আমি অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হই।[৫০]

পূর্বের সম্মেলনসমূহের ন্যায় এই সম্মেলনেও সুফিয়া কামাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।[৫১]

১৯৫৪ সালের ২৩ এপ্রিল সকাল নয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে পাঁচদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা হয়। আবদুল লতিফ কর্তৃক পরিবেশিত 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' গানের মাধ্যমে সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। তারপর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পাঁচদিনব্যাপী এই সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ, গণসংগীত, লোকসংগীত, নৃত্যনাট্য, লোকনাট্য, একাঙ্কিকা, ছায়ানাটক, চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি। সম্মেলনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি যোগদান করেন যাদের মধ্যে প্রায় বিশজন ছিলেন নারী।[৫২]

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সম্মেলনের প্রথম দিন দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী, মোহাম্মদ হোসেন ও জসীমউদ্‌দীন। রাত আটটায় অজিত গুহের সভাপতিত্বে 'একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন আবদুল লতিফ ও তার দল এবং চিরঞ্জীব সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের শিল্পীবৃন্দ। গণসংগীত পরিবেশন করেন শেখ লুৎফর রহমান, মলয় ঘোষ দস্তিদার, ঢাকার অগ্রণী শিল্পী সংঘ এবং চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ।[৫৩] প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের শিল্পীদের মধ্যে গণসংগীতে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন কলিম শরাফী, চিরঞ্জীব দাশ শর্মা, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, হরিপাল, জাহানারা রহমান, দীপ্তি খাস্তগীর।[৫৪] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে প্রান্তিকের শিল্পীরা 'শিল্পীর নবজন্ম' নামে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন।[৫৫]

২৪ এপ্রিল দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল সাড়ে আটটায়। এই অধিবেশনের বিষয় ছিল লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য। লোকসাহিত্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবিয়াল রমেশ শীল এবং শিশুসাহিত্য শাখায় সভাপতি ছিলেন বন্দে আলী মিঞা। এই অধিবেশনে আহমদ শরীফ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, হাবীবুর রহমানের সাথে প্রবন্ধ পাঠ করেন হোসনে আরা।[৫৬] দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা তিনটায়। মনন সাহিত্য বিষয়ক এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুনীর চৌধুরী। প্রবন্ধপাঠ করেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান, নাজমুল করিম ও কবীর চৌধুরী। রাত সাড়ে আটটায় মোহম্মদ বরকতউল্লাহর সভাপতিত্বে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানান।[৫৭] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ নতুন আঙ্গিকের নাটক 'বিভাব' মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন মণি ইমাম এবং কামেলা শরাফী।[৫৮]

২৫ এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় তৃতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে ভাষা ও সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আব্দুল হাই এবং বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা। এই অধিবেশনে অন্যান্যের সাথে প্রবন্ধ পাঠ করেন মেহের কবীর।[৫৯] বিকালের অধিবেশনে চারু ও কারুশিল্প শাখায় সভাপতিত্ব করেন জয়নুল আবেদিন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন শফিকুল হোসেন, কামরুল হাসান ও নাজির আহমদ। এই অধিবেশনে সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন কাজী মোতাহার হোসেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কার্জন হলে শামসুন্নাহার মাহমুদের সভপতিত্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।[৬০] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা ও চট্টগ্রামের শিল্পীরা নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন। নজরুল গীতির আসরে অন্যান্যের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন মাহবুবা হাসনাত। এরপর চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের 'নবজীবনের গান' এবং চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতি পরিষদের ছায়ানাট্য 'ইতিহাসের ছেড়া পাতা' দর্শক শ্রোতাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করে। এই ছায়ানাট্যে লবণের দুর্মূল্য, খুলনার দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও প্রদেশের গত সাধারণ নির্বাচনের দৃশ্য দেখানো হয়। এরপর খান বাহাদুর আমিনুল হক রচিত নাটক 'কাফের' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটক পরিচালনা করেন ফজলুর রহমান ও লায়লা সামাদ।[৬১]

২৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ দিনের অধিবেশন শুরু হয়। 'আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা' শীর্ষক এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আবুল মনসুর আহমদ। এই অধিবেশনে 'সাহিত্য ও মহিলা সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লায়লা সামাদ।[৬২] ঐদিনই বেলা তিনটায় শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি আবদুল গফুর সিদ্দিকী এখানে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রতি বছর একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।[৬৩] সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শওকত ওসমান। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের শিল্পীরা শরিফুল আলমের পরিচালনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাবধ' কাব্যের একটি দৃশ্য পরিবেশন করেন। এরপর কলিম শরাফীর পরিচালনায় রবীন্দ্র সংগীতের আসরে অংশ নেন সন্‌জীদা খাতুন, ফরিদা বারী মালিক, মালেকা আজিজ। এছাড়া সংস্কৃতি সংসদ 'কবর' নাটক মঞ্চস্থ করে। এরপর চট্টগ্রামের শিল্পীদের লোকনৃত্য, প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের শিল্পীদের গণসংগীত ও গীতিনকশা 'আর যুদ্ধ নয়' ও নাটক 'অরুণোদয়ের পথে' মঞ্চস্থ হয়।[৬৪] নাটকে অন্যান্যের সাথে অভিনয় করেছিলেন কামেলা শরাফী ও মণি ইমাম।[৬৫]

২৭ এপ্রিল পঞ্চম দিনের সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের উন্মুক্ত বৈঠক। তারা কাব্য-সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধিবেশনে 'দর্শন ও বিজ্ঞানের সমস্যা ও তাহার সমাধান' সম্পর্কে আলোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই বৈঠকে বক্তৃতা করেন রাধারাণী দেবী। রাতে কবিয়াল রমেশ শীল ও তার দলের কবিগানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।[৬৬]

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে আয়োজিত ঢাকার সাহিত্য সম্মেলনের নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলো সফলভাবে সমাপ্ত হয়। কিন্তু সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিভক্তি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব বাংলার ইসলামি ও পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যিকরা আমন্ত্রণ না পাওয়ায় এটি সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন নয় বলে তারা সমালোচনা করেন। তবে প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে আয়োজিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ছিল সময়োপযোগী একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সম্মেলনে সাহিত্যসভায় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারীরা এই সম্মেলন সফল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন (টাঙ্গাইল, ১৯৫৭)

১৯৫৭ সালের ৯-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার কাগমারীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আহূত দুই দিনব্যাপী পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন নামে পরিচিতি। একই সময় ৭-৮ ফেব্রুয়ারি সেখানে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনও হয় মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে। সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং আহ্বায়ক নিযুক্ত হন আবু জাফর শামসুদ্দীন।[৬৭] কাগমারী সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে সমগ্র পাকিস্তানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণসহ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও মিসর থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এই বর্ণাঢ্য সম্মেলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের নামে তৈরি তোরণ বা প্রবেশদ্বার। মির্জাপুর থেকে সম্মেলন স্থল সন্তোষ পর্যন্ত প্রায় তের মাইল কাগমারীর রাস্তায় পঞ্চাশটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর নামেও তোরণ নির্মাণ করা হয়।[৬৮]

রাজনৈতিক সম্মেলন শেষে ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে সাংস্কৃতিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। এটি উদ্বোধন করেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দর্শন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় তিন পর্বে।[৬৯] ৯ ফেব্রুয়ারি সকালের অধিবেশনে অন্যান্যের সাথে প্রবন্ধ পাঠে অংশগ্রহণ করেছিলেন বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লা।[৭০] তিনি 'The Role of Women in the Modern Society' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি রবিবার 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন কুলসুম হুদা। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুলসুম হুদা। তখন তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রী। কুলসুম হুদা ছিলেন স্পিকার তমিজউদ্দীন খানের মেয়ে এবং পরবর্তীকালে অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ হুদার স্ত্রী।[৭১] একই অধিবেশনে On the Art of Dance' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন মাদাম আজুরী।[৭২] এছাড়া সম্মেলনে মৌখিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শামসুন্নাহার মাহমুদ, ভারত থেকে আগত মিসেস সোফিয়া ওয়াদিয়া[৭৩] এবং রাধারাণী দেবী।[৭৪] সম্মেলনের শেষ দিন সন্ধ্যায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন আশাপূর্ণা দেবী।[৭৫] আশাপূর্ণা দেবী এবং রাধারাণী দেবী[৭৬] মওলানা ভাসানীকে তাদের নিজের লেখা কয়েকটি বই উপহার দিয়েছিলেন। রাধারাণী দেবী মওলানা ভাসানীর জন্য লাড্ডু এনে তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন 'এ লাড্ডু কিন্তু কলকাতার, দিল্লিকা লাড্ডু না'।[৭৭] এভাবেই মওলানা ভাসানীর সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারত ছাড়াও পূর্ব বাংলার বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালি নারী কাগমারী সম্মেলনে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন নারীদের মাসিক পত্রিকা *অনন্যা*'র সম্পাদক সাংবাদিক ও লেখিকা লায়লা সামাদ, মাসিক *খেলাঘর*-এর সম্পাদক কাজী আফসার উদ্দিন আহমদের স্ত্রী বেগম জেবুন্নেসা আহমদ, *মাসিকপত্র* পত্রিকার সম্পাদক চৌধুরী জেবুন্নেসা খানম, কথাশিল্পী নূরুন নাহার, রাজনৈতিক কর্মী ও সাংবাদিক কামরুন নাহার লাইলী প্রমুখ।[৭৮] কাগমারী সম্মেলন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েক মাস পর কামরুন নাহার লাইলী *অবরুদ্ধা* নামে নারীদের একটি সচিত্র সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিকটির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা ভাসানী। কাগমারী সম্মেলনে ডা. নন্দীর সঙ্গে যোগদান করেন তার স্ত্রী শান্তি নন্দী এবং দুই মেয়ে ইন্দিরা নন্দী ও মন্দিরা নন্দী।[৭৯]

কাগমারী সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনেও নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। অনেকে স্বেচ্ছায় গেলেও কাউকে কাউকে মওলানা ভাসানী সম্মেলনের সময় সন্তোষে থাকতে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। তাদের একজন ছিলেন আবদুল মতিন চৌধুরীর স্ত্রী বেগম ফখরুন নেসা চৌধুরী। মওলানা ভাসানী তাকে চিঠির মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন, "ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান ও বিভিন্ন

দেশ হইতে গণ্যমান্য অতিথি আসিবেন। তাদের মধ্যে অনেক ভদ্রমহিলা রহিয়াছেন। তাহাদের খাতির যত্ন বাবুর মার পক্ষে করা সম্ভব হইবে না। আপনি দয়া করিয়া কয়েকটি দিনের জন্য আমার বাড়িতে আসিলে আমার যার পর নাই উপকার হইবে। আপনার কষ্ট হইবে তবু আসিলে আমার খুবই উপকার হইবে।”[৮০] এই বিষয়ে বেগম চৌধুরী বলেন, “আমি চিঠি পেয়ে খুব খুশি হই। তখন টাঙ্গাইলে এসডিও ছিল আমার এক আত্মীয়। তাকে জানাইয়া দেই যে মওলানা সাহেবের অনুরোধে আমাকে টাঙ্গাইল যেতে হবে। সে যেন তাকে আমার কথা জানিয়ে দেয়। সম্মেলনের দুই দিন আগে আমার ছেলে জুনায়েদকে নিয়ে আমি সন্তোষ যাই। এক সপ্তাহ ছিলাম।”[৮১]

বেগম ফখরুন নেসা চৌধুরীর পাশাপাশি *ইত্তেহাদ* সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের স্ত্রী আজিজা ইদরিসও মওলানা ভাসানীর অনুরোধে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই বিষয়ে আজিজা ইদরিসের স্মৃতিচারণ:

> মওলানা সাহেব আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। তাঁর মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, তিনি মেয়েদের খুব সম্মান করতেন। তা বয়সে ছোট বড় যেই হোক। তিনি আমাকে বললেন, দেখো, বিদেশি মেহমানরা আসবে, ভারতের বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আসবেন, তাঁদের কালচার অন্য রকম। তাঁদের থাকা-খাওয়ায় যেন কোনো কষ্ট না হয়। বাবুর মা (বেগম আলেমা ভাসানী) একা পারবে না। তুমি আছ, মতিন চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী থাকবেন, তোমরা সামাল দিবা। দেখো, আর কারে কারে সঙ্গে নিবে। সম্মেলনের আগেই আমি সন্তোষ যাই। একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠানেই কত ঝামেলা সেখানে লাখো মানুষ। প্রধানমন্ত্রী থেকে কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সবকিছু সুন্দরভাবে হলো। মতিন চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী ও আমি বিদেশি মেহমান ও কবি সাহিত্যিকদের খাবারের রান্নাবান্না ও তাঁদের দেখাশোনার কাজ করেছি।[৮২]

এছাড়াও সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মাহমুদ আলীর স্ত্রী হাজেরা মাহমুদ এবং আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য সেলিনা বানু।[৮৩] তাদের সকলের প্রচেষ্টাতেই সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রতিদিনের সর্বশেষ পর্ব ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কুষ্টিয়ার লালন সাঁইর দল, রংপুরের ভাওয়াইয়া দল, ঢাকার ইয়্যুথ লীগ ও কল্লোল, চট্টগ্রামের সংগীত দল, করাচীর নৃত্যশিল্পী মাদাম আজুরী ও তার দল, পশ্চিম পাকিস্তানের লোকনৃত্য, শেরপুরের জারি গানের দল ছিল উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনে সংগীতানুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল আব্বাসউদ্দীন আহমদ, সোহরাব হোসেন, শাহ আবদুল করিম, শ্রীকান্ত দাশ, পরিমল দাশ ও রমেশ শীলের গান এবং রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীবৃন্দের পরিবেশনা। এছাড়া সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার শিল্পীরা অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন।[৮৪] সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তিন দিনই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ‘সৎ মা’ এবং ‘কাঞ্চন যাত্রা’ শিরোনামে যাত্রাও পরিবেশিত হয়।[৮৫] কাগমারী সম্মেলনে অন্যান্য আয়োজনের পাশাপাশি বাংলার কুটির শিল্পের এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল করতে যারা ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন নজমী আরা। তিনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।[৮৬]

কাগমারী সম্মেলন পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতির সংগ্রামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সম্মেলনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্মেলনের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন:

... কাগমারীর সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ এবং তার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক (দার্শনিকও বটে) ভিত-ভূমি নির্মাণের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার অন্যতম।... জাতি মাত্রেরই সংস্কৃতি আছে। বাঙালি জাতি একটি সুপ্রাচীন যৌথ সংস্কৃতির অধিকারী। এ সংস্কৃতিতে আদিবাসী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের বিশিষ্ট অবদান আছে। বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসরব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাঙালির আলাদা জাতি সত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন। সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী উদ্যোগে আয়োজিত এবং অনুষ্ঠিত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক-কাম-রাজনৈতিক সম্মেলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[৮৭]

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পূর্বে এত ব্যাপকভিত্তিক আর কোনো সাংস্কৃতিক সম্মেলন পূর্ব বাংলায় হয়নি। তাই পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এই সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনে সে যুগের তুলনায় নারীদের যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষণীয়। সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা, প্রবন্ধ পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকল ক্ষেত্রেই নারীদের উপস্থিতি ছিল। সম্মেলনে প্রগতিশীল ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালি নারীদের এক আলোকিত সমাবেশ ঘটেছিল।

সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান (ঢাকা, ১৯৫৭)

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ঢাকার কার্জন হলে ১৯৫৭ সালের ২৯-৩১ মার্চ তিন দিনব্যাপী এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিল তমদ্দুন মজলিশ, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, শিল্প-সংস্কৃতি পরিষদ, পাক-বাংলা সাহিত্য মহফিল, পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস সমিতি, বিক্রমপুর সাংস্কৃতিক পরিষদ, গেন্ডারিয়া কালচারাল ক্লাব, পাকিস্তান ছাত্রশক্তি, ছাত্রী পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রভৃতি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠন।[৮৮] ১৯৫৭ সালের ২৯ মার্চ সকাল দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। তিনদিনব্যাপী প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালা দুটি সেশনে বিভক্ত ছিল। সকালে আলোচনা সভা এবং বিকালে ছিল সংগীতানুষ্ঠান ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান। সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে নারীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন শামসুন্নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, জাহানারা আরজু প্রমুখ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সাহিত্য অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন শামসুন্নাহার মাহমুদ। তিনি 'আযাদী সংগ্রামে নারী' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন:

মুসলমান আমলে পাক-ভারতের ইতিহাস মুসলিম নারীর দানে সমুজ্জল। তাঁরা আশ্চর্য দক্ষতার সাথে রাজ্য শাসন করেছেন, সূক্ষ্ম রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, আবার নিভৃতে করেছেন জ্ঞানের সাধনা এবং কাব্যের আরাধনা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজপুত্র ললনাদের কথা বাদ দিলেও আরও বিস্তর মহিলা শৌর্যে বীর্যে অথবা শিল্প-চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহান মোগল সম্রাটদের গৌরবসূর্য যখন অস্তমিত হয়, সেই সময় থেকে পুরনারীদেরও গৌরবদীপ্ত ভূমিকার হল সমাপ্তি, অন্ধকারের কালো যবনিকার অন্তরালে তারা আত্মগোপন করলেন।[৮৯]

তার বক্তব্যে শিল্প-সাহিত্য চর্চা থেকে শুরু করে রাজনীতি, রাজ্যশাসন সকল ক্ষেত্রেই নারীর গৌরবদীপ্ত ভূমিকার কথা উঠে এসেছে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল কবি-সম্মেলন এবং সিপাহী বিপ্লব ও শহিদদের উদ্দেশ্য নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর। এই পর্বে স্বরচিত

কবিতা পাঠ করেন সুফিয়া কামাল, বেনজীর আহমদ, আহসান হাবীব, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আশরাফ সিদ্দিকী, আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জাহানারা আরজু প্রমুখ।[৯০]

তৃতীয় ও শেষদিনের আলোচনা অনুষ্ঠানে সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রতিদিনের দ্বিতীয় পর্ব ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা ছিল কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ প্রমুখের গানের মাধ্যমে রচিত একটি 'গীতি বিচিত্রা'। শেষদিনের সন্ধ্যায় আকর্ষণীয় পর্ব ছিল আসকার ইবনে শাইখের নাটক '১৮৫৭'।[৯১] অনুষ্ঠানের শেষ দিনে শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক মাহফুজুল হক বলেন, "যে সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে সিপাহী বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে সবের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।"[৯২] সম্মেলনে সিপাহী বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য অনুসন্ধান করার প্রয়াস করা হয়। সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে আয়োজিত এ সম্মেলনের প্রবন্ধ পাঠ অধিবেশন এবং কাব্যপাঠের আসরে নারীদের উপস্থিতি ছিল।

মূল্যায়ন

সামাজিক রক্ষণশীলতা ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলোতে বিশেষ করে ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের উপস্থিতি ছিল। সম্মেলনসমূহ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য সচেতনতা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। সম্মেলনসমূহে বাঙালির সাহিত্যচর্চার বিভিন্ন ধারার গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা পর্বের পাশাপাশি প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, নাটক, নৃত্যনাট্য, একাঙ্কিকা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহে প্রধান অতিথি, বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতি, প্রবন্ধকার, সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, নাট্যশিল্পী হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো সম্মেলনে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বেও ছিলেন নারীরা। এই সম্মেলনসমূহ পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, সাহিত্য সভায় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারীরা এসব সম্মেলন সফল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০১) ; সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০১); রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০২)।

২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

৩. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯।

৪. শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯০৮ সালে ফেনী (বৃহত্তর নোয়াখালী) জেলার গুথুমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুহম্মদ নুরুল্লাহ, মাতা আসিয়া খাতুন চৌধুরানী। শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন চট্টগ্রামের খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুলে, কিন্তু অবরোধ প্রথাসহ নানা সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৬ সালে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯২৭ সালে ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ তার স্ত্রীর উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে যেমন সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তেমনি জীবনভর স্ত্রীর সব কাজে সর্বতোভাবে সমর্থন দিয়েছেন। শামসুন নাহার ১৯২৮ সালে আইএ পাস করেন কৃতিত্বের সাথে। ১৯৩২ সালে প্রাইভেটে ডিস্টিংকশনসহ বিএ এবং ১৯৪২ সালে এমএ পাস করেন। তিনি লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। শামসুন নাহার কলকাতায় থাকাকালে কাজী নজরুল ইসলাম তাকে সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯২০ সালে তার প্রথম লেখা কবিতা 'প্রণতি' প্রকাশিত হয় কিশোরদের *আঙ্গুর* নামক মাসিক পত্রিকায়। ১৯২৫ সালে প্রথম বই *পূণ্যময়ী* প্রকাশিত হয়। আইএ পড়ার সময় তিনি *নওরোজ* ও *আত্মশক্তি* পত্রিকার মহিলা বিভাগ সম্পাদনা করতেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বুলবুল* পত্রিকা তিনি এবং তার ভাই হাবীবুল্লাহ বাহার যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে: *ফুলবাগিচা* (১৯৩৫), *বেগম মহল* (১৯৩৬), *রোকেয়া জীবনী* (১৯৩৭), *শিশুর শিক্ষা* (১৯৩৯), *আমার দেখা তুরস্ক* (১৯৫৫), *নজরুলকে যেমন দেখেছি* (১৯৫৮) ইত্যাদি। শামসুন নাহার নিয়মিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতেন। তিনি কিছুদিন নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। শামসুন নাহার ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। তিনি কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন দলের নেতৃত্ব দেন এবং সমগ্র এশিয়ার জন্য এই আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘের আঞ্চলিক পরিচালক পদে নিয়োজিত হন। তার প্রচেষ্টায় ১৯৬১ সালে পঙ্গু শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালের ১৪ মার্চ লাহোরের নিখিল পাকিস্তান সমাজ কল্যাণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে বক্তব্য প্রদান করেন। মার্চ থেকেই তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে যান এবং ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। শামসুন নাহার মাহমুদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে তার নামানুসারে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্রী নিবাসের নামকরণ করা হয়। ১৯৮১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শামসুন নাহার মাহমুদকে সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং ১৯৯৬ সালে বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করা হয়। (শামসুন নাহার মাহমুদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: শাহিদা পারভীন, শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২)।

৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯।

৬. লায়লা আর্জুমান্দ বানু ১৯২৯ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, মাতা সারা তৈফুর। ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ও দর্শনশাস্ত্রে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৪৯ সালে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ওস্তাদ গুল মুহাম্মদ খানের তত্ত্বাবধানে উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রাথমিক তালিম গ্রহণ করেন। এছাড়াও নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, গজল, আধুনিক ও লোকসংগীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। দশ বছর বয়সে প্রথম মুসলিম কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তিনি ঢাকা বেতারে সংগীত পরিবেশন করেন। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর

'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করেছিলেন তিনি। তিনি ১৯৬৮ সালে ইরানের রেজা শাহ পাহলভীর নিকট থেকে 'অভিষেক পদক' এবং ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট হতে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পুরস্কার গ্রহণ করেন। ১৯৭৭-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা সংগীত কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা জাদুঘরের ট্রাস্টি, নজরুল স্মরলিপি শুদ্ধিকরণ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সংস্কৃতি কমিশনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই গুণী শিল্পী ১৯৯৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া, অনলাইন সংস্করণ, প্রবেশের তারিখ, ১১ নভেম্বর ২০১৯)।

৭. রোজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।

৮. *দৈনিক আজাদ*, ১ জানুয়ারি ১৯৪৯।

৯. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ৯ জানুয়ারি ১৯৪৯।

১০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৪।

১১. ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ৬২।

১২. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রামঃ স্মরণিক, ১৯৯১, পৃ. ৮।

১৩. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রামঃ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৪০২, পৃ. ২৫।

১৪. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৫, পৃ. ২২১।

১৫. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*।

১৬. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০১, পৃ. ৩৬।

১৭. সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ দেখুনঃ রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩-১৮৭।

১৮. *সাপ্তাহিক বেগম*, ১ এপ্রিল ১৯৫১।

১৯. *প্রাগুক্ত*, চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বেগম সুফিয়া কামালের সম্পূর্ণ ভাষণ দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট-২।

২০. রোজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭।

২১. *ঐ*, পৃ. ১৮৭-১৮৯।

২২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৯।

২৩. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

২৪. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী*, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ২০।

২৫. পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (কুমিল্লা, ১৯৫২)-এ প্রকাশিত পুস্তিকা আহ্বান থেকে উদ্ধৃত; সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)*, ঢাকা: অনন্যা, ২০০১, পৃ. ৯১।

২৬. *প্রাগুক্ত*।

২৭. আবদুস সামাদ, 'কুমিল্লায় ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন', *সাপ্তাহিক অভিবাদন*, ৩১ আগস্ট ২০০১, উদ্ধৃত, মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১২৩-১২৪।

২৮. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *স্মৃতির সন্ধানে*, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৪৫৭।

২৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।

৩০. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

৩১. মামুন সিদ্দিকী, 'সুফিয়া কামালের একটি দুষ্প্রাপ্য অভিভাষণ', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, ২০১১, পৃ. ২৯৩।

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭-২৯৮, কাব্যশাখার সভাপতি হিসেবে সুফিয়া কামালের সম্পূর্ণ অভিভাষণ দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-৩।

৩৩. মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৩০।

৩৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭।

৩৬. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৩৭. *ঐ*।

৩৮. ওবায়দুল হক সরকার, 'প্রসঙ্গঃ কুমিল্লার মঞ্চে মেয়েদের আগমন', *অলক্ত*, মে-অক্টোবর, ১৯৭৮, পৃ. ৮৬-৯১; মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৩৯. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

৪০. *ঐ*।

৪১. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।

৪২. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ২০০।

৪৩. আহমদ শরীফ, 'এবারের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে', *ইনসাফ*, ১২ আশ্বিন ১৩৫৯; উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৪৪. সরলানন্দ সেন, *ঢাকার চিঠি*, ১ম খণ্ড, মুক্তধারা, ১৯৭১, পৃ. ২১৬; উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৪৫. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৫৪।

৪৬. *ঐ*, ২২ এপ্রিল ১৯৫৪।

৪৭. *ঐ*, ২৩ এপ্রিল ১৯৫৪।

৪৮. জওশন আরা রহমান, *স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৮৪।

৪৯. *দৈনিক আজাদ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৫৪।

৫০. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, 'স্মৃতিতে কবি-জননী সাহসিকা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৫১. সাক্ষাৎকার, আনিসুজ্জামান, ২০ নভেম্বর ২০১৯।

৫২. *দৈনিক আজাদ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৫৪।

৫৩. *ঐ*।

৫৪. রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১২, পৃ. ১৪৬।

৫৫. *দৈনিক আজাদ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৫৪।

৫৬. *ঐ*, ২৫ এপ্রিল ১৯৫৪।

৫৭. *ঐ*।

৫৮. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

৫৯. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ এপ্রিল ১৯৫৪।

৬০. *ঐ*।

৬১. *ঐ*।

৬২. *ঐ*, ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪।

৬৩. *ঐ*।

৬৪. *ঐ*।

৬৫. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*।

৬৬. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪।

৬৭. আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭: স্মৃতিচারণ', দৈনিক *সংবাদ*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।

৬৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৮, পৃ. ১০৭-১০৮।

৬৯. প্রবন্ধ পাঠ অধিবেশনের বিস্তারিত সূচির জন্য দ্রষ্টব্য: কাগমারী সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি: পরিশিষ্ট-৪ (ক, খ, গ)।

৭০. বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লাহ ছিলেন নারী প্রগতির একজন প্রবক্তা। তার স্বামী হামিদুল্লাহ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী এবং আইসিএস অফিসার। বেগম জেবুন্নেসা করাচি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি বিখ্যাত ফ্যাশন পত্রিকা *Mirror* এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি মওলানা ভাসানীর আমন্ত্রণে কাগমারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি টাঙ্গাইলে এসে উঠেছিলেন ডাকবাংলোয়। পরবর্তীসময়ে রণদাপ্রসাদ সাহার মির্জাপুরের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। (সূত্র : সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩)।

৭১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

৭২. মাদাম আজুরি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সমগ্র উপমহাদেশে জননন্দিত ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী। ১৯০৭ সালে ভারতের বেঙ্গালুরুতে জন্ম। তার বাবা ছিলেন জার্মান ইহুদি এবং মা ভারতীয়। তার পিতৃদত্ত নাম আনা মারি গেইজেলর হলেও মাদাম আজুরি নামেই তিনি পরিচিত। তার স্বামী ছিলেন ভারতীয় মুসলমান। স্বাধীনতার পর তারা পাকিস্তান চলে আসেন এবং একটি নৃত্যশিল্পীর দল গড়ে তোলেন। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তিনি করাচিতে পাকিস্তানের প্রথম ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পের প্রতিষ্ঠান একাডেমি অব ক্লাসিক্যাল ডান্স প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চলচ্চিত্রে নৃত্য পরিবেশন করেও খ্যাতি অর্জন করেন। কাগমারী সম্মেলনে তিনি নাচ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যও পরিবেশন করেন। (সূত্র: সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১১৯)।

৭৩. ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণকারী সোফিয়া ওয়াদিয়া ছিলেন পঞ্চাশের দশকে ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক লেখক সংগঠন পিইএনের ভারতীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতীয় পিইএনের সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্র : সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*)।

৭৪. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*।

৭৫. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন সৃজনশীল কথাশিল্পী, ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবী ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার পটলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মা সরলাসুন্দরী দেবী। তার পৈত্রিক নিবাস হুগলি জেলার বেগমপুর গ্রামে, কিন্তু তার শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়। শৈশবে মায়ের কাছ থেকেই তার সাহিত্যপ্রীতির সূচনা হয়। স্কুল-কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেবার সুযোগ হয়নি তার, কিন্তু ছিলেন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯২৪ সালে কালিদাশ গুপ্তের

সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর উৎসাহে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান এবং রচনা করেন কালজয়ী সব উপন্যাস। তার *প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা* উপন্যাসত্রয়ী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম। দেড় হাজার ছোটগল্প এবং আড়াইশো'র বেশি উপন্যাসের রচয়িতা আশাপূর্ণা সম্মানিত হয়েছেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারসহ দেশের একাধিক সাহিত্য পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডক্টরেট ডিগ্রিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সম্মান রবীন্দ্র পুরস্কার। ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান সাহিত্য আকাদেমি ফেলোশিপেও ভূষিত হয়েছেন তিনি। এই কথাশিল্পী ১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

৭৬. রাধারানী দেবীর জন্ম ১৯০৩ সালের ৩০ নভেম্বর কোচবিহার রাজ্যে। তার পিতা আশুতোষ ঘোষ ছিলেন কোচবিহার প্রদেশের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাল্যকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ করে কাব্যের প্রতি তার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। কৈশোরে তার বিয়ে দেয়া হয় রামপুর রাজ্যের স্টেট ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। বিয়ের অল্পকাল পরেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় তার স্বামীর মৃত্যু হয়। পরে তার বিয়ে হয় কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে। বিখ্যাত সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন তাদের কন্যা। ১৯২৩ সাল থেকে *ভারতবর্ষ*, *বসুমতী*, *মানসী*, *মর্ম্মবাণী* প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় রাধারানী দেবীর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি *লীলাকমল* (১৯৩০), *সিঁথিমৌর* (১৯৩২), *বনবিহগী* (১৯৩৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে *বুকের বীণা* (১৯৩০), *আঙিনার ফুল* (১৯৩৪), *পুরবাসিনী* (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত উপন্যাস *শেষের পরিচয়* তিনি সমাপ্ত করেন। এছাড়া *শরৎচন্দ্র : মানুষ ও শিল্প* গ্রন্থটি শরৎ প্রতিভার বিশ্লেষণে তার অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির সার্থক সমন্বয়। তিনি ১৯৮৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

৭৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২১।

৭৮. *ঐ*, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

৭৯. সাক্ষাৎকার, মন্দিরা নন্দী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: গুলশান, ঢাকা, ২১ নভেম্বর ২০১৫।

৮০. উদ্ধৃত, সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৮১. *ঐ*।

৮২. *ঐ*, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

৮৩. *ঐ*, পৃ. ১২১।

৮৪. মহসিন শস্ত্রপাণি, 'কাগমারী সম্মেলন: পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্য', মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.), *কাগমারী সম্মেলনের স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: কাগমারী সম্মেলনে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি কমিটি, ২০১১, পৃ. ৬৩।

৮৫. *প্রাগুক্ত*।

৮৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৬।

৮৭. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*।

৮৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৯ মার্চ ১৯৫৭।

৮৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।

৯০. *দৈনিক আজাদ*, ৩১ মার্চ ১৯৫৭।

৯১. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

৯২. উদ্ধৃত, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

পঞ্চম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাংগঠনিক বিকাশে নারী

১৯৪৭ সালের পর থেকেই পূর্ব বাংলায় বেশ কিছু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন বিপরীতমুখী সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব নিরসনে এবং মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক পটভূমি রচনায় এসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সংগঠনগুলোর কোনোটির সূচনালগ্ন থেকেই নারীর সম্পৃক্ততা রয়েছে, আবার কোনোটিতে পরবর্তীসময়ে নারীরা সম্পৃক্ত হয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের স্বতন্ত্র সংগঠনেরও অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী এবং যুঁইফুল রায় ও নিবেদিতা নাগকে যুগ্ম সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল।[১] যুঁইফুল রায়, নিবেদিতা নাগ, পূর্ণিমা বকশী, মজিরা খাতুন, মনোরমা বসু, হেনা দাস, জ্যোৎস্না নিয়োগী, ভানুদেবী, অপর্ণা প্রমুখ ছিলেন এই সমিতির উদ্যোক্তা। ১৯৫০ সালের দিকে এই সমিতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সামিনা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, নেলী বেগম, হালিমা খাতুন প্রমুখ। যদিও এটি কোনো সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল না তথাপি পূর্ব বাংলার প্রথম সাংস্কৃতিক আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে এই সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।[২] ১৯৫২-১৯৭১ কালপর্বে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, পাকিস্তান লেখক সংঘ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ছায়ানট, বেগম ক্লাব, নজরুল একাডেমী, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক আরও কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। যেগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি সংসদ, ড্রামা সার্কল, ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী, ডাকসু নাট্যদল উল্লেখযোগ্য। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সংগঠনসমূহ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, প্রগতি মজলিস, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় ও করতোয়া শিল্পী গোষ্ঠী। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত হয়েছে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। এই সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। বর্তমান অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাংগঠনিক বিকাশে নারীর অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হবে। এই অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠাকালের ক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে।

প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ (১৯৫১)

প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগামী চট্টগ্রাম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়। পঞ্চাশের দশকে সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পাদিত *সীমান্ত* পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই চট্টগ্রামে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক চর্চাকে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার প্রয়াস থেকেই ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ।[৩] প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের সাথে সম্পৃক্ত থেকে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে সকল নারী ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন শিখা রাণী গুহ, মায়া চক্রবর্তী, চিন্ময়ী দাশ, মণি ইমাম, মীরা সেন, যুথিকা পাড়িয়াল, ইভা আলম, সালেহা আহমদ, আনোয়ারা খুকু, কামেলা শরাফী, রিজিয়া শাহিদ, দীপ্তি খাস্তগীর, মালেকা আজিম, জওশন আরা রহমান, খালেদা রহমান, জাহানারা জুবলী, বিলকিস নাসির উদ্দীন, হোসনে আরা মাক্কী, শেফালী ঘোষ প্রমুখ।[৪]

প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের শক্তিকে সুসংহত করতে চট্টগ্রামে হরিখোলার মাঠে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন চট্টগ্রামের তথা পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার উপর গভীর প্রভাব রেখেছিল। (চতুর্থ অধ্যায়ে এই সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রান্তিকের গানের স্কোয়াড গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠান করে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করতে থাকে। সেই সময় গানের পাশাপাশি জীবন ঘনিষ্ঠ নাটক মঞ্চায়নেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ১৪ অক্টোবর এনায়েত বাজারের ওয়াজিউল্লাহ রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সাথে 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে নারী শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল। নাটকে বেন্দার মার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কামেলা শরাফী (কামেলা খান মজলিশ), বেন্দার স্ত্রীর ভূমিকায় মণি ইমাম, হাসির মেয়ের ভূমিকায় নাজমা নাম্নী এবং বুবু।[৫] কলেজ ছাত্রী তালেয়া খান এই নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হলেও সামাজিক নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য মহড়া দিয়েও নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নাটকের মাধ্যমেই চট্টগ্রামের মঞ্চে নারী শিল্পীদের সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ ঘটে। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন :

> স্ত্রী চরিত্রে তখন পর্যন্ত কোনো মহিলা শিল্পীকে আমরা মঞ্চে নামাতে পারিনি। তার কারণও ছিল। আমরা যখন চট্টগ্রাম কলেজে পড়তাম তখন মোট ৮/৯ জন ছাত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন আনোয়ারা বেগম, তালেয়া খান, ফরিদা বারী মালিক, জেবুন্নেসা, মর্জিয়া বানু, সুলতানা। এদের মধ্যে বেশ ক'য়েকজন মাথায় ঘোমটা দিয়ে আসতেন, একজন আসতেন বোরখা পরে, আর একজন অবশ্য সেলোয়ার কামিজ পড়লেও মাথায় ছাতা দিয়ে আসতেন। তাই মঞ্চে ছেলেদের সাথে মেয়েরা নাটক করবে এটা কল্পনা করা যেত না। তবুও ভেতরে ভেতরে চেষ্টা চলছিল এই বেড়াটা কীভাবে ভাঙ্গা যায়। 'প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ' সুসংগঠিত করার পর এ বেড়া ভাঙ্গা সম্ভব হয়েছিল ১৯৫১ সালে। দু'জন মহিলা শিল্পী মঞ্চে অভিনয় করলেন। 'জবানবন্দি' নাটকে। এ দু'জন শিল্পী হলেন কামেলা শরাফী আর মণি ইমাম।[৭]

এই নাটক চট্টগ্রামের নাট্য কর্মীদের দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বছর খানেক পরে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ 'পথিক' নাটক মঞ্চস্থ করে। 'পথিক' নাটকে নারী শিল্পীদের মধ্যে অভিনয় করেছিলেন ফৌজিয়া সামাদ এবং মণি ইমাম।[৮] ফৌজিয়া সামাদ সেই সময়ে চট্টগ্রামের নারীদের সমাজ সচেতন করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি নারী সমিতি গঠন করেছিলেন।[৯] আর চট্টগ্রামে নাট্য আন্দোলনে যে কয়জন নারী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন মণি ইমাম। চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত শওকত ওসমান মণি ইমাম সম্পর্কে বলেন, "নারী ভূমিকায় নাটকে কোনো মুসলমান মেয়ে অভিনয় করবে তা কল্পনা করা যেতো না ১৯৪৮-৪৯ সনে। কাজী আলী ইমামের স্ত্রী বেগম মণি ইমাম সেদিক থেকে এদেশে নাট্যান্দোলনের ইতিহাসের অন্তর্গত। নমস্য মহিলা! অবিশ্বি!।"[১০]

প্রান্তিক নবনাট্য সংঘকে কেন্দ্র করে এভাবেই চট্টগ্রামের নারীরা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকেন। ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনও প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখে। কার্জন হলের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল 'বিভাব' এবং ২৬ এপ্রিল 'অরুণোদয়ের পথে' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এই দুটি নাটকেই অভিনয় করেছিলেন কামেলা শরাফী এবং মণি ইমাম।[১১]

মুসলিম লীগ সরকার ইতোমধ্যেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের লক্ষ্য করে প্রচণ্ড দমন নীতি গ্রহণ করলে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ড প্রায় থেমে যায়। কয়েক মাসের নিষ্ক্রিয়তার পর ১৯৫৫ সালের ১৭ জানুয়ারি মনোজ বসুর 'প্লাবন' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন মীরা সেন।[১২] এই সময় প্রান্তিকের কর্মীদের উপর সরকারি দমন নীতি চলতে থাকে। দেশের অশান্ত পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করা হয়। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকে থাকার কৌশল হিসেবে ১৯৫৬ সালে প্রান্তিকের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কৃষ্টি কেন্দ্র। কৃষ্টিকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুফিয়া কামাল। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন:

> যে কোনো দেশে যে কোনো জাতি উন্নত হয়েছে, ধ্বংসের পরে আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে, সেখানেই প্রথমে জেগেছে চারণ কবি, সাহিত্যিকের দল। অতীতের গাথা, বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে ফুটিয়ে তুলেছে চারণ, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের সংগ্রামী সাধনা, দুঃখ বিষাদ আনন্দের প্রেরণায় আবার মানুষের মন জেগে উঠেছে, গড়ে তুলেছে জাতি, ফিরিয়ে এনেছে ঐতিহ্য অতীত ও নবীনের সমন্বয়ে, এগিয়ে এসেছে যুগের পরিবেশে। আমাদের দেশ এখন নিদারুণ দীনতা, হীনতা ও অসাধুতার কালিমায় আচ্ছন্ন।... আমরা আশা করব, সুধী সজ্জন সমবেত মণ্ডলী মানুষের মনের দুয়ারে আনন্দের আঘাত দিয়ে আত্মচেতনার আবাহান জানিয়ে দিয়ে সুষ্ঠু সুন্দর করে মানব জীবনকে মহত্তর, কল্যাণকর পথের সন্ধান দান করে এ অনুষ্ঠান সার্থক সফল করে তুলবেন। ধন্য হব আমরা, পূর্ণ হবে আমাদের সমস্ত শূন্যতা।[১৩]

কৃষ্টি কেন্দ্রের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে অধ্যাপক আবুল ফজল ও আবুল হাসনাত।[১৪] কার্যকরী পরিষদে অন্যান্যের সাথে ছিলেন ফৌজিয়া সামাদ, বিলকিস নাসিরউদ্দীন, রওশন আরা রহমান।[১৫] রাজাপুকুর লেনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে কৃষ্টি কেন্দ্রের সাহিত্য বিভাগ, সংগীত বিভাগ এবং নাট্য বিভাগ চালু করা হয়। সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন শুধাংশু ভট্টাচার্য। সাহিত্য আসরেও নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। সাহিত্য আসরে নিয়মিত যোগ দিতেন আইনুন নাহার। নাট্য বিভাগে তৎপর ছিলেন মণি ইমাম, মীরা সেন। সংগীত বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন কলিম শরাফী। নতুন অনেক শিল্পী এ সময় কৃষ্টি কেন্দ্রে যোগ দেয়।[১৬] ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে শিল্পী সাহিত্যিকদের উপর চরম নির্যাতন শুরু হয়। এই নির্যাতনের ফলে কেউ কেউ অন্তরালে চলে যান আবার কেউ দেশত্যাগ করেন। ফলে কৃষ্টি কেন্দ্র আর খুব বেশি দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না।[১৭]

পঞ্চাশের দশকে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল সংগীত। সেই সময় উদীয়মান সংগীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জাহানারা বেগম এবং মালেকা আজিম।[১৮] এই সময়ে পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করতে ভূমিকা রেখেছিলেন রোকেয়া বেগম।[১৯] ষাটের দশকেও চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। মায়া হাজারিকা, নিলুফার বেগম, ইভা আলম, মণি ইমাম প্রমুখ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২০] পাশাপাশি ষাটের দশকে চট্টগ্রামে নাট্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন মীরা সেন, ছায়া রায়, সুপ্তি খাস্তগীর, শিল্পী দাশ, মীনু দাশ প্রমুখ।[২১] সমসাময়িককালে নৃত্যের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন স্বপ্না নন্দী, আলপনা নন্দী, জাহানারা, সুপ্রীতি চৌধুরী, পান্না, শোভা, আঙ্গুর, নাজমা, মুন্নি আলম, আইভী রহমান, ডলি, রেণু, ফরহাদ বানু, মাসুদা মনসুর, রোকেয়া আফতাব, নিশাত, ইসমৎ, ইলা মজুমদার প্রমুখ।[২২]

ষাটের দশকের শেষের দিকে '৬৯-এর গণআন্দোলনেও চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজসেবীরা এগিয়ে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমন্বয়ে

গঠিত ‘শিল্পী সাহিত্যিক-সংস্কৃতি সেবী প্রতিরোধ সংঘ’ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিশেষ করে গণ-সংগীত এবং নাটক পরিবেশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সংঘের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ লালদীঘির ময়দানে উন্মুক্ত মঞ্চে কয়েক লক্ষ দর্শকের সামনে গণসংগীত এবং নাটক ‘এবারের সংগ্রাম’ পরিবেশিত হয়। চট্টগ্রামের প্রায় সকল সংগীত শিল্পীরা গণসংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সালমা আহমদ, রাজিয়া শাহিদ, জুলিয়া মান্নান, শেফালী ঘোষ, চেমন আফরোজ কামাল, কল্যাণী ঘোষ, রোকসানা আহমদ, উমা চৌধুরী, রাহনুমা আফতাব, শামসুন নাহার বেবী প্রমুখ।[২৩] এভাবেই পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং আন্দোলনের সাথে নারীরা সম্পৃক্ত ছিলেন।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২)

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় সরকার প্রগতিশীল যে কোনো কার্যক্রমের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে এই পরিস্থিতিতে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ[২৪] যা সাম্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণায় সমন্বিত প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন। এই সংসদের সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। সূচনালগ্ন থেকেই এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সুফিয়া কামাল এবং লায়লা সামাদ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের কার্যক্রম চালু ছিল। ১৯৫২ সালের নির্বাহী কমিটিতে জয়নুল আবেদিন এবং আবদুল গণি হাজারীর সাথে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সুফিয়া কামাল। পরবর্তীসময়েও তিনি ১৯৫৪-৫৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একই সময়ে সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন লায়লা সামাদ।[২৫]

১৯৫২-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তবে পাক্ষিক সাহিত্যসভা ও বিশেষ সাহিত্যসভায় আলোচনা অনুষ্ঠানই ছিল এই সংসদের প্রধান কর্মতৎপরতা। যদিও কবি ও সাহিত্যিকদের পূর্ব নির্ধারিত রচনা ও আলোচনাই অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয় ছিল তবে এর সাথে গঠনমূলক তীব্র সমালোচনা অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জয়ন্তী উৎসব, বাংলা নববর্ষ পালন, বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক স্মৃতিচারণ, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা এবং নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি। এছাড়া এই সংসদের বিশেষ অবদান ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ। এই সংকলনের উৎসর্গপত্রে ও সম্পাদকীয়তে বাঙালির পৃথক জাতিসত্তার অস্তিত্বের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ১৫ এপ্রিল সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। ঐদিন বিচিত্রানুষ্ঠানের পাশাপাশি নৃত্যনাট্য ‘শকুন্তলা’ মঞ্চায়ন করা হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে লায়লা সামাদ লিখেছেন, “নববর্ষ পালনের উদ্যোগ নিয়েছিল হাসান [হাসান হাফিজুর রহমান] এবং আরও কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক। সেদিন সকালে সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হয় ও সংসদের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও নৃত্যনাট্য ‘শকুন্তলা’ মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা হয়। এই নৃত্যনাট্যটির পরিকল্পনা পরিচালনা ব্যবস্থাপনা এমনকি মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার সব কিছুর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর।”[২৬] লায়লা সামাদের পরিচালনায় মঞ্চস্থ নৃত্যনাট্যটি খুব প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ১৬ এপ্রিল *দৈনিক মিল্লাত* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, “নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজধানীর নাগরিকগণ এবারকার নববর্ষ পালনে যতগুলি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ কর্তৃক আয়োজিত এবং স্থানীয় মাহবুব আলী রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্য নতুনত্ব ও অভিনবত্বের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।”[২৭] ১৯৫৪ সালের ২৩-২৬ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে। ১৯৫৪ সালের ১০ মে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ফজলুল হক মিলনায়তনে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শামসুন নাহার মাহমুদ। ২৭ মে একই স্থানে নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়েছিল। একই বছর ১১ নভেম্বর সাহিত্য সংসদের প্রথম মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হল মিলনায়তনে। এই অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন হোসনে আরা। ১৪ নভেম্বর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মৃত্যুতে সাহিত্য সংসদ শোকসভার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের সাথে আলোচনায় অংশ নেন সুফিয়া কামাল। ১৯৫৫ সালের ১৫ এপ্রিল সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ঢাকা হল মিলনায়তনে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সুফিয়া কামাল। নববর্ষোৎসব উপলক্ষে একটি গীত-বিচিত্রা এবং শকুন্তলা নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়। নৃত্যনাট্যে মেনকার ভূমিকায় অঞ্জলি চক্রবর্তীর নাচ সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে।[২৮] একই বছর ৯ মে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ অন্যান্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সংযুক্তভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন সুফিয়া কামাল।[২৯]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কার্যক্রম খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এই সংগঠনকে কমিউনিস্ট প্রভাবিত মনে করা হতো বিধায় এর প্রতি সরকারি নজরদারি ছিল। *সওগাত* পত্রিকাকে এই সংগঠনের মুখপত্র ভাবা হতো তাই *সওগাত* অফিসে পুলিশ তল্লাশী চালায়। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধী কিছু না পেয়ে পুলিশ ফিরে যায়। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনামলে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের বিলুপ্তি ঘটে। সংসদের অনেক কর্মীরা তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন, অনেকে আবার অন্যান্য সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তবে এই সংসদের কার্যক্রম স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও এটি প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এবং বিকাশে ভূমিকা রেখেছিল যেখানে সুফিয়া কামাল, শামসুন নাহার মাহমুদ, হোসনে আরা, লায়লা সামাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অবদান রয়েছে।

প্রগতি মজলিস (১৯৫২)

১৯৫২ সালের প্রথমদিকে কুমিল্লার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতি মজলিস। প্রগতি মজলিসের সভাপতি ছিলেন অজিতনাথ নন্দী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ, সম্পাদক ছিলেন নূরুন্নবী এবং প্রধান সংগঠকের দায়িত্বে ছিলেন জালাল উদ্দিন সানু।[৩০] এই সংগঠনটি ভাষা আন্দোলনের আবহে গড়ে ওঠা পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করতে ভূমিকা রাখে। এই সংগঠনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের জন্য বক্তৃতা-বির্তক-আবৃত্তি-সংগীত-চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এছাড়াও রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী, নববর্ষ, ঋতু উৎসবসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত প্রগতি মজলিস। ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে এই সংগঠনের উদ্যোগেই কুমিল্লায় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। (চতুর্থ অধ্যায়ে এই সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠনটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ফাতেমা খায়ের, ফরিদা মীর্জা, ছালেহা খাতুন প্রমুখ। কুমিল্লায় ১৯৫৪ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[৩১]

বেগম ক্লাব (১৯৫৪)

নারীর অধিকার ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে ইতিপূর্বে বিভিন্ন নারী সংগঠন কাজ শুরু করলেও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার জন্য আগ্রহী নারীদের কোনো সংগঠন ছিল না। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত *বেগম* পত্রিকা (প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে কলকাতা থেকে) ও ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বেগম ক্লাব' পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার পটভূমি সন্ধান করলে দেখতে পাই দেশ বিভাগের পর সংস্কৃতি অনুরাগী মুসলিম নারীদের অনেকেই কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। শিক্ষিত নারীদের কেউ কেউ রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে তাদের সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রচেষ্টা চালানো সম্পর্কে চিন্তা

ভাবনা করছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-অনুরাগী নারীদের মিলনের নির্দিষ্ট স্থান ও সুযোগ তখনও ঢাকায় ছিল না। এই সময়ে ঢাকায় এসেছিলেন প্রখ্যাত মার্কিন নারী সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী মিসেস আইদা আলসেথ। তিনি সাপ্তাহিক *বেগম* অফিসও পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক নারী কবি সাহিত্যিক ও সমাজসেবী *বেগম* অফিসে একত্র হয়েছিলেন। আইদা আলসেথ *বেগম* পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগের সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হন এবং পূর্ব বাংলার নারীদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আরও নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর তিনি সমবেত নারীদের উদ্দেশ্যে একটি ক্লাব গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেখানে একত্র হয়ে নারীরা নানা বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারবে। তখন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন চিন্তা করলেন,"কলকাতায় যেমন নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও 'সওগাত সাহিত্য মজলিস' প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এবং সেখানে যেরূপ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের মিলন ঘটেছিল এবং যার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল বহু কবি-সাহিত্যিক, ঢাকায় মহিলাদের তদ্রুপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে হয়তো তারা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসবেন।"[৩২] এই চিন্তা থেকেই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এই বিষয়টি শামসুন নাহার মাহমুদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাকে এই ক্লাবের সভাপতি হতে অনুরোধ করেন। শামসুন নাহার মাহমুদ এই প্রস্তাবে আনন্দিত হয়ে সম্মতি প্রদান করেন। নারীরা এখানে এসে সাহিত্য ও সমাজসেবামূলক বিষয়ে আলোচনা করবে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। বেগম ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই ক্লাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নূরজাহান বেগম বলেন:

> বেগম এর সেবাব্রতকে আরও সুদূরপ্রসারী করার জন্যে, সাপ্তাহিক 'বেগম' এর লেখিকা, পৃষ্ঠপোষক ও অন্যান্য সাহিত্যিকার সমবায়ে একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজ চালানোর জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমিতির মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি ও উৎসবাদি উদ্‌যাপন করতে পারবো, অপরদিকে তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথাও সংঘবদ্ধভাবে চিন্তা করতে পারবো। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ও পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে।[৩৩]

এতদিন যেহেতু নারীদের জন্য এই ধরনের পৃথক কোনো ব্যবস্থা ছিল না তাই বেগম ক্লাব এদিক দিয়ে এই অভাব মোচন করতে পারবে বলে শামসুন নাহার মাহমুদ আশা করেন। বেগম ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের প্রগতিমনা নারী লেখক, সমাজসেবক, শিল্পী, নারী আন্দোলনের নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। দেশের নারী সমাজসেবী-সাহিত্যিক-শিল্পীদের পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান করা, মতবিনিময় করা এবং নারী প্রগতি মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে সম্মিলিত কর্মসূচি নেওয়ার জন্য 'বেগম ক্লাব' যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। নানা মত ও ধরনের সংগঠনের সদস্যরা বেগম ক্লাবে যুক্ত হয়েছিলেন।

বেগম ক্লাবের প্রাথমিক সদস্যবৃন্দ ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ (সভাপতি), নূরজাহান বেগম (সাধারণ সম্পাদক), সুফিয়া কামাল, বেগম মীজানুর রহমান, সৈয়দা ফাতেমা সাদেক, কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, হামিদা খানম, মহসীনা আলী, সাইদা খানম, কবি হোসনে আরা মোদাব্বের, হুসনা বানু খানম, লুলু বিলকিস বানু, মালেকা পারভীন বানু, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, সারা তৈফুর, জাকিয়া রশীদ, মাজেদা খাতুন, সারা খাতুন, বেগম আব্বাসউদ্দীন আহমদ, জাহানারা আরজু, মিসেস এস.এ. মজিদ, মোমতাজ বেগম, শাহজাদী বেগম, রোকেয়া আলী রেজা, মাজেদা আলী, সুফিয়া রহমান, লায়লা সামাদ, লিলি খান, আফিফা হক, সুফিয়া খানম, খাতুন সুফিয়া, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, বদরুন্নেসা আহমদ, সালেহা খান, মিসেস এন মজিদ, সালমা রহমান, মিসেস মাহে মুনীর আহমদ,

হাসনা রহমান, কুলসুম মজিদ, আনোয়ারা চৌধুরী, খোদেজা খাতুন, সাবেরা সাইদ, মিসেস বি.এ.খান, আকিকুননেসা আহমদ, ফাতেমা লোহানী, সালেমা খাতুন, তুবা খানম, নমিতা আনোয়ার, সাফিয়া খাতুন, নিলুফার বেগম, জাহান আরা করিম, রোকেয়া আনোয়ার, খালেদা ফ্যান্সি খানম, সুলতানা ইসলাম, মরিয়ম রশীদ, নূরজাহান মোর্শেদ, মাফরুহা চৌধুরী, লতিফা হিলালী, কাজী লতিফা হক, হোসনে আরা রশীদ, নাগির্স জাফর, মেহেরুন্নেসা ইসলাম, সেলিনা বাহার চৌধুরী, আমিনা মাহমুদ।[৩৪]

প্রকৃতপক্ষে বেগম ক্লাব ছিল দেশের নারী লেখক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মীদের মিলনস্থল।[৩৫] প্রথম দিকে মাসে একবার, পরের দিকে বছরে একবার নারী লেখকবৃন্দ সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। সে সময় ঢাকা শহর খুব বেশি বিস্তৃত ছিল না। পুরান ঢাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শান্তিনগর, পুরানা পল্টন, আজিমপুর এই ছিল সীমানা। এই এলাকার উল্লেখযোগ্য প্রগতিমনা নারীরা বেগম ক্লাবের মাধ্যমে পারস্পরিক মতবিনিময়ের পাশাপাশি নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন করতেন। নারীরা আলোচনা সভার জন্য মুকুল সিনেমা হল (পরবর্তীতে আজাদ হল), সদরঘাটের কাছাকাছি মহিলা পার্ক (করোনেশন পার্ক) ও বেগম ক্লাব এই তিনটি স্থানে সমবেত হতেন। বেগম ক্লাবে আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট নারীদের, শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের দেশ বিদেশের সাংবাদিকদের দেশের বিশিষ্ট নারী নেত্রী, লেখক, গায়ক ও শিল্পীদের সংবর্ধনা দেয়া হত।[৩৬]

ক্রমান্বয়ে বেগম ক্লাবের কর্ম পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে টিনের বেড়ানির্মিত ক্লাব ভেঙে গড়ে তোলা হয় পাকা দেয়ালঘেরা একটি মিলনায়তন, তার সাথে মঞ্চ। একটি লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৫ সালের ১৫ আগস্ট বেগম ক্লাবের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১০ মার্চ শনিবার ঢাকায় আগত শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বেগম ক্লাব ভবনে স্থানীয় বহুসংখ্যক নারী সাহিত্যিক ও সমাজসেবীর উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শান্তি নিকেতনের শিল্পীদের মধ্যে ইলা ঘোষ, সুপূর্ণা ঠাকুর, কণিকা বন্দোপাধ্যায়, উমা গান্ধী, ইলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, শিবানী গুহ, মিত্রা দত্ত, রীতা গাঙ্গুলী ও বেলা মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৭] কিন্তু ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকেই বেগম ক্লাবের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে যায় এবং স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কারণে এই ক্লাবটি আর তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনি। 'বেগম ক্লাব' ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেশের বহু নারী কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবীকে গুণীজন সংবর্ধনা দিয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন সারা তৈফুর, বদরুন্নেসা আহমদ, নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা সহ বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। এই ক্লাবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নারী জাগরণ, শিক্ষা, সমাজসেবা ও নারী প্রগতির জন্য আগ্রহী নারীগণ সম্মিলিত কর্মসূচি নিতে পেরেছিলেন যাকে বিশ শতকের বর্তমান সময়ের ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলনের একটি সূত্রপাত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কূপমণ্ডুক, পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজালে নারী-সমাজকে শৃঙ্খলিত রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার নানা পদক্ষেপ নিচ্ছিল। নারীসমাজের ওপর এসব আঘাত প্রতিহত করতে *বেগম* পত্রিকা ও বেগম ক্লাব তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।[৩৮]

অন্দরমহলের অন্ধকার থেকে এদেশের নারী সমাজকে বাইরের উদার আঙ্গিনায় নিয়ে আসা, কর্মক্ষেত্রের বিরাট মিছিলে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে দাঁড় করানো, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিল্প, সংস্কৃতির অঙ্গনেও নারীর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করার মানসেই ঘটেছে *বেগম* এর সচেতন, আত্মপ্রত্যয়ী আবিভার্ব। বলা যায় ১৯৪৭ সাল থেকেই বেগম এ দেশের নারীদের আত্মপ্রকাশের জন্য কাজ করেছে। বিশেষত ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় এ দেশের নারীসমাজের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধনা, নারী সমাজের বিভিন্ন খবর, নারী আন্দোলনের নানা বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ

করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, নারী সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার সুযোগ সৃষ্টি করা, গ্রাম বাংলার নারীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি বিষয়ে *বেগম* পত্রিকা এবং বেগম ক্লাবের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (১৯৫৫)

উপমহাদেশের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর[৩৯] স্মৃতি বিজড়িত এ প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। নৃত্যশিল্পে বুলবুল চৌধুরীর অসামান্য প্রতিভা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৫৫ সালের ১৭ মে বুলবুল চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মাহমুদ নূরুল হুদার বিশেষ উদ্যোগে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪০] সংক্ষেপে এটি বাফা (BAFA, Bulbul Academy For Fine Arts) নামে পরিচিত। কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা, চারু ও কারুশিল্পে শিক্ষাদান এবং শিল্প-সাহিত্য-সংগীতে গবেষণা পরিচালনা করাই এই একাডেমীর মূল লক্ষ্য।[৪১]

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। বুলবুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ ও এই বিষয়ে প্রচারের জন্য মাহমুদ নুরুল হুদার উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, বেগম হোসনেয়ারা, লায়লা সামাদ, নমিতা আনোয়ার, শান্তি নন্দী, মমতাজ বেগম, আমিনা মাহমুদ, সেলিনা মাহমুদ, মিসেস বি আহমেদ, সুফিয়া কামাল, নূরজাহান বেগম, সেলিনা বাহার, লুৎফুন্নেসা চৌধুরী, বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ ও বাসন্তী গুহঠাকুরতা। এই একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজে পরবর্তীসময়ে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন বুলবুল চৌধুরীর স্ত্রী আফরোজা বুলবুল[৪২], বেগম এম এ মজিদ, বেগম সানোয়ার আলী।[৪৩] এছাড়া বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, বেগম এন মজিদ, বদরুন্নেসা আহমদ, সেলিনা চৌধুরী এবং বাসন্তী গুহঠাকুরতা।[৪৪]

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রাথমিকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল নারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আফরোজা বুলবুল, মাহবুবা হাসনাত, লায়লা আর্জুমান্দ বানু। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ে অফিসের দাপ্তরিক কাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নামমাত্র পারিশ্রমিকে করে দিতেন সালেহা বেগম।[৪৫] প্রথমদিকের ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন নাসরীন চৌধুরী, ডালিয়া নীলুফার, লাইলি চৌধুরী, ডলি, আতিয়া, শাফিয়া খাতুন, বদরুননেসা আবদুল্লাহ প্রমুখ।[৪৬]

ক্রমান্বয়ে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর কর্মপরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। ১৯৫৫ সালের ১৮ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিয়ে তিন দিনব্যাপী একটি শিল্পী সম্মেলনের আয়োজন করে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী। এই সম্মেলন সফল করতে যারা কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আফরোজা বুলবুল, খালেদা ফ্যান্সী খানম, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, হুসনা বানু খানম, নমিতা আনোয়ার, মাধুরী চ্যাটার্জী, ফরিদা বারী মালিক, মাহবুবা হাসনাত, মেহেরুন্নেছা, হোসনে আরা, লায়লা সামাদ, প্রীতি আলমগীর, আমিনা মাহমুদ, সেলিনা বাহার, সেলিনা মাহমুদ, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, সালেহা বেগম। ১৮ নভেম্বর শুক্রবার বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বেগম রানা লিয়াকত আলী খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের সাথে বক্তব্য রেখেছিলেন আফরোজা বুলবুল, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী। সম্মেলন উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে একে একে উচ্চাঙ্গ সংগীত থেকে শুরু করে, যন্ত্রসংগীত, আধুনিক গান, লোকসংগীত, নৃত্য পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত

পরিবেশন করেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু (নজরুল সংগীত), হুসনা বানু খানম (আধুনিক), ফেরদৌসী বেগম (ভাওয়াইয়া), শীলা মজুমদার (লোকগীতি), সবিতা সেন রায় (রবীন্দ্রসংগীত), জাহানারা (আধুনিক)। এছাড়া বুলবুল চৌধুরীর মেয়ে নার্গিস এ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। কলকাতা থেকে আগত জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, সুখেন্দু গোস্বামী এবং দিপালী নাগ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশেন করেন। দুই হাজারের বেশি দর্শক মধ্যরাত পর্যন্ত এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এ অনুষ্ঠান সফল করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বাসন্তী গুহঠাকুরতা।[৪৭] সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন পাকিস্তানের শিল্পসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় দিকগুলোর উপর আলোকপাত করার লক্ষ্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে নৃত্য ও নাটকের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন আফরোজা বুলবুল। সেমিনারের পর বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর ছাত্রছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। পরদিন অর্থাৎ ২০ নভেম্বর বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর জন্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করে মাহমুদ নূরুল হুদাসহ অন্যান্যের বক্তব্যের মাধ্যমে শিল্পী সম্মেলন সমাপ্ত হয়।[৪৮]

পাকিস্তান শিল্পী সম্মেলনের পর ১৯৫৬ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর আমন্ত্রণে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য ও সংগীত শাখার একটি দল ঢাকায় এসে শ্যামা নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী নিউ পিকচার হাউজ মঞ্চে একাডেমীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' এবং 'প্রকৃতির লীলা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যর প্রধান চরিত্র প্রকৃতির ভূমিকায় ছিলেন অঞ্জলি চক্রবর্তী। প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় মেহের আহমেদ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মন্দিরা নন্দী। এ নাটকে রাহিজা খানম ঝুনুর চরিত্রটি ছিল চুড়িওয়ালার। আর দইওয়ালার ভূমিকা রূপ দিয়েছিলেন শাহেদা আহমেদ। এছাড়া গ্রামের মেয়েদের চরিত্রে অংশ নেন রাহিজা খানম, শীলা রায় চৌধুরী ও সেলিনা বাহার। নাটকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় কণ্ঠ দিয়েছিলেন যথাক্রমে লায়লা আর্জমুন্দ বানু এবং ফাহমিদা খাতুন। এছাড়া গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন নাসরীন এবং ডলি।[৪৯] অপর নৃত্যনাট্য 'প্রকৃতির লীলায়' অভিনয় করেছিলেন বাফার শিশু কিশোর শিল্পীরা। নাটকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ইমা ইদ্রিস, রওশন আরা, লাইলী চৌধুরী, ডালিয়া নীলুফার প্রমুখ।[৫০]

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে বাফার উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীনের নৃত্যনাট্য 'নকশী কাঁথার মাঠ'। এটা ছিল বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। এই নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে একাডেমী দেশে ও বিদেশে প্রভূত সুনাম অর্জন করে। নৃত্যনাট্যের অন্যতম প্রধান চরিত্রে ছিলেন রাহিজা খানম ঝুনু। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন লায়লা হাসান, ডালিয়া নীলুফার, নার্গিস মুর্শিদা, নীনা হামিদ, শাহীন চৌধুরী ডলি, জুবায়দা মাহবুব পান্না, সাহানা, নুরুন্নাহার চৌধুরী, সাহেলা চৌধুরী প্রমুখ। নৃত্যনাট্যের শুরুতে ধারা বর্ণনা পাঠ করেছিলেন নার্গিস আখতার।[৫১]

১৯৬১ সালে একাডেমী লোকসংগীত ও শিল্প উৎসবের আয়োজন করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সমৃদ্ধ লোকসংগীতকে তুলে ধরাই ছিলো এ উৎসবের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি ১৯৬২ পর্যন্ত মোট ৮ দিন এ অনুষ্ঠান হয়েছিল। প্রশিক্ষণ একাডেমী হলেও বুলবুল ললিতকলা একাডেমী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সরকার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতের ওপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলে খুব স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বাফার উপরও বর্তায়। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে এ সময়ে চিঠি লেখা হয়, যাতে বলা হয়, রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্য বিভাগ বন্ধ করা না হলে যেন বাফার

গ্রান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় বাফার পক্ষ থেকে মাহমুদ নুরুল হুদা বলেন, "রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র সংগীত বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্র সাহিত্য সংগীত ছাড়া বাংলার সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ। তাই সরকার যদি রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যকে বাফা থেকে বাদ দিতে বাধ্য করে তাহলে বাফার পক্ষ থেকে আমার মন্তব্য হলো, আমরা এগুলোকে বাদ না করে বরং বাফাই বন্ধ করে দেবো।"[৫২] বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ নেয় এবং সেই অনুষ্ঠান সফল করতে ভূমিকা রাখে। এই বিষয়টি বাফার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "উক্ত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে অদ্য রবিবার (৩ বৈশাখ, ১৩৬৮) হইতে একযোগে বুলবুল (ললিতকলা) একাডেমীতে ও ১১৩ নং সেগুন বাগানে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদান ও প্রয়োজনীয় মহড়া আরম্ভ হইবে। একাডেমীতে সপ্তাহে তিন দিন শুক্র, মঙ্গল, রবিবার এবং সেগুনবাগানে দুই দিন শুক্র ও রবিবার নিয়মিত বিকাল পাঁচটায় মহড়া অনুষ্ঠিত হইবে।"[৫৩] শিল্পীরা এর যে কোনো একটিতে যোগদান করে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে বলে একাডেমীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাফার উদ্যোগে ভক্তিময় দাশগুপ্তের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির ভূমিকায় অভিনয় করেন মন্দিরা নন্দী। প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় ছিলেন সেলিনা বাহার।[৫৪] প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় কণ্ঠ দিয়েছেন হামিদা ওয়াহাব এবং শিরীন বেগম। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অর্থাৎ রাজনন্দিনীর ভূমিকায় ছিলেন জিন্নাত গণি।[৫৫] এ সম্পর্কে তার স্মৃতিচারণ:

> ... সিদ্ধান্ত নেয়া হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে (১৯৬১) চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য বাফার উদ্যোগে মঞ্চস্থ হবে। ভাবী (আনোয়ারা বাহার চৌধুরী) বললেন আমাকে চিত্রাঙ্গদা ভূমিকায় অংশ নিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য তখন কঠোর পাকিস্তানী যুগ। এই সিদ্ধান্ত ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী পদক্ষেপ কেননা পশ্চিম পাকিস্তানী অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীর মন থেকে মুছে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। সরকারী চাকুরের স্ত্রী হিসেবে আমার পক্ষেও চিত্রাঙ্গদায় অংশ নেয়া ছিল এক সাহসী পদক্ষেপ। বলা বাহুল্য তৎকালীন মুখ্যসচিব (Chief Secretary) আমার স্বামী কুদরত গণিকে তার স্ত্রী রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য অর্থাৎ ভারতীয় কবির নাটকে কেন অংশ নিচ্ছেন এ প্রশ্ন করেন। যাই হোক নৃত্যনাট্যের নাম ভূমিকায় আরও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করলাম।[৫৬]

দুটি পরিবেশনাই খুব প্রশংসিত হয়। বাফার উদ্যোগে ১৯৬৪ সালের ১৪ ও ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'। নৃত্যনাট্যের প্রধান দুই চরিত্র প্রমদা এবং শান্তার ভূমিকায় ছিলেন রাহিজা খানম ঝুনু এবং ডালিয়া নীলুফার। সঙ্গীতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন নাসরীন চৌধুরী এবং তাজীন চৌধুরী। এই নাটকে আরও যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন ডালিয়া সালাউদ্দীন, মিলি কাজী, শামসুন নাহার, নাজমা চৌধুরী, শাহীন নাসের, নাসরীন রহমান, মিনি জাহানারা, নায়লা জামান, লাইলি চৌধুরী, শাহীন চৌধুরী ডলি প্রমুখ।[৫৭]

১৯৬৪ সালে বাফার সম্পাদক নিযুক্ত হন আনোয়ারা বাহার চৌধুরী।[৫৮] বাফার প্রতিটি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন তিনি। তার সম্পর্কে এম এ মোহায়মেনের স্মৃতিচারণ, "অনুষ্ঠানের উন্নতির জন্য বেগম বাহার সে সময় যে সময় দিতেন, যে পরিশ্রম করতেন সেটা সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। সে সময় মাসের পর মাস তিনি সপ্তাহের পাঁচ দিনই প্রায় পুরোটা সন্ধ্যা বাফায় কাটাতেন"।[৫৯] সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের মহড়া চলত। আনোয়ারা বাহার চৌধুরী সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে অভিভাবক হিসেবে সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এই ভরসাতেই অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের নাটকের মহড়ায় পাঠাতেন।[৬০]

১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র বিরোধিতার বিরুদ্ধেও বাফার ভূমিকা ছিল। এই সম্পর্ক মাহমুদ নূরুল হুদার স্মৃতিচারণ:

> ১৯৬৭ সালে শাহাবুদ্দীনের রবীন্দ্র আক্রমণের গণবিরোধিতায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী বিশেষ ভূমিকা রাখে। তখন আমরা কোনো কোনো সভায় সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে শাহাবুদ্দীন সাহেবের রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলাম। একই সঙ্গে প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা অধিক হারে রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলাম। ঐ বছর জুলাই মাসে মহাকবি স্মরণোৎসব নামে প্রতিবাদের যে প্রতীকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার প্রথম দিন (৫ জুলাই) ছিলো রবীন্দ্র দিবস। এ দিনে আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করি।[৬১]

রবীন্দ্রচেতনা প্রসারে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। বাফা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এগারটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছে।[৬২] পরিবেশিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে অধিকাংশ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই সকল নৃত্যনাট্যসমূহ হলো 'চণ্ডালিকা' 'প্রকৃতির লীলা', 'মায়ার খেলা' ,'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'। তাছাড়া বাফা নিয়মিতভাবেই রবীন্দ্র-নজরুল, বুলবুল চৌধুরী, আব্বাসউদ্দীন, জয়নুল আবেদিন প্রমুখ প্রয়াত কবি সাহিত্যিক, শিল্পীদের জন্ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন, বর্ষবরণ, বসন্ত উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস পালনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বাফা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করেছে। বাফা আয়োজিত এ জাতীয় বহু সেমিনারে বিভিন্ন সময়ে যারা উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহিত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুফিয়া কামাল।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠানোর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে তুলে ধরেছে। ১৯৬১ সালে বাফা তার সাংস্কৃতিক দল নিয়ে প্রথম বিদেশ সফর করে। এ সময়ে বাফার কর্মী ও শিল্পীগণ ইরাক ও ইরানের রাজধানী বাগদাদ ও তেহরানে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন। দেশ দুটোতে বাফার পক্ষ থেকে 'নকশী কাঁথার মাঠ' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করা হয়। এই সফরে নারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, রাহিজা খানম, লায়লা হাসান, ডালিয়া নীলুফার, লাইলী, রেজীন, শাহিদা আহমেদ, নুরুন নাহার খানম, শুক্লা রায় চৌধুরী, নীলুফার চৌধুরী, নার্গিস মুর্শিদা, মমতাজ খান, শাহানা চৌধুরী, নীনা খান, তাজীন চৌধুরী।[৬৩] বিভিন্ন সময়ে সরকারি অনুমোদনক্রমে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী এককভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল নিয়ে পাকিস্তান, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, নেপাল, বলিভিয়া, ওমান প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠান করে প্রশংসিত হয়। এই সফরগুলোতেও নারী শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সফরের সময় যে সকল নারী শিল্প সফরকারী দলের সাথে ছিলেন তারা হলেন ডালিয়া সালাহউদ্দীন, আসমা খাতুন, জিন্নাত আলী পলি, লুবনা মরিয়ম, লায়লা রফিক, রওশন আরা বেগম, রেশমা শারমীন, রীতা নাসরিন মাহমুদ, সাঈদা রহমান, নীলি রহমান, সেলিনা হোসেন, মিনু বিল্লাহ, আফরোজ জিলানী, রীতা শবনম, ঝর্ণা ব্যানার্জি, হামিদা আতিক। এর বাইরে সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন ডা. লতিফা আজিম।[৬৪] সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকারী দলে নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, রাহিজা খানম ঝুনু, ডালিয়া নীলুফার, লায়লা নার্গিস, নাসরীন চৌধুরী, লায়লা চৌধুরী, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, ফেরদৌসী রহমান।[৬৫]

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী এদেশের সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সংগীত এবং নৃত্যশিল্পকে জীবনের প্রতিচ্ছবি রূপে প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ব বাংলার রক্ষণশীল সমাজে সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই একাডেমী পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। বাফা প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম

উদ্দেশ্যও ছিল এটি। এই বিষয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, "বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দুটি বুলবুল চৌধুরীর স্মৃতি ও নৃত্যকর্মকে ধরে রাখা এবং দেশের এই অঞ্চলে নৃত্যগীত বাদ্যচর্চা সম্প্রসারিত করা।"[৬৬] বাফা ললিতকলার বিভিন্ন মাধ্যম যেমন: কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্যকলা, নাটক, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ললিতকলার বিভিন্ন শাখায় শিল্পী তৈরি করে সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গনে একাডেমী সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। লায়লা হাসান, রাহিজা খানম ও কাজল ইব্রাহিমের মতো নৃত্যশিল্পী এবং জাহেদুর রহিম ও পাপিয়া সারোয়ারের মতো রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী বুলবুল একাডেমীরই ছাত্রছাত্রী। এছাড়া বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শবনম (ঝর্ণা বসাক) এখানেই নৃত্যের তালিম নেন।[৬৭] মূলত প্রশিক্ষণ একাডেমী হলেও এ সংগঠনটি সমকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল। এই একাডেমীর পরিবেশিত নৃত্যনাট্যগুলো পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গতিশীল করেছে। এই একাডেমীর আরেকটি বড় অবদান ছিল সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতি চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে এই সংগঠন বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বার্থের পক্ষেই সবসময় কাজ করেছে। দেশের বাইরে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী কোনো সাংস্কৃতিক দল নিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য গেলে সেখানে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হতো। পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর অবদান অনস্বীকার্য। এই একাডেমীর প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল অনুষ্ঠানেই নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

পাকিস্তান লেখক সংঘ (১৯৫৯)

পাকিস্তানি জনসাধারণের জন্য উন্নততর অধিকতর সুখী ও আনন্দদায়ক এবং পূর্ণ ও অধিকতর সৃজনশীল ও সুনির্দিষ্ট জীবন অর্জন করার ঘোষণা নিয়ে ১৯৫৯ সালের ২৯-৩১ জানুয়ারি করাচীর গোয়ানিজ হলে সমস্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালও ছিলেন। সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবি জসীমউদ্দীন, দ্বিতীয় দিন মিসেস রোজী হুসাইন এবং তৃতীয় দিন সকালের অধিবেশনে মিসেস মোহাম্মদ হোসেন। সম্মেলনের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি সকালের অধিবেশনে পাকিস্তান লেখক সংঘ বা Pakistan Writers Guild গঠিত হয়।[৬৮] পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠার পর করাচি, লাহোর ও ঢাকায় এই সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের ঢাকা শাখা তিনটি সাহিত্য সভার আয়োজন করে। প্রথম সাহিত্য সভার বিষয়বস্তু ছিল 'সাহিত্যে মীর মোশাররফ হোসেনের অবদান'। এই বিষয়ে আলোচনা করেন সৈয়দ মুর্তজা আলী, মুনীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামানসহ আরও অনেকে। দ্বিতীয় সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয় ৭ এপ্রিল এবং এখানে সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই সভায় 'পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য সমস্যা' বিষয়ে আলোচনা করেন সৈয়দ আলী আহসান। পরবর্তী আলোচনা হয়েছিল সামাজিক কুসংস্কার ও তার প্রতিকার বিষয়ে। সামাজিক নানা প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখকদের মুক্তমনা হওয়ার বিষয়ে প্রসঙ্গের অবতরণা করেন আবুল হাসনাত। এই বিষয়ে অন্যান্যের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শামসুন নাহার মাহমুদ এবং জোবেদা খানম।[৬৯]

১৯৬২ সালে করাচিতে পাকিস্তান লেখক সংঘ বা রাইটার্স গিল্ডের নির্বাচনের সময়ই এর অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দেখা যায়। ফলে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা স্বতন্ত্র মর্যাদায় আত্মপ্রকাশ করে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ সাহিত্যিকদের পরাজয়, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিকদের বিজয়। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চেতনার সমর্থকদের বিজয় হয়েছিল, যদিও সে বিজয় সম্পূর্ণভাবে নিরঙ্কুশ ছিল না। ১৯৬২ সাল থেকেই পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে

নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার মাধ্যমে পরিচালিত হতে শুরু করে। তবে ১৯৬২-১৯৬৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার কার্যক্রম *পরিক্রম* পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৬৮ সালের ৫-৯ জুলাই ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে মহাকবি স্মরণোৎসব এর আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপমহাদেশের বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের পাঁচজন কবিকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। এই পাঁচজন কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধপাঠ, রচনা হতে পাঠ, আলোচনা, আবৃত্তি, বিভিন্ন প্রকার সংগীত, নাটক ও নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন আলোচনা পর্ব শেষে অন্যান্যের সাথে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন ফাহমিদা খাতুন, মালেকা আজিম এবং জাহানারা ইসলাম। একই দিন বুলবুল ললিতকলা একাডেমী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' পরিবেশিত হয়।[৭০] অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের সংগীত পর্বে কবি আল্লামা ইকবালের গজল পরিবেশন করেন ফিরোজা বেগম এবং লায়লা আর্জুমান্দ বানু।[৭১] স্মরণ উৎসবের তৃতীয় দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে মির্জা গালিবের গজল পরিবেশিত হয়। গজল পরিবেশন করেন ফিরোজা বেগম এবং লায়লা আর্জুমান্দ বানু। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষপর্বে সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় মুশায়েরা।[৭২] এছাড়া শেষ দিনের সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, ফিরোজা বেগম এবং রওশন আরা মাসুদ। ঐদিন বুলবুল ললিতকলা একাডেমী গীতিনৃত্যনাট্য 'বাদল বরিষণে' পরিবেশন করে।[৭৩] এ উৎসবের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সদস্যরা নিজেদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করতে সক্ষম হন। তারা মূলত সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বাঙালির সংস্কৃতি চর্চার প্রগতিশীল ধারাকেই বেগবান করেন।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বেশ কিছু দিন এই সংগঠনের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে যায়। পরবর্তীসময়ে ১৯৭০ সালের ১২ এপ্রিল বাংলা একাডেমিতে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন কবীর চৌধুরী। অন্যান্যের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন রাজিয়া খান আমিন। এরপর ৮ মে বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে এই শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়।[৭৪]

পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের মধ্যে অনেকেই এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাদের কেউ কেউ সরাসরি এই সংগঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবার কেউ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে সংগঠনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুন নাহার মাহমুদ, জোবেদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, খোদেজা খাতুন, জাহানারা ইমাম, রাজিয়া খান এবং উম্মে আমারা।[৭৫]

ছায়ানট (১৯৬১)

সংস্কৃতি চর্চায় দেশিয় ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমুখী হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। পাকিস্তানে সামরিক শাসন শুরু হলে সংস্কৃতিচর্চা অনেকটাই স্তিমিত ও অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান পালনের প্রয়াস গ্রহণ করা হলে সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশব্যাপী প্রবল উৎসাহের সাথে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন সংস্কৃতি জগতে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এরই পরম্পরা হিসেবে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পেশার সাথে জড়িত সংস্কৃতিমনা কিছুসংখ্যক ব্যক্তিত্ব একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের ফলেই গড়ে উঠেছিল ছায়ানট। ছায়ানটের শুরুর কথা বলতে গিয়ে সন্‌জীদা খাতুন বলেন:

শতবার্ষিকী পালন করবার পরে ৩১ নং র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের সিধু ভাই (মোখলেসুর রহমান), রোজবু (শামসুন্নাহার রহমান), গোপীবাগের আহমেদুর রহমান (ইত্তেফাকের ভীমরুল), ছানা (মীজানুর রহমান), মানিক (সাইফউদ্দীন আহমেদ), আরও অনেকে, অন্যান্য অঞ্চল থেকে সুফিয়া কামাল, সাইদুল হাসান ও ফরিদা হাসান, ওয়াহিদুল হক এবং আরো বহু কর্মী একত্র হয়ে বনভোজনে যাওয়া হল একদিন জয়দেবপুরে। সেখানেই বসে বিকেল বেলায় সভায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য সমিতি গঠন করা হল। ছায়ানটের জন্মকথা এই। সংগঠনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেরণা হলেও ছায়ানট সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলবার জন্যে।[৭৬]

ছায়ানট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর এর প্রথম সভাপতি হন সুফিয়া কামাল, সম্পাদক হন ফরিদা হাসান। নারীদের মধ্যে যারা এই সংগঠনের শুরু থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন শামসুন্নাহার রহমান, সন্‌জীদা খাতুন, সায়েরা মহিউদ্দীন, হোসনে আরা, রোকেয়া রহমান কবীর, নূরুন্নাহার আবেদীন প্রমুখ। পরবর্তীসময়ে যারা ছায়ানটের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইফফাত আরা দেওয়ান।

ছায়ানটের প্রথম অনুষ্ঠান পুরোনো গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে। এই অনুষ্ঠানে বাংলার বিশিষ্ট সুরকার-গীত রচয়িতাদের সংগীতের ভিতর দিয়ে বাঙালি ঐতিহ্যের স্মরণ করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন আবদুল আহাদ। সংগীত পরিবেশন করেছিলেন ফেরদৌসী রহমান। তিনি কানন বালার গাওয়া বিদ্যাপতির রচনা 'অঙ্গনে আওব যব রাসিয়া' এবং হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের 'রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা' গান দুটি পরিবেশন করেন। প্রথম অনুষ্ঠানের পর নানা সাংগঠনিক অসুবিধার কারণে ছায়ানটের কাজ কিছু দিন বন্ধ থাকে। পরবর্তীসময়ে ঘরোয়া আসরে গান পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়, অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'শ্রোতার আসরে'। 'শ্রোতার আসরে'র প্রথম অধিবেশনে শিল্পী ছিলেন ফিরোজা বেগম, দ্বিতীয় অধিবেশনে ফাহ্‌মিদা খাতুনের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হয় এবং পরবর্তী অধিবেশনে বসেছিল উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর।[৭৭] ধীরে ধীরে 'শ্রোতার আসরে' অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় হতে থাকে। এই অনুষ্ঠানেই শিল্পী হিসেবে এসেছিলেন ইলা মজুমদার, মালেকা আজিম খান।[৭৮] ছায়ানটের পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল বসন্ত ঋতুবরণ উৎসব। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন শিল্পী জাহানারা বেগম, ফুলঝুরি খানসহ আরও অনেকে। সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন:

> উন্মুক্ত অঙ্গনে প্রকৃতির কাছাকাছি হয়ে বসন্ত ঋতুবরণ করা হল একবার। শহিদ মিনারের বিপরীতে অবস্থিত যে পুকুরটি কিছুকাল আগে ভরাট হয়েছে, তার অপর পাড়ে ছিল সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্টের বাড়ি, সে বাড়ির গাড়ি-বারান্দার গা ঘেঁষে হল মঞ্চ। পিছনে ঝুলানো সাদা চাদর। শক্ত কাগজ কেটে ফুল তৈরি করে আলোর সাহায্যে তারই ছায়া দোলানো হল চাদরে। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিল আর্ট ইন্‌স্টিট্যুটের ছাত্র শামসুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে দূর থেকে ভেসে এল রেকর্ডে গাওয়া আবদুল করিম খাঁর বসন্তের রাগালাপ। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মঞ্চে বসন্তের আবাহনী আলাপ করলেন রাগসংগীতের শিল্পী জাহানারা বেগম। এরপর পর্যায়ক্রমে সমবেত ও একক কণ্ঠে গান, কখনো আবৃত্তি। সুর থেকে সুরান্তরে নিয়ে যাবার জন্য শান্ত নিমগ্ন ভঙ্গিতে এস্রাজে ছড় চলাচ্ছেন দক্ষ সঙ্গতিয়া ফুলঝুরি খান। অনুষ্ঠানশেষে শিল্পীরা 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে, বনে বনে' গাইতে গাইতে শ্রোতাদের মাঝে নেমে গিয়ে ধীরে ধীরে পুকুরের ধার পর্যন্ত এগিয়ে গান শেষ করলেন। দর্শক- শ্রোতাদেরকেও শিল্পীরা এইভাবে তাদের বসন্ত উৎসবের সঙ্গী করে নিলেন।[৭৯]

এই সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ১৯৬৩ সালের (বাংলা ১৩৭০) পহেলা বৈশাখে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তন'। অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হলেন মতিয়র রহমান খান (মতি মিঞা)। নজরুলগীতি বিভাগের জন্য প্রখ্যাত শিল্পী সোহরাব হোসেন, তবলায় বজলুল করিম এবং

রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক হিসেবে ফরিদা বারী মালিক এবং সন্‌জীদা খাতুনকে নিয়ে ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তনের কার্যক্রম শুরু হয়। এই বিদ্যায়তনের প্রথম দিকের ছাত্রী ছিলেন সেলিনা মালেক চৌধুরী, ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান, সাদিয়া আফরিন মল্লিক।[৮০]

ছায়ানট প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যায়তন বছরে অনেকগুলো অনুষ্ঠান করত। প্রথমে পুরোনো বাংলা গানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তারপর ঋতু উৎসবের প্রবর্তন, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি। এর বাইরে রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী ও নজরুল জন্মতিথি ছায়ানটের দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ছায়ানটের প্রথম শারদোৎসব হয়েছিল বল্‌ধা গার্ডেনে। সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিচারণ:

> শরতের প্রভাতকে মনের মধ্যে নেবার বিশেষ অনুষ্ঠান হতো বলধা বাগানে। ঘাট-বাঁধানো পুকুরটিকে ঘিরে গানের দল 'দেখো দেখো শুকতারা' গাইতে গাইতে সুশৃঙ্খল পদচারণা করে এসে জড়ো হতো ঘাটে। সেখানে প্রারম্ভিক শ্রেণির ছেলেমেয়েরা 'কেয়া পাতার নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে/তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে' গেয়ে ফুল দিয়ে সাজানো নৌকা ভাসাত। তারপর শ্রেণিবদ্ধভাবে বসে শরতের গান গাওয়া হতো– কখনো একক কণ্ঠে, কখনো সমবেত। ছোট্ট ইফফাত (ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান) এই অনুষ্ঠানেই প্রথম একক গান গেয়েছিল 'কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে'। গান গাইবার আগে গানের মানে বুঝবার জন্যে সে কী তার ব্যস্ততা, না হলে গানে ভাব ফুটিয়ে তুলবে কী করে। অনুষ্ঠানের শেষে চিড়ের মোয়া, নারকেলের নাড়ু, আর মুড়ি-মুড়কি খাওয়া হতো অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে। আনন্দমুখর সমাবেশ হতো শারদোৎসবের দিনটিকে উপলক্ষ করে।[৮১]

এছাড়া হতো বর্ষামঙ্গল। এ আসর কখনো হতো ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলের হলঘরে কখনো লেডিস ক্লাবের হলে। বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণ করে তখনকার ছাত্রী এবং পরবর্তীসময়ে ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান বলেন, "ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলে একবার বর্ষামঙ্গল হয়েছিল। সোহরাব ভাই আমাদেরকে দুটা নজরুলগীতি শিখিয়েছিলেন 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু', আর 'মেঘমেদুর বরষায় কোথা তুমি'। গান দুটোর সঙ্গে নাচ ছিল অনুষ্ঠানে। শারমিন হাসান আর বাবলি আপা নেচেছিলেন। আমরা সবাই সবুজ শাড়ি পরেছিলাম।"[৮২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে ছায়ানট বরাবরই দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্মরণে ছায়ানটের বড় অনুষ্ঠান হয়েছিল **১৯৬৫** সালের বাইশে শ্রাবণে। শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে যে সকল নারী ঢাকা থেকে শিলাইদহে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুফিয়া কামাল, ফিরোজা বারী, সন্‌জীদা খাতুনসহ আরও অনেক সংগীতশিল্পী। কুঠি প্রাঙ্গণের পূর্বদিকের আমবাগানে চৌকি পেতে শুরু হয়েছিল প্রভাতি অধিবেশনের সংগীত ও পাঠ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে দলে দলে লোক এসেছিল এই অনুষ্ঠানে। বিকালের আসরে কীর্তন, বাউল সুরের গান এবং মাঝে মাঝে সমবেত সংগীত পরিবেশন করা হচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে অনুষ্ঠান মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষে কবি সুফিয়া কামালকে এক নজর দেখার আরজি জানিয়েছিলেন গ্রামবাসী। এই প্রীতির জন্য কুঠিবাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে সুফিয়া কামাল তাদেরকে অশ্রুসজল চোখে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।[৮৩]

ছায়ানটের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান বা অবদান হল বৈশাখ বরণ। **১৯৬৩** সালের পহেলা বৈশাখে 'ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তন'এর উদ্বোধন হয়েছিল। তাই **১৯৬৪** সালের এপ্রিলে বিদ্যায়তনের বর্ষপূর্তি আর বাৎসরিক পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণের জন্য ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলের কৃষ্ণচূড়াগাছের নিচে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কৃতী ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকেরা বর্ষবরণের গানও গেয়েছিলেন। **১৯৬৫** সালের ওই দিনে ঈদ-উল আজহা থাকায় সে বছর আর কোনো অনুষ্ঠান হয়নি।

১৯৬৬ সালে আবার বিদ্যায়তনের বছর শেষের অনুষ্ঠানে নববর্ষের কিছু গান গাওয়া হল। কিন্তু বছর দুয়েক পার হবার পর বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন আর এই দিনে করা হতো না। ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানট রমনার অশ্বত্থতলে বর্ষবরণ উৎসব শুরু করে। স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন সন্‌জীদা খাতুন:

> ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হলো রমনার নববর্ষ অনুষ্ঠান। বড়ো গাছটি বটবৃক্ষ নয়, অশ্বত্থ। চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা হাতে লিখে কিছু আমন্ত্রণপত্র তৈরি করল। আমন্ত্রণের কথাগুলো লিখতে গিয়ে বেকায়দা হলো। রমনার 'অশ্বত্থতলায়' লিখতে ভালো লাগল না। লিখলাম 'বটমূলে'। শুনতে ভালো লাগে না? গাছের নামকে ন্যায্যতা দিতে, পরে অভিধান ঘাঁটা হলো। মিলেও গেল মনমতো ব্যাখ্যা। পাওয়া গেল 'অশত্থ বট বিল্ব আমলকী অশোক এর বন হলো পঞ্চবটী। তো, পঞ্চবটের সমাহারে যদি অশ্বত্থ আর বট দুটোই থাকে, তবে যে অশ্বত্থ, সে-ই বট! বরাবরই নতুন বছরের আগমনে নব জাগরণের গানই হয়ে এসেছে। প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে, 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও/আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও'। দ্বিতীয় 'ধুইয়ে দাও' এর সুরে চেতনাকে সমুজ্জ্বল করবার আবেদন ক্রমে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। প্রথম দিক থেকেই আরো একটি গান মানবমঙ্গলযাত্রার আহ্বান হিসেবে গীত হয়ে এসেছে। সেটির প্রথম ছত্র 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'। এ আনন্দ উদ্দীপ্ত নবযাত্রার। নিদ্রার আলস্য ছেড়ে মানবসমাজের কাজে অগ্রসর হবার ডাক এই গানে। সরল সবল আনন্দমনে অমল অটল জীবনে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাবার বলিষ্ঠ শপথ। দ্বিতীয় গানটি বুঝিয়ে দেয়, কেবল নতুন দিনের জন্য উচ্ছ্বাস ছায়ানটের লক্ষ্য ছিল না। সাতষট্টি সাল থেকে এযাবৎকাল দেশের যত দুর্গ্রহ, যত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি প্রতিরোধের গান গেয়ে চলেছে ছায়ানট।[৮৪]

সেই সময়ে নববর্ষ শুধু আনন্দ উৎসব ছিল না বাঙালির কাছে। নববর্ষের প্রভাতে ছায়ানট বাঙালির আত্ম-আবিষ্কার, আত্মপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে একতাবদ্ধ হবার বাণী পৌঁছে দিয়েছে জাতির অন্তরে। মানুষ কেবল গান শুনতে আসেনি, স্বাজাত্যবোধে মিলতে এসেছে পরস্পর। পয়লা বৈশাখ জাতি ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিকে এই বটমূলে টেনে এনেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে এই মহামিলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পেরেছিল ছায়ানট।[৮৫]

১৯৬৯ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। একই বছর পাঁচ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে প্রথম সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিতীয় দিন নজরুলগীতি, তৃতীয় দিন দেশাত্মবোধক গান, চতুর্থ দিনে পুরোনো বাংলা গান, পঞ্চম দিনে উচ্চাঙ্গসংগীত। এই অনুষ্ঠানে যে সকল শিল্পী যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আফসারী খানম, ফেরদৌসী রহমান, ফাহ্‌মিদা খাতুন, মালেকা আজিম খান, রওশন আরা মাসুদ, জাহানারা ইসলাম প্রমুখ। এই উৎসব সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। প্রতিদিন আসরের শেষে সাইক্লোস্টাইল করে একটি গান দর্শকদের হাতে পৌঁছে দেয়া হতো। দর্শকরা দাঁড়িয়ে মঞ্চের শিল্পীদের সাথে গলা মিলিয়ে এই গানগুলি গাইতেন। রবীন্দ্রসংগীতের আসর শেষে, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' নজরুল গীতির আসর শেষে, 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু' দেশাত্মবোধক গানের আসরের শেষে 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' এই গানগুলো সমবেতভাবে গাওয়া হত।[৮৬]

এর বাইরে পূর্ব বাংলার যে কোনো সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটে ছায়ানট তার আপন ক্ষেত্র থেকে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে আইয়ুব রাজবিধ্বংসী 'আগুন জ্বালো' আন্দোলনের সময় প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখায় আলোকিত আকাশের নিচে ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলের প্রাঙ্গণে ছায়ানট উদ্দীপনামূলক গানের অনুষ্ঠান করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'আমার সোনার বাংলা', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' সহ অন্যান্য গান গাইতে গাইতে শহিদদের কবরে এবং শহিদ মিনারে

পুষ্পার্ঘ্য দিয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ছায়ানট শহিদ মিনারে গানের আসরের আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তবাদী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই অনুষ্ঠানে গুরুসদয় দত্ত রচিত ব্রতচারীর গান থেকে শুরু করে "মানুষ হ' মানুষ হ' আবার তোরা মানুষ হ'/অনুকরণ খোলস ভেদি কায়মনে বাঙালি হ", 'বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণ দল' ইত্যাদি গান পরিবেশন করা হয়।

ছায়ানটের এই পথচলা মোটেও সহজ ছিল না। ছায়ানট অনেক বার সরকারি রোষানলে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ প্রাদেশিক সরকারকে ছায়ানট বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। গর্ভনর মোনায়েম খান জনশিক্ষা বিভাগকে ঘন ঘন তাগাদা দিয়ে ছায়ানটের প্রকৃত পরিচয় জানতে চান। ছায়ানটের ব্যয় নির্বাহ হয় কীভাবে এই বিষয়েও অনুসন্ধান করা হয়। এমনকি আগরতলা 'ষড়যন্ত্র' মামলার সঙ্গেও ছায়ানটকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চলে।[৮৭] ক্ষমতাসীন প্রশাসনের বিভিন্ন বিধি নিষেধের সম্মুখীন হয়েছিল ছায়ানটের কর্মকর্তারাও। সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে সন্‌জীদা খাতুনকে ঢাকা থেকে রংপুরে বদলি করা হয়েছিল। রংপুরে থাকাকালীনও তিনি ছায়ানটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে ঢাকায় পাঠাতেন। লিখেছেন সন্‌জীদা খাতুন, "রংপুরে থাকতে ছায়ানটের কবে কোন অনুষ্ঠান হবে পরিকল্পনা করে পাঠাতাম, ওয়াহিদুল মহড়া দিয়ে গুছিয়ে তুলতেন। টেলিভিশন প্রোগ্রাম করতে ঢাকাতে আসতে হতো, একই সঙ্গে ছায়ানটের অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শেষে মঞ্চায়ন করে ফিরে যেতাম।"[৮৮] এভাবেই সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ছায়ানট তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ছায়ানট সংস্কৃতি ও সংগীত চর্চায় এদেশীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলেছে সব সময়। ছায়ানটের প্রথম দিককার ছাত্রী সাদিয়া আফরিন মল্লিক এর ভাষায়, "এদেশের বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছায়ানট। আর আমরা সকলেই যেন এক একটি খুদে সৈনিক এর চালিকাশক্তি। বাঙালিপনার যা কিছু সুন্দর তা পিঠা-পায়েস, আটপৌরে সুতি শাড়ি থেকে আমাদের পঞ্চকবি আর বাউলের গান, সবই আমরা ভালোবাসতে শিখেছি ছায়ানটের কাছে।"[৮৯] ছায়ানট বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ভূমিকা রেখেছে। ছায়ানটের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নারীরা। সুফিয়া কামাল এবং সন্‌জীদা খাতুন ছিলেন এই সংগঠনটির অন্যতম প্রাণশক্তি। ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তনের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ানের স্মৃতিচারণেও এই বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

> ছায়ানটের অনুষ্ঠান অনেক যত্ন করে পরিকল্পনা করতেন সন্‌জীদা আপা ও ওয়াহিদ ভাই। কত সুন্দর, মনোগ্রাহী করা যায় এ নিয়ে তাঁরা খুঁটিনাটি ভাবতেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিটি অনুষ্ঠানই হয়ে উঠত নতুন। ... সুফিয়া খালাম্মা ছিলেন ছায়ানটের মাতৃস্থানীয়। সকল কর্মকাণ্ডে, সবসময় আমাদেরকে শক্তি যুগিয়েছেন। তাঁর স্নেহ-মমতায় আমি স্নাত হয়েছি, হয়েছেন ছায়ানটের সবাই।[৯০]

এছাড়াও ছায়ানটের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন শামসুন্নাহার রহমান, ফরিদা হাসান, হোসনে আরা, রোকেয়া রহমান কবীর, নূরুন্নাহার আবেদীন, ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ইফফাত আরা দেওয়ান, সেলিনা মালেক, সাদিয়া আফরিন মল্লিক, তামান্না, ফ্লোরা, সেলিনা হক, উর্মি রহমান, বাবলি, মীনাক্ষি, ডালিয়া, সাকি, শাহীন, নীনা, রীতা, বানু, বিবি, পারভীন, স্বাতী, নার্গিস, অঞ্জলি প্রমুখ। এর বাইরে ছায়ানটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ফেরদৌসী রহমান, ফিরোজা বেগম, ফাহ্‌মিদা খাতুন, ইলা মজুমদার, মালেকা আজিম খান, জাহানারা বেগম, ফরিদা বারী মালিক, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আফসারী খানম, রওশন আরা মাসুদ প্রমুখ।

ছায়ানট জনসাধারণের মাঝে যেমন সুরুচি প্রসারে সহায়তা করেছে তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছে। ছায়ানট যেহেতু সংস্কৃতি ও সংগীত চর্চায় এদেশীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলেছে সব সময়, সেহেতু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় এদেশীয় সংস্কৃতি, গান প্রভৃতি গণমানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এদেশের বাঙালি সংস্কৃতির পরিশীলিত রূপ সংরক্ষণ ছায়ানটের লক্ষ্য হলেও ছায়ানট বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে সংস্কৃতিও যে বড় ধরনের মাধ্যম তাও স্পষ্ট করেছে ছায়ানট।

করতোয়া সাংস্কৃতিক সংসদ (১৯৬২)

বগুড়ার এই আঞ্চলিক সংগঠনটি গণসংগীত চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে বগুড়ার শিল্পী মহলে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সালে লুৎফর রহমান সরকারের সভাপতিত্বে গঠিত হয় করতোয়া সাংস্কৃতিক সংসদ। এই সংগঠনের সাথেও নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল। শুরু থেকেই এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন চায়না মুখার্জী, বকুল, জলি, রঞ্জনা, হোসনে আরা প্রমুখ।[৯১]

ঐকতান (১৯৬৩)

১৯৬৩ সালে সংস্কৃতিসেবী নাসির উদ্দিন, শহীদ উদ-দাহার, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী আতিকুল ইসলাম, ফারুকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক সংগঠন ঐকতান। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনই ছিল এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। এটি মূলত সংগীত নির্ভর ও অনুষ্ঠানভিত্তিক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ব বাংলায় সংস্কৃতি ও সংগীত চর্চায় ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে এ সংগঠনের ভূমিকা স্বল্পকালীন হলেও গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগীত গোষ্ঠীর গানের আসরের নিয়মিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মাসুমা খাতুন, মালেকা আজিম খান, জাহানারা ইসলাম, নাসরীন চৌধুরী, লাইলী চৌধুরী, তাজীন চৌধুরী, আজিজা চৌধুরী প্রমুখ।[৯২]

সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় (১৯৬৩)

১৯৬৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর খুলনার শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক সকলের প্রচেষ্টায় গণসংগীত প্রতিষ্ঠান সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৩] প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংগঠনটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন জাহানারা বেগম।[৯৪] এই সংগঠন প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক আসরের আয়োজন করতো যেখানে গল্প, কবিতা পাঠ এবং সংগীত চর্চা করা হতো। সুরকার সাধন সরকারের সংগীত পরিচালনায় এবং নাজিম মাহমুদ ও কবি আবু বকর সিদ্দিকের লেখা গণসংগীতের মাধ্যমে সন্দীপনের অনুষ্ঠানগুলো তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতাবাদী আর্দশে উদ্বুদ্ধ এই সংগঠনটি নানামুখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে গণমানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

নজরুল একাডেমী (১৯৬৪)

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে করাচির প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায় নজরুল একাডেমী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন যদিও সে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৬১ সালে আমীর হোসেন চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরাম নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তবে এই সংগঠনের কার্যক্রম প্রতিবছর নজরুল জয়ন্তী পালন এবং ইংরেজি ভাষায় দু'একটি পুস্তিকা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬৪ সালে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কবি তালিম হোসেন, অ্যাডভোকেট এ কে এম নূরুল ইসলাম এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন আবু সাঈদ চৌধুরী। এই বছরই ২৪ মে র‍্যাংকিন স্ট্রীটে এ. কে. এম নূরুল ইসলামের বাসায় আবু সাঈদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে নজরুল জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানেই নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় এবং একটি সাংগঠনিক কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটিতে নারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া কামাল, জাহানারা আরজু, মাফরুহা চৌধুরী।[৯৫] এরপর দীর্ঘদিন প্রস্তাবিত নজরুল একাডেমীর কোনো প্রকার কার্যক্রম লক্ষ করা যায় না। অবশেষে ১৯৬৭ সালের ২৭ আগস্ট সাংগঠনিক কমিটির এক সভায় একাডেমীর গঠনতন্ত্র প্রণীত হয় এবং পরবর্তী সভায় সেই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন করা হয়। এই কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী সদস্য হিসেবে ছিলেন জাহানারা আরজু এবং মাফরুহা চৌধুরী এবং পরবর্তীকালে পরিষদে ফেরদৌসী রহমানকে কো-অপ্ট করা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ২৪ মে একাডেমীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও নজরুল জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।[৯৬] এরপর ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে একাডেমীর উদ্যোগে হামদনাত জলসা অনুষ্ঠিত হয়। একই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের গ্রান্ড বল রুমে নজরুল একাডেমী এক সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু। এ সম্পর্কে *মাহে নও* পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে বলা হয় "...একাডেমীর সংগীত বিভাগের অধ্যক্ষ লায়লা আর্জুমান্দ বানুর কুশলী কণ্ঠ, 'শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না' এই রাগ সংগীতটিকে অনুপমভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল।"[৯৭]

নজরুল একাডেমীর কার্যক্রম শুরুর সময় থেকেই একাডেমী দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে শুরু করে। এর একটি সংগীত বিদ্যালয়, অপরটি শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেন স্কুল। সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু। এছাড়া নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই উদ্যোক্তাগণ একাডেমীর মুখপত্র *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* প্রকাশের পাশাপাশি নজরুল গীতি সংগ্রহ ও তার স্বরলিপি তৈরি ও প্রকাশের উদ্যোগ নেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত *নজরুল একাডেমী পত্রিকার* এগারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় নজরুল বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়াও জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পত্রিকায় যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জাহানারা আরজু এবং রাজিয়া সুলতানা। তবে নজরুল একাডেমীতে নজরুল গবেষণার মূল্যবান দলিলপত্র ও গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করা হলেও ১৯৭২ সালের পূর্বে তা প্রকাশিত হয়নি।[৯৮]

১৯৬৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত নজরুল একাডেমী উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি, তবে নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রে এই সংগঠনটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে শুধুমাত্র সংগীত শিক্ষাদান কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী (১৯৬৬)

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে শুভ রহমানের উদ্যোগে প্রগতিশীল তরুণ কবি, গল্পকার ও ছড়াকারের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী।[৯৯] মার্কসবাদী লেখক সাহিত্যিকদের সংগঠন হলেও মূলত প্রতিবাদী নাটক চর্চার ক্ষেত্রেই এই শিল্পীগোষ্ঠী বেশি আগ্রহী ছিল। ১৯৬৬ সালে আনিসুজ্জামানের লেখা গল্প 'দৃষ্টি' (নাট্যরূপ-নাট্যকার সোলায়মান) সৃজনী গোষ্ঠীর কবি ইউসুফ পাশার নির্দেশনায় শহিদ মিনারে মঞ্চস্থ হয়। এটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম পথনাটক এবং শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত প্রথম নাটক।[১০০] ১৯৬৮ সালে সৃজনীর অপর সফল নাট্য পরিবেশনা ছিল ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' যেটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এর পরিচালক ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম।[১০১] এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী রওশন জামিল, আনোয়ার হোসেন, আলতাফ হোসেন, বানু, ফরিদ আলী, গীতা দত্ত প্রমুখ।[১০২] এছাড়া সৃজনীর কিছু সাহসী নাট্য আয়োজন ছিল 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন', গোর্কির 'বিপ্লবের টুকরো ছবি' এবং 'সংকেত'। মুক্তিযুদ্ধের অসহযোগ

আন্দোলন পর্বে 'সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী'র গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশনা ছিল 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য' এবং 'একটি পোস্টার'।[১০৩] এই সংগঠনটি বাস্তবধর্মী নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও অবদান রেখেছে। আর সেই সকল সময়ে নারীরা সকল রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে এই আন্দোলনে অংশীদার হয়েছিলেন।

ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৭)

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক কামাল লোহানীর উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী।[১০৪] মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এই সংগঠনটি গণসংগীত, নৃত্যনাট্য পরিবেশনার সাথে সাথে নাটকও মঞ্চায়ন করেছিল। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পল্টনের বিশাল সমাবেশে প্রায় চল্লিশ হাজার দর্শকের সামনে ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী গণসংগীত ও নৃত্যনাট্যের পাশাপাশি 'আলোর পথযাত্রী' নাটক পরিবেশন করে। এই নাটকে অন্যান্যের সাথে অভিনয় করেছিলেন সুলতানা রেবু এবং স্নিগ্ধা চক্রবর্তী।[১০৫] উদ্দীপনামূলক এই নাটকটি পরবর্তীসময়ে চট্টগ্রাম, সিলেট, নওগাঁ, টঙ্গীর শিল্পাঞ্চলে এবং ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বার অভিনীত হয়েছে। এছাড়া এই সংগঠনটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পুরনো গণসংগীতগুলোকে নতুন করে সংগ্রহ করেও চালু করেছিল এবং পূর্ব বাংলায় লিখিত গণসংগীতকে ব্যাপকভাবে গণজাগরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিল।[১০৬] আন্দোলনমুখর এই দিনগুলোতে যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে গণসংগীত চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবেদা বেগম, দুলু, মিনি জাহানারা, নিলুফার বেগম, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, আনজুম, কুসুম, কল্যাণী ঘোষ প্রমুখ।[১০৭] রবীন্দ্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বোপরি ১৯৬৮-৬৯ সালে গণআন্দোলনের দিনগুলোতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্রান্তি ছিল অন্যতম। ক্রান্তির এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামের প্রতি পর্যায়েই নারীদের উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল।

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৮)

বাংলায় গণসংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর ঢাকায় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত ১৯৫৬'র ঢাকা জেলা কৃষক সম্মেলন থেকেই সত্যেন সেন এমন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যে সংগঠনটি গান, নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি বদলের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালে তিনি একটি গানের দল তৈরি করেন। এই দল তৈরি করার পরপরই তিনি কারারুদ্ধ হলেও এই সংগঠনটির গণসংগীতচর্চা ও অন্যান্য তৎপরতা চালিয়ে যান গোলাম মোহাম্মদ ইদু এবং সাইদুর রহমান। ষাটের দশকে এসে এই দলের সাথে নারীরাও সম্পৃক্ত হন। এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রাজিয়া বেগম। এ দলের গানগুলোর বেশিরভাগই ছিল কাজী নজরুল ইসলামের গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ পর্যায়ের গান, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তৎকালীন প্রচলিত কিছু বাংলা ও হিন্দি গণসংগীত এবং সত্যেন সেনের নিজের লেখা ও সুর করা গান। পরবর্তীসময়ে এই সংগীত দলটিকেই সত্যেন সেন ১৯৬৮ সালে রহিমা চৌধুরাণীর বাসায় উদীচী নামে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৮] সত্যেন সেন সচেতনভাবেই উদীচী নামটি নির্বাচন করেছিলেন। ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, উদীচী অর্থ উত্তর দিক বা ধ্রুবতারার দিক। দিকহারা নাবিকেরা যেমন উত্তর দিকে ধ্রুবতারার অবস্থান দেখে তাদের নিজ নিজ গন্তব্য স্থির করেন– তেমনি এদেশের সংস্কৃতি তথা গণমানুষের সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সবকিছুই উদীচীকে দেখে তার চলার পথ চিনতে পারবে। সংস্কৃতিকে মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা এই সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

উদীচীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল। প্রথম থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বা সহায়তা করেছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, সুফিয়া কামাল, অনিমা সিংহ, লায়লা হাসান প্রমুখ। তাছাড়া উদীচীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হওয়ার পূর্বে যে আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় তাতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন রাজিয়া বেগম।[১০৯] ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত উদীচীর প্রথম জাতীয় সম্মেলনে গঠিত কমিটিতেও তিনি এবং তাজিম সুলতানা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে উদীচীর দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনেও নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার। সত্যেন সেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন মনোরমা বসু। এই সম্মেলনে নতুন কার্যকরী কমিটিও নির্বাচিত হয়। এই কমিটিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাজিম সুলতানা এবং সংগীত সম্পাদিকা পদে রাজিয়া বেগম, সদস্য হিসেবে ফৌজিয়া বেগম এবং বুলা আহমেদকে নির্বাচিত করা হয়।[১১০]

উদীচী আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করার পরই বিভিন্ন স্থানে গণসংগীত পরিবেশন করার পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পথনাটক রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাকের উপর প্রদর্শন করা শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউস মঞ্চে মঞ্চনাটক 'আলো আসছে'র মঞ্চায়ন করে। এটিই ছিল উদীচীর প্রথম নাটক এবং একটি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চনাটক। নাটকটি লিখিত, নির্দেশিত ও অভিনীত হয়েছিল উদীচীর তরুণ কর্মীদের দ্বারা। এই নাটকে একমাত্র অভিনেত্রী ছিলেন ফরিদা আখতার। ফরিদা আখতারই হলেন উদীচীর প্রথম নারী অভিনয় শিল্পী। এটিই ছিল ফরিদা আখতারের প্রথম এবং শেষ নাটক। পরবর্তীসময়ে ১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে এই ঘটনার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উদীচী ঢাকা নগর ও শ্রমিক অঞ্চলে 'শপথ নিলাম' নামে পথনাটক পরিবেশন করে। একই বছর মার্চের শেষ দিকে উদীচী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদীতে মঞ্চস্থ করে জহির রায়হানের 'পোস্টার' গল্পের নাট্যরূপ। ১৯৭২ সালেও এই নাটকটি বেশ কয়েকবার পরিবেশিত হয়। নারীদের মধ্যে এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন লীনা চক্রবর্তী। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রলঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং তাদের জয়, পরাজয় ইত্যাদি নিয়ে রচিত নাটক 'জীবন তরঙ্গ' মঞ্চায়িত হয় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মঞ্চে। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন আখতার হুসেন। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অন্যান্যের সাথে অভিনয় করেছিলেন সেলিনা দেওয়ান, কামরুন্নাহার হেলেন, তরু আহমেদ প্রমুখ। ১৯৭১ সালে উদীচী মঞ্চস্থ করে নৃত্যনাট্য 'প্রিয়তমাষু'। এই নাটকের আবহসংগীত করেছিলেন অজিত রায় এবং নৃত্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন লায়লা হাসান। এই নাটকে সত্যেন সেনের 'আমি আর পারিনা একেলা এ জীবন বইতে' গানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন রাজিয়া বেগম। নাটকে অভিনয় করেছিলেন তরু আহমেদ, কামরুন্নাহার হেলেনসহ উদীচীর মেয়েরা।[১১১]

উদীচী মূলত গণসংগীতের সংগঠন হিসেবে পরিচিত। ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকে সামরিক শাসনবিরোধী বিক্ষোভে যখন উত্তাল বাংলার জনগণ সেই সময়ে মানুষকে জাগানোর জন্য এবং বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে কৃষক-শ্রমিকদের সভায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাকের উপর চেপে উদীচীর শিল্পীকর্মীরা পরিবেশন করত গণসংগীত, প্রদর্শন করতো পথনাটক। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে জনগণের হাতে হাত রেখে উদীচীর শিল্পী কর্মীরাও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কখনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, কখনো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে উদীচীর ট্রাকস্কোয়াড বের হয়। যার পটভূমিতে আঁকা থাকে সূর্যের মাঝখানে শৃঙ্খলিত হাত। সূর্যটি যেন কাঁটা তারের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসছে। পাশে শহিদ

মিনার। স্লোগানে লেখা ছিল ‘একুশের শোককে শক্তিতে পরিণত করুন’। এ সময় উদীচী থেকে একুশের গান নামে একটি গানের সংকলনও বের করা হয়।[১১২]

১৯৭১ সালের ৫ মার্চ বাংলার জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সমর্থনে উদীচী মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং গুলিস্তান, নয়াপল্টন, জিন্না এভিনিউ, সেগুনবাগিচা এলাকায় পথ সভা করে। উদীচীর সভাপতি সত্যেন সেন সভাসমূহে বক্তব্য প্রদান করার সময় দেশের সকল প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যকদের গণআন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার আহ্বান জানান।[১১৩] ৬ মার্চ উদীচীর শিল্পীকর্মীরা আবার গণমিছিল বের করেন। ১২ মার্চ বিকেলে জিন্না এভিনিউ থেকে আবার বের হয় উদীচীর গণসংগীত স্কোয়াড। গণসংগীত স্কোয়াডের পাশাপাশি উদীচী পথনাটক ‘সামনে লড়াই’ মঞ্চস্থ করতে থাকে। এ সময় উদীচীর শিল্পীকর্মীরা গান, নাটকের পাশাপাশি সিকান্দার আবু জাফরের ‘বাংলা ছাড়ো’ এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য’ কবিতা দুটি বার বার আবৃত্তি করতেন। ১৫ মার্চ পুনরায় ট্রাকযোগে উদীচীর শিল্পীকর্মীদের স্কোয়াড বের হয়। এই স্কোয়াডটি সদরঘাট, লালবাগ, হাজারীবাগ, মগবাজার, মালীবাগ ও নবাবপুর রেলগেট এলাকায় গণসংগীত ও পথনাটক ‘শপথ নিলাম’ পরিবেশন করে।[১১৪]

উদীচীর শিল্পীকর্মীরা বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তাবে রূপায়িত করার অঙ্গীকার নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। উদীচী কেবল সংস্কৃতি চর্চাই করেনি, গণমানুষের সংস্কৃতি চর্চার পথও নির্দেশ করেছে। উদীচী সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুফিয়া কামাল বলেন:

> ‘নবীন সৃজনাবেগে গন্ধে, বর্ণে, সুরে সুরে গান
>
> জীবন জাগাতে চায় আকুল আহ্বানে
>
> উদীচী সে স্বপ্ন আনে, নব জীবনের গান
>
> সে প্রাণ কল্লোল তরে ধরণী পাতিয়া আছে কান।’

স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মুখযুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি বাঙালির সার্বিক মুক্তির চেতনাকে ধারণ করে উদীচীর পথচলা আরও উজ্জীবিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে। তাই উদীচী শুধুই একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়। উদীচী একটি আন্দোলন, যে আন্দোলনের শুরু থেকেই নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল। উদীচীর সাথে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনিমা সিংহ, ফরিদা আখতার, লীনা চক্রবর্তী, সেলিনা দেওয়ান, কামরুন্নাহার হেলেন, মঞ্জুশ্রী দাসগুপ্তা, বাণী চৌধুরী, ফৌজিয়া বেগম, রেখা রানী গুণ, শিবানী, মিঠি, কেয়া, নাজনীন সুলতানা, মাহমুদা পারভীন, বেগম মুশতারী শফী, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা ইব্রাহিম, শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, সেলিনা হোসেন, লায়লা হাসান, সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, ফিরোজা বেগম, জাহানারা ইমাম, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী প্রমুখ।

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় (১৯৬৮)

১৯৬৮ সালে সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ফজলে লোহানীর বাড়িতে আতাউর রহমান, জিয়া হায়দার প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্বের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়। নাটক মঞ্চায়নের পূর্বে এই সংগঠনটি বেতার ও টেলিভিশনে নাটক প্রযোজনা করতো। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের উত্তাল দিনে এই সংগঠনটি যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সংগঠনের পরিবেশিত নাটকগুলোর মধ্যে নান্দনিকতা, প্রাসঙ্গিকতা ও সুষ্ঠু শিল্পবোধ ছিল লক্ষ্যণীয়। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সাথে শুরু থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন সুলতানা কামাল এবং নাসিমা খান মজলিশ, লাকি ইনাম, সারা যাকের।[১১৫]

মুক্তিযুদ্ধের সময় এই সংগঠনের নাট্যকর্মীরা নানাভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে আরও সম্পৃক্ত হয়েছিলেন সারা যাকের, বিপাশা হায়াত, শিরিন বকুল, রুনা খান, লাবণ্য, ঝুমু মজুমদার, শামীমা নাজনীন প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধপর্বে গঠিত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টসমূহ

বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ (১৯৭১)

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে সৈয়দ হাসান ইমামকে আহ্বায়ক এবং ওয়াহিদুল হক ও আতিকুল ইসলামকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ গঠিত হয়।[১১৬] ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে বাংলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ বেতার, টিভি, চলচ্চিত্র শিল্পী ও বাংলার পটুয়াদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করে। লায়লা আর্জুমান্দ বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিল্পীরা স্বাধিকার আন্দোলনে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের শপথ করেন।[১১৭] সভা শেষে বেতার ও টেলিভিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফেরদৌসী রহমান।[১১৮] এছাড়া চলচ্চিত্র শিল্পের ৩৩ জন শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমাজ জনতার সংগ্রামের সঙ্গে থাকবে। এই বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শবনম, রোজী, কবরী, সুজাতা, সুলতানা জামান, সুচন্দা প্রমুখ।[১১৯] এছাড়া ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার না করায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ ক্ষুব্ধ হয়। তারা বেতার ও টিভিতে শর্ত প্রদান করেন যে, যাবতীয় অনুষ্ঠান যদি আন্দোলনের অনুকূলে হয় তবেই তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।[১২০] এছাড়া ১৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শহিদ মিনারে গণসংগীতের আয়োজন করা হয়।[১২১] একই দিনে টেলিভিশন নাট্যশিল্পীদের অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, গণআন্দোলনের পরিপন্থি কোনো অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার করা হবে না। আবদুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের সাথে বক্তব্য রেখেছিলেন রওশন জামিল, আলেয়া ফেরদৌসী প্রমুখ। ২২ মার্চ বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ বাহাদুর শাহ পার্ক ও পল্টন ময়দানের ছড়া পাঠের আসর, গণসংগীত ও নাটক পরিবেশন করে। ২৩ মার্চ সকাল ৭ টায় শহিদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের পক্ষে ছায়ানটের গণসংগীতের আসর হয়।[১২২] একই দিন রাত এগারটা থেকে ডিআইটিতে অবস্থিত টেলিভিশন কেন্দ্র হতে দেশপ্রেম ও উদ্দীপনামূলক গান পরিবেশন করা হতে থাকে। ফাহমিদা খাতুন গাইতে থাকেন 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', গানটি ক্রমান্বয়ে গাইতে গাইতে রাত বারটা পার হয়ে যায়। ১২টা ২ মিনিটে অধিবেশন সমাপ্ত করা হয় পাকিস্তান দিবসকে উপেক্ষা করেই। এতে সামরিক কর্তারা ক্ষুব্ধ হন। টেলিভিশন কেন্দ্রে প্রহরারত সেনাবাহিনী কর্তৃক কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে টিভি কেন্দ্রের সকল কর্মচারী অব্যাহতভাবে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকায় ২৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে।[১২৩] সেই সময় আন্দোলনের অন্যতম শিল্পী সন্‌জীদা খাতুন যে সময়টিকে তুলে ধরে বলেছেন:

> ঊনসত্তর থেকে একাত্তরের ২৪ মার্চ পর্যন্ত, বিশেষ করে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর থেকে সারাদেশ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল । বঙ্গবন্ধু শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য হাতে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে ঘরে ঘরে প্রস্তুতির কথা বলছেন, রাজনৈতিক সংলাপ চালাচ্ছেন, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে যাবতীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই সময় কিছু হলেও মানুষ তখন প্রধানত ছুটেছে শহীদ মিনারের গান আর ময়দানের বক্তৃতা থেকে উদ্দীপ্ত হবার জন্যে। সেই তাপ লাগল পাকিস্তানের পতাকায়। পুড়ল পতাকা। টেলিভিশনের পর্দাতেও আন্দোলনে যাবার আহ্বান, দেশাত্মবোধক গান, 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো, ও আমার বাংলা মা' গানে গানে বলা হতে লাগল, 'ওরে আগুন আমার ভাই, 'আমি তোমারই জয় গাই'। ২৩ মার্চ ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র

> রাত্রির অধিবেশন শেষে পাকিস্তানি পতাকা উড়াবে না বলে জেদ করল। রেকর্ড করা উদ্দীপক গানের ছবি চালাতে চালাতে ২৩ মার্চের রাত্রি বারোটা পার করে তার পরে পতাকা দেখালো তারা। প্রতিবাদের কত ধরনই যে দেখা গেছিল তখন।[১২৪]

বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের গণসংগীত দল ঢাকার শহিদ মিনার, প্রেসক্লাব, রাস্তায়, কখনো বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণসংগীত পরিবেশন করে। কামাল লোহানী লিখেছেন, "বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগমুহূর্তে, তাদের রাজপথ, বাংলা একাডেমি চত্বরে আয়োজিত দেশপ্রেমের গানে তাই সম্প্রসারিত হয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও গীত হয়েছে অনেক।"[১২৫] প্রকৃতপক্ষে সে সময় সর্বত্রই রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতির সংগ্রাম। বাঙালি অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করতে পেরেছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সক্রিয়তায়। সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, যেখানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (১৯৭১)

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্রম-বর্ণনা উপস্থাপন করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা। বেতারে ভেসে আসা শব্দ যে বুলেটের চেয়েও প্রচণ্ডতম শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই বেতার কেন্দ্রটি মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের পাশপাশি এই শব্দযোদ্ধাদের কণ্ঠ যুদ্ধ করে গেছে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত। শব্দকে হাতিয়ার করে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের অস্ত্র ছিল কণ্ঠ, গান আর বাদ্যযন্ত্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনালগ্ন থেকেই এর সাথে নারীর সম্পৃক্ততা ছিল। মূলত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর ২৬ মার্চ সকাল থেকে চট্টগ্রাম বেতারের সকল কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল ফারুক, আবুল কাশেম সন্দ্বীপসহ কতিপয় বেতারকর্মী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।[১২৬]

এই বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তাদের মধ্যে যেসব নারী ছিলেন তারা হলেন ডা. মঞ্জুলা আনোয়ার, কাজী হোসনে আরা এবং বেগম মুশতারী শফী।[১২৭] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূতিকাগার মুশতারী লজের বাসিন্দা বেগম মুশতারী শফী প্রথম দিন থেকেই বেতার কেন্দ্রের নিউজ বুলেটিন তৈরির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ট্রানজিস্টারে 'বিবিসি', 'ভয়েস অব আমেরিকা', 'আকাশ বাণী', শুনে শুনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে কোনো সংবাদ বা আলোচনা, পর্যালোচনা কাগজে টুকে রাখতেন এবং এর ভিত্তিতে সংবাদ বুলেটিন তৈরি করতেন। ২৬-৩০ মার্চ সকাল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, পরিচালনার কার্যক্রম চালানো হয়েছিল মুশতারী লজ থেকে এবং ততদিন গভীর রাত পর্যন্ত মোমের আলোয় প্রচার মেটেরিয়ালস তৈরি করতে সাহায্য করতেন তিনি।[১২৮] তবে প্রতিষ্ঠায় জড়িত থাকলেও শুরুর দিকে নারী কর্মীর সমাবেশ রক্ষণশীল শ্রোতাদের কাছে শোভন দেখাবে না এই যুক্তিতে হোসনে আরাকে অনুষ্ঠান ঘোষণা করার সুযোগ দেয়া হয়নি।[১২৯] ২৯ মার্চ বেতার কণ্ঠ তমজিদা বেগম কালুরঘাটে আসেন এবং ঐদিন প্রভাতী অধিবেশনে বেলাল মোহাম্মদের লিখে দেয়া ঘোষণায় কণ্ঠ দান করেন। তবে ৩০ মার্চ পাকিস্তান বিমান বাহিনী কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করলে কেন্দ্রটি অচল হয়ে যায়। কেন্দ্রটি ৩ এপ্রিল ১৯৭১ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বাগাফায় একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে এর দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু করে। ২৫ মে কেন্দ্রটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং একই দিনে সেখানে

এটি তার কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা থেকে আসা রেডিওর পুরাতন স্টাফ ও নবাগতদের সমন্বয়ে ২৬ মে থেকে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র রূপে এর তৃতীয় পর্বের কার্যক্রম শুরু করে।[১৩০] তৃতীয় পর্যায়েই সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বৃহৎ পরিসরে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। এই পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিস্তারিত চিত্র বর্ণিত হল:

সংবাদ পাঠক

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, বর্বরতার করুণ চিত্রসহ যুদ্ধকালীন সার্বিক পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্ব নেতাদের প্রতিক্রিয়া এই সকল বিষয় দেশবাসীকে জানাতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠকগণ দৃঢ় চিত্তে একনিষ্ঠভাবে এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন, এই দায়িত্ব পালনে সমঅংশীদার ছিলেন নারীরা। বাংলা ও ইংরেজি এ দুই ভাষাতেই সংবাদ পাঠ করা হতো। পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার শুরুর দিনে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৫ মে সকাল ৭.২৫ মিনিটে মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা টি হোসেনের স্ত্রী মিসেস টি হোসেন পারভীন ছদ্মনামে ইংরেজি খবর পড়েন।[১৩১] তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত ইংরেজি সংবাদ পাঠক। তার মাসিক বেতন ছিল ৩০০ টাকা। অপর একজন ইংরেজি সংবাদ পাঠক ছিলেন নাসরীন আহমাদ। তিনি মিসেস জেরীন আহমেদ নামে নিয়মিত ইংরেজি সংবাদ পাঠ করতেন।[১৩২] তিনি মাসিক ২৫০ টাকার বিনিময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত সংবাদ পাঠক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে তখন অধিকাংশ শব্দসৈনিক ছদ্মনামে তাদের ভূমিকা পালন করেছেন। তবে সংবাদ পাঠ ছাড়াও তারা অন্যান্য অনুষ্ঠানের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তাদের চুক্তিপত্রেও এই বিষয়টির অনুমোদন ছিল। চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল 'The contract should state that their primary duty will be to read the news but they will also perform other duties as and when needed.'[১৩৩] এছাড়া সংবাদ পাঠের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন দীপ্তি লোহানী, তাজিন শাহনাজ মুরশিদ এবং সংবাদ পর্যালোচনা পাঠ করতেন শেফালী দাস।[১৩৪]

নাটক

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ বেতারে রূপান্তরিত হয়েছিল তাই সময় বৃদ্ধি করে নাটক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জনপ্রিয় একটি ধারাবাহিক নাটিকা ছিল 'জল্লাদের দরবার'। এখানে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে তুলে ধরা হতো। এই ব্যাঙ্গাত্মক সিরিজে তাকে কেল্লা ফতেহ খান চরিত্রে চিত্রিত করা হয়। অপর দুটি জীবন্তিকার শিরোনাম ছিল 'জনতার আদালত' ও 'মীর জাফরের রোজনামচা'। 'জল্লাদের দরবার' ধারাবাহিকে অভিনয় করতে বুলবুল মহলানবীশ। কেল্লা ফতেহ খানের বেগম চরিত্রে অভিনয় করতেন তিনি। এছাড়া আশরাফুল আলমের সঙ্গে 'বাংলার মুখ' নামক জীবন্তিকাতেও অভিনয় করেন তিনি।[১৩৫] জল্লাদের দরবার ধারাবাহিকে আরও অভিনয় করতেন অমিতা বসু, আলেয়া ফেরদৌসী, মাধুরী চ্যাটার্জী।[১৩৬] এই নাটকে একদিন মাধুরী চ্যাটার্জীর অনুপস্থিতিতে নির্যাতিতা মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বেগম মুশতারী শফী।[১৩৭]এই বেতার কেন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ নাট্যশিল্পী ছিলেন শিল্পী মহলানবীশ। সাত বছর বয়সী শিল্পী মহলানবীশ জল্লাদের দরবারসহ বেশ কয়েকটি নাটকেই ছোট মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।[১৩৮] এছাড়াও নাটকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নাসরীন আহমাদ। তিনি রনেন কুশারী পরিচালিত একটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন।[১৩৯] 'রক্ত যখন দিয়েছি' নাটকে অভিনয় করেছিলেন কাজী তামান্না। তিনি মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। শব্দসৈনিক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করাসহ নানা

কাজে অংশ নেন।[১৪০] তাছাড়া নাটকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন লায়লা হাসান। নাটকে অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> আমি প্রথম অভিনয় করেছিলাম ঈদের নাটকে। এর পরিচালক ছিলেন মোস্তফা আনোয়ার। নাটকের নামটা মনে নেই, কিন্তু বিষয়বস্তুটা এই রকম ছিল যে, মা আশা করে বসে আছে, সন্তান আসবে। সন্তান যুদ্ধে, প্রতি ঈদের মতো তো আয়োজনটা নেই, তাও ভাবছে, ছেলে ফিরে এলে কিছু একটা রান্না করে খাওয়াবে। প্রস্তুতি আছে কিন্তু ছেলে আসছে না, তাই কিছু রান্না করতে পারছে না। এরকম বেদনাদায়ক প্রেক্ষাপট নিয়েই লেখা হয়েছিল নাটকটি। আমি মায়ের চরিত্রটা করেছিলাম।[১৪১]

এর বাইরে প্রতি শুক্রবার জাহিদ সিদ্দিকী রচিত উর্দু ফিচার নাটিকায় অংশগ্রহণ করতেন বেগম মুশতারী শফী এবং পারভীন হোসেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারী শব্দসৈনিকদের মধ্যে নাট্যশিল্পী হিসেবে আরও সম্পৃক্ত ছিলেন সুমিতা দেবী, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, শুক্তি মহলানবীশ, সুফিয়া খাতুন, দিলশাদ বেগম, তাজিন শাহনাজ মুরশিদ, উম্মে কুলসুম, করুণা রায়, মাসুদা নবী, রুনু আহমেদ, কাকিয়া বসু, মালা চৌধুরী।[১৪২]

কথিকা রচনা ও পাঠ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কথিকা রচনা ও পাঠের সাথেও নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল। কথিকা রচনা ও পাঠে সম্পৃক্ত ছিলেন উম্মে কুলসুম (বেগম মুশতারী শফী), জেবুন্নাহার আইভি (আইভি রহমান), বদরুন্নেসা আহমদ, মেহের খন্দকার (সেলিনা খন্দকার), দীপা ব্যানার্জী, শুভ্রা চৌধুরী, পারভীন আক্তার (বুলা মাহমুদ), কুলসুম আজাদ, জলি জাহানুর, বাসনা গুণ, নূরজাহান মাজহার, ডলি নাথ, দীপ্তি লোহানী, নুরুন নাহার জাহুর, রাফিয়া আখতার ডলি, ড. মাহমুদা খাতুন, রেবা আখতার, ড. সুলতানা সারোয়ার জামান।[১৪৩]

প্রতিনিয়তই বেতারে নতুন নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত হচ্ছিল তাই বাস্তব প্রয়োজনেই অনুষ্ঠানের একটি ফিক্সড পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই শিরোনামে বিভিন্ন জন কথিকা লেখার কারণে কথিকারও একটি ফিক্সড পয়েন্ট তৈরি করা হয়। শুরুতে সোমবার সকাল ৭.৩৫ মিনিটে প্রচারিত হতো 'রণাঙ্গনে বাংলার নারী' ও সোমবার ছাড়া প্রতিদিন একই সময়ে 'মুক্তিসংগ্রামে মায়ের ভূমিকা' শীর্ষক কথিকা। পরবর্তী সময়ে এটি পরিবর্তিত হয়ে সকাল ৭.৪০ মিনিটে ৭ মিনিট ব্যাপী 'দেশগঠনে নারীর ভূমিকা' নামে কথিকা পাঠ করা হত।[১৪৪] কথিকা পাঠের দায়িত্বভার সাজানো হয়েছিল এভাবে[১৪৫]

সোমবার: উম্মে কুলসুম (বেগম মুশতারী শফী)

মঙ্গলবার: দীপা ব্যানার্জী

বুধবার: শুভ্রা চৌধুরী

বৃহস্পতিবার: আইভি রহমান/পারভীন আখতার/কুলসুম আজাদ

শুক্রবার: জলি জাহানুর

শনিবার: বাসনা গুণ

রবিবার: নূরজাহান মাজহার/ ডলি নাথ

১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট জেবুন্নাহার আইভি তার রচিত ও পঠিত কথিকায় ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। তার ভাষায়:

১৪ই আগস্ট বাঙালির জন্যে মুক্তি নিয়ে এল না কোনোবার। শুধু তীব্রতর হলো শোষণ। জমিদারের অত্যাচার আর মহাজনের শোষণের চাইতে তারা জর্জরিত হয়ে উঠলো।... ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টের পর বাংলাদেশের ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস।.... বাংলায় আজ রক্তের স্রোত বইছে। ঘরে ঘরে, মাঠে মাঠে, রাজপথে জমাট বাঁধা রক্ত। ধর্ষিতা মা-বোনদের মরণ আর্তনাদ অভিশপ্ত ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট আর তার নায়কদের প্রতিমুহূর্তে ঘৃণার সাথে ধিক্কারে ধিকৃত করছে। ৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বাংলার জন্য এনেছে, প্রতিশ্রুতির আড়ালে বঞ্চনা, শোষণ আর রক্তস্রান, কান্না আর দীর্ঘশ্বাস।[১৪৬]

২১ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন বদরুন্নেসা আহমদ।[১৪৭] ১৬ সেপ্টেম্বর মেহের খন্দকার তার রচিত 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মহিলা' কথিকাটি পাঠ করেন। এতে তিনি মুক্তিসংগ্রামে নারীদের অবদান তুলে ধরেছেন। তার ভাষায়:

.... আজকের আমাদের এ সংগ্রামও বাংলার মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। আজকে দেখি বঙ্গমাতার হীরের টুকরো ছেলে যখন অশ্বধামের বলির মত বর্বর পশুর হাতে স্বাধীনতা শিকারে পরিণত হয়েছে তখনও শোকাকিনী মাতা সগর্বে আর এক সন্তানকে তার প্রতিশোধ নিতে মুক্তিসংগ্রামে পাঠাচ্ছে। আজকে বাংলার ভগ্নীকুল তার নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও ভাইকে দেশের স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজকে বাংলার কুলবধু স্বামী হারিয়েও রণাঙ্গনের পাশে পাশে বীর সৈন্যদের সেবা শুশ্রুষা করছে...।[১৪৮]

মিস ডলি নাথ তার রচিত 'যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নারী' শিরোনামে কথিকা পাঠ করেন ২২ সেপ্টেম্বর। তিনি বলেন:

...আজ আমাদের দেশে যে সংগ্রাম চলছে সে হল মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অর্থাৎ নারীদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঝাঁসির রানীর বাহিনীর মত আমাদেরকেও সেনাবাহিনী গঠনে অগ্রণী হতে হবে। আমাদেরকে নার্সিং এ অংশগ্রহণ করতে হবে। আহত ভাইদের সুস্থ করে তাদেরকে আবার দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনে পাঠাতে হবে। যেদিন দেশমাতৃকাকে সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করতে পারব সেদিন আবার আমরা আমাদের ঘর আলোকিত করব আবার স্বপ্নের জাল বুনব।[১৪৯]

৪ নভেম্বর জেবুন্নাহার আইভি রচিত 'মুক্তিসংগ্রামে মায়ের প্রেরণা' কথিকা পাঠ করা হয়। এই কথিকায় আনোয়ার নামক এক যুবকের মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের গল্প এবং এতে তার মায়ের উৎসাহের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তাই আনোয়ারের জন্য মন খারাপ নয় বরং আনোয়ারের মার কণ্ঠে দৃপ্তভাবে উচ্চারিত হয়, "মন খারাপ না। খুশি লাইগতাছে। আনু আমাগো দেশের লাইগ্যা লড়তাছে। এর থাইক্যা খুশির আর কী আইতে পারে! কারবালায় কাশেমের মাথায় কাশেমের মা যুদ্ধে যাওনের আগে পাগড়ি বাইন্ধ্যা দিছিলো। আমিও তারে নিজের হাতে কাপড় পরাইয়া দিছি। আনু আমার কাশেম।"[১৫০]

৫ নভেম্বর নূরজাহান মাযহার তার রচিত 'মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গ বীরাঙ্গনা' নামে কথিকা পাঠ করেন। এই কথিকায় তিনি মায়েরা সন্তানকে, বোনেরা ভাইকে এবং স্ত্রীরা স্বামীকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য যে প্রেরণা দিয়েছেন সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন:

... নারীর স্থান যে শুধু ঘরে নয়, বাইরের জগতেও যে তার সমাজ কল্যাণমূলক এবং দেশসেবার প্রচুর কাজ আছে, বাংলাদেশের জাগ্রত নারী সমাজ তা প্রমাণ করেছেন। আজকের মুক্তি সংগ্রামেও বাংলাদেশের ললনাগণ সেই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমরা জানি, আমাদের কোনোও কোনোও রণাঙ্গনে অনেক উৎসাহী ছাত্রী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে পাক সেনাদের খতমের কাজে তাদের সংগ্রামী ভাইদের সাহায্য করছেন। কিন্তু নারীর পক্ষে শুধু অস্ত্র নিয়ে

যুদ্ধ করাই আধুনিক যুদ্ধের বড় কথা নয়– নারীর পক্ষে আহত সৈনিকদের সেবার মাধ্যমে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্য করাও একটি বড় এবং মহান কাজ। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের বহু সক্ষম ছাত্রী ও মহিলা আজ এই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যেই তাদের সেবায় আমাদের বহু সংগ্রামী বাঙালি উপকৃত হয়েছে।[১৫১]

বেগম মুশতারী শফী তার রচিত 'রণাঙ্গনে বাংলার নারী' নামক কথিকা পাঠ করেন ৮ নভেম্বর। তিনি বলেন, "...আমাদের সন্তানেরা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। আমাদের মা বোনরা কেউবা তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন, কেউবা গৃহবাসে যুদ্ধকালীন কর্তব্য পালন করেছেন। এ কর্তব্য বড় কঠোর ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মতই বাংলার মা বোনেরা আজ মেনে নিয়েছে জাতির এই মুক্তিযুদ্ধকে।"[১৫২] **১৮** ডিসেম্বর **১৯৭১** বাসনা গুণ 'দেশগঠনে নারীর ভূমিকা' শিরোনামে একটি কথিকা পাঠ করেন। এতে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনে নারীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।[১৫৩] তাদের রচিত এই কথিকাগুলো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাংলার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনোবল বৃদ্ধিতে এক অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

সংগীত

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রধানত দুই ভাগে পরিচালিত হতো। একটি তথ্য বিভাগ ও অন্যটি সংগীত বিভাগ। সংগীত শাখার প্রধান কাজ ছিল উদ্দীপনামূলক গান প্রচার করে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীসহ স্বদেশবাসীকে প্রেরণা জোগানো। মুক্তির জন্য গণমানুষকে জাগ্রত করার জন্য একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে নিত্য নতুন গণসংগীত, অন্যদিকে জাগরণের জন্য উদ্দীপ্ত বাংলা গান যেমন স্বদেশী গান, রবীন্দ্রসংগীত, মুকুন্দ দাসের গান, নজরুল সংগীতসহ জনপ্রিয় গানগুলো নির্বাচন করে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়েছে। বেতার কেন্দ্রের সাথে থেকে সংগীত পরিচালনা করেছেন সমর দাস, মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, অজিত রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, মান্না হক, লাকী আখন্দ, সুজেয় শ্যাম প্রমুখ।[১৫৪] নারী শব্দ সৈনিকগণ একক ও সমবেতভাবে বিভিন্ন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। সংগীত বিভাগের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তারা হলেন নমিতা ঘোষ,[১৫৫] বুলবুল মহলানবীশ, মালা খান খুররুম, কল্যাণী ঘোষ,[১৫৬] রূপা খান (ফরহাদ), মঞ্জুলা দাসগুপ্তা,[১৫৭] শাহীন সামাদ, শীলা ভদ্র,[১৫৮] শীপ্রা ভদ্র, শুক্লা ভদ্র, ঝর্ণা ব্যানার্জী, লীনা দাস, সাকিনা বেগম, দীপা ব্যানার্জী, কণিকা রায়, মিনু রায়, মিতা চ্যাটার্জী, মলিনা দাস, সুফিয়া খাতুন, দিলশাদ বেগম, অর্চনা বসু, কণা, মিতা ঘোষ, ডালিয়া নওশীন[১৫৯], ফ্লোরা আহমেদ, ভক্তি রায়, মাধুরী আচার্য, মিতালী মুর্খাজী, মিলিয়া গণি, শীলা দাশ, শক্তি শিখা দাস, শেফালী ঘোষ, ছন্দা, শর্মিলা দাশ, হেনা বেগম, পূর্ণিমা দাস, সৈয়দা নাজনীন নীনা, রেহেনা বেগম, নীলা দাশ, জয়ন্তী লালা, কুইন মাহজাবীন, রানী প্রভা চৌধুরী, রানা হায়দার, দেবী চৌধুরী, আরতী ধর, সন্‌জীদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ, স্বপ্না রায়, রমা ভৌমিক, নায়লা জামান, মঞ্জুলা দাসগুপ্ত, উমা চৌধুরী, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, অনিতা বসু, রেহানা বেগম, শেফালী সান্যাল, অরুণা রানী সাহা, গীতশ্রী সেন, আফরোজা মামুন প্রমুখ।[১৬০]

এই শব্দসৈনিকগণ সমবেতভাবে যে সকল গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো, 'নোঙ্গর তোলো তোলো', 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবে', 'স্বাধীন কর মুক্ত কর জয় বাংলা', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে', 'সোনা সোনা সোনা', 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম', 'আয়রে চাষি মজুর কুলি', 'স্বাধীন দিকে দিকে', 'ও চাঁদ তুমি ফিরে যাও', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর', 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', 'রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেব', 'সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের', 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম', 'ওরে শোনরে তোরা শোন মোরা সইবো না', 'আমরা

সবাই মুক্তি সেনা’, ‘এদেশ বিপন্ন আজ’, ‘শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়’, ‘চল বাঙালি চল’, ‘নাই ঈদ আজ নাই ঈদ এই বাংলাদেশে’, ‘আমরা যখন মুক্ত হব তখন করব ঈদ’, ‘মুক্তির একই পথ সংগ্রাম’, ‘সংগ্রাম আজ সংগ্রাম’, ‘আমার নেতা তোমার নেতা’, ‘আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা’, ‘এবার উঠেছে মহাঝড়’, ‘এ ঘর দূর্গ’, ‘হুশিয়ার বাংলার মাটি’, ‘রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেব’, ‘সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ’ ইত্যাদি।

যেসব সংগীত শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাননি কিন্তু যাদের গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় তাদের মধ্যে শাহনাজ রহমতউল্লাহ অন্যতম। ‘সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা’ তার এই গানটি সারাদেশের বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস ও মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়াও যন্ত্রসংগীতে অন্যান্যের সাথে ছিলেন রুমু খান।[১৬১] স্টুডিওতে রেকডিং ছাড়াও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নারী শব্দসৈনিকেরা আরও বিভিন্নভাবে সংগীত পরিবেশনার সাথে যুক্ত ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১৪ জনের একটি শিল্পী দল ব্যারিস্টার বাদল রশীদের নেতৃত্বে সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে ও অন্যান্য স্থান সফর করে মুক্তিযুদ্ধ তহবিলের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তারা বোম্বে, দিল্লি, গোয়া, পুনা, কানপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় গণসংগীত পরিবেশন করেন। এই দলেও নারী শব্দ সৈনিকদের অংশগ্রহণ ছিল। এই দলে মাধুরী আচার্য, স্বপ্না রায়, নমিতা ঘোষ, রমা ভৌমিক, শান্তি মুখার্জী, অরুণা সাহার অংশগ্রহণ ছিল। বোম্বের *Free Press Journal* পত্রিকায় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে এই সংবাদ শিল্পীদের ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছিল।[১৬২]

আবৃত্তি

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংগীত ধারার সঙ্গে আর একটি ধারা ছিল কাব্যধারা। আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, প্রমুখ কবিগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন। নারী শব্দ সৈনিকদের মধ্যে কাজী রোজী, বেগম মুশতারী শফী, লায়লা হাসান আবৃত্তির সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় কাজী রোজী সিকানদার আবু জাফরের সঙ্গে কলকাতা চলে যান। এরপর তিনি বেলাল মোহাম্মদের অনুপ্রেরণায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজী রোজী স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। তার রচিত অনেকগুলো কবিতার কয়েকটি হল ‘জলস্রোত’, ‘রক্তজবার অক্ষরে’ ‘হে কবিতা তুমি আমার বোন তুমি আমার সংগ্রাম’ প্রভৃতি। তার রচিত জলস্রোত কবিতার কয়েকটি লাইন,

‘নয় কোনো নদী ও বন
নয় গ্রাম, বন্দর মাঠ
জলস্রোত নামে আমি তোমার সাথে থাকি
দেশ মাতৃকা।

‘রক্ত জবার অক্ষরে’ কবিতাটি এরকম,

তোমার কোলে আমার খুকু যখন আসবে
তখন ঝরে গিয়েছে, তোমার সিঁথিতে
আমার নামের লাল গোলাপ
দিনু তাহার চারিপাশ আমার সাদা
কাফনে জড়িয়ে, তুমি যখন অহংকার আর

ঐশ্বর্যে অনন্যা।

তখন তোমার কোলে অশ্রু ঝরবে

আমার খুকুর দুর্লভ হাসির শেফালি।[১৬৩]

'অগ্নিশিখা' নামক একটি অনুষ্ঠানে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এ্যাডভোকেট গাজীউল হক রচিত 'এহিয়াবধ কাব্য' আবৃত্তি করতেন বেগম মুশতারী শফী। দ্বৈত কণ্ঠের এই আবৃত্তিতে তার সাথে ছিলেন আশফাকুর রহমান খান। প্রতি সোম ও শুক্র বার রাত ৮.৫০ মিনিটে, ১০ মিনিট ব্যাপী এটা প্রচারিত হতো।[১৬৪] ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বেগম মুশতারী শফী গাজীউল হক রচিত 'এহিয়া বধ কাব্য'-এর শেষ আবৃত্তি করেন।[১৬৫] এছাড়া কবিতা আবৃত্তির সাথে যুক্ত ছিলেন লায়লা হাসান।

সাহিত্য আসর

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক পটভূমি' নামে একটি সাহিত্য আসর প্রচারিত হয়েছিল। পরিচালনা করেছিলেন আনিসুজ্জামান। সাহিত্য আসরে আবদুল গাফফার চৌধুরী চলচ্চিত্র ও সংবাদ বিষয়ে আলোচনা করেন। উপন্যাস, গল্প ও শিশু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন বুলবন ওসমান। হাসান মুরশিদ প্রবন্ধ সম্পর্কিত আলোচনা করেন। এই সাহিত্য আসরেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। সাহিত্য আসরে উম্মে কুলসুম ছদ্মনামে বেগম মুশতারী শফী কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন।[১৬৬]

সোনার বাংলা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শহীদুল ইসলাম পরিকল্পিত 'সোনার বাংলা' অনুষ্ঠান কিছুকাল নিয়মিত প্রচার করা হয়েছিল। পরে নামকরণ করা হয় গ্রামবাংলা। ওতে স্টকভয়েস ছিলেন মাধুরী চট্টোপাধ্যায়।[১৬৭] তিনি স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। মাসিক ৩০০ টাকার বিনিময়ে তার সাথে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল।

এই বহুমুখী অবদান ছাড়াও বেতার কেন্দ্রের দাপ্তরিক কাজেও নারীর অংশগ্রহণ ছিল। বিভিন্ন নথিপত্র সংরক্ষণ ও হিসাব বিভাগের কাজে নিযুক্ত ছিলেন লীনা রানী চক্রবর্তী।[১৬৮]

মুক্তিযুদ্ধের ১২ নং সেক্টর[১৬৯] খ্যাত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তারা তাদের কণ্ঠ দিয়ে এদেশের আপামর জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠ, প্রেরণার উৎস, বিক্ষুব্ধ চেতনার প্রতিচ্ছবি, যেখানে নারী শব্দসৈনিকদের ভূমিকা সর্বজনবিদিত।

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা (১৯৭১)

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির উদ্যোগে বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে গঠিত বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতিই পরবর্তী সময়ে গঠিত মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার জননবীজ।[১৭০] বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি কলকাতার রবীন্দ্রসদনে দু'দিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে 'রূপান্তরের গান' নামে একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এই গীতি আলেখ্যটি রচনা করেন শাহরিয়ার কবির এবং এতে কণ্ঠ দেন সৈয়দ হাসান ইমাম। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শান্তিদেব ঘোষ, নীলিমা সেন, কণিকা

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সাগর সেন, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, ফ্লোরা আহমদ, ডালিয়া নওশীন, শাহীন মাহমুদ প্রমুখ। প্রধানত গীতি আলেখ্য হলেও এ অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে একক গানও পরিবেশিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সন্‌জীদা খাতুন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', ফ্লোরা আহমদ 'না গো এই যে ধুলা আমার না এ', ডালিয়া নওশীন 'ঝরা ফুলদলে' এবং মাহমুদুর রহমান বেনু ও শাহীন মাহমুদ গেয়েছিলেন 'এসো হে সজল শ্যামঘন'।[১৭১] পরবর্তী সময়ে সন্‌জীদা খাতুনকে সভাপতি ও মাহমুদুর রহমান বেণুকে সাধারণ সম্পাদক করে রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা। এই শিল্পী সংস্থা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তার জন্য 'বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' ও ভারতস্থ 'বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি'র[১৭২] যুগ্ম উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে, শরণার্থী শিবিরে কলকাতায়, এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ও দিল্লিতে 'রূপান্তরের গান'সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনমত সংগঠন করে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।[১৭৩]

মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথে নারীদের মধ্যে যুক্ত ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, বুলবুল মহলানবীশ, শুক্তি মহলানবীশ, ফ্লোরা আহমদ, শারমিন সোনিয়া মুর্শীদ, ডালিয়া নওশিন, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, মঞ্জুলা দাস গুপ্তা, ঝর্ণা ব্যানার্জি, অর্চণা বসু, শাহীন সামাদ, অরুণা রাণী সাহা, শান্তি মুখার্জি, কল্যাণী ঘোষ, মিঠু চক্রবর্তী, উমা চৌধুরী, শীলা দাশ, শর্মিলা দাশ, নীলা দাশ, রাখী চক্রবর্তী, সুমিতা নাহা, তাজিন মুরশিদ, লায়লা জামান, লতা চৌধুরী, লুবনা জাহান, মিলিয়া গণি প্রমুখ।[১৭৪] বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার শিল্পী শাহীন সামাদ বলেন, "তিনি ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হন। কথাসাহিত্যিক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে (কলকাতা, ১৪৪, লেনিন সরণিতে) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তারা। শুরুতে ১৭ জন শিল্পী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭ জন। তারা সবাই মনে এই চেতনা ধারণ করেছিলেন যে, অস্ত্র হাতে সরাসরি যুদ্ধ করতে না পারলেও তারা তাদের কণ্ঠ দিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন।"[১৭৫] আর সে কারণেই এই সংস্থার শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও অর্থ সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন অন্যদিকে তারা শত কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে উদ্দীপনা ছড়াতে এবং উজ্জীবিত করতে অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। এই শিল্পী সংস্থার প্রত্যেক সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে সম্মানী ভাতা পেতেন।[১৭৬] তবে প্রয়োজন না হলে অনেকে এই অর্থও গ্রহণ করেননি। উদাহরণস্বরূপ শীলা দাশের কথা বলা যায়। তিনি তার কাকার বাসায় থাকতেন বিধায় তিনি সম্মানী ভাতা গ্রহণ করেননি। তবে যাতায়াত ভাড়া বাবদ তাকে ২৩ টাকা দেয়া হত।[১৭৭] বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হতো।

মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা গঠিত হবার পর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সংস্থাটি কমলা গার্লস স্কুলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, স্কুলের অধ্যক্ষ কবি বিষ্ণু দের স্ত্রী প্রণতি দে এ অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা করেন। এই শিল্পী সংস্থার সদস্যরা শুধু কলকাতায় নয়, বিভিন্ন সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গান শোনাতেন। কখনও তারা পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকায় চড়ে, আবার কখনও ট্রাকে করে এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্তে যেতেন। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার ট্রাকই হয়ে উঠেছিল শিল্পীদের বাসস্থান। এভাবে তারা দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত ২৫০টির বেশি অনুষ্ঠান করেছিলেন।[১৭৮] দিল্লির একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও এই সংস্থা 'রূপান্তরের গান' পরিবেশন করেছিল। গানের পূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। তাই এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এই সংগ্রাম বিশ্ববাসীর চেতনায় আঘাত হানতে সক্ষম হয়। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার

ব্যানারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলোতে 'জনতার সংগ্রাম চলবে', 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য', 'বিপ্লবের রক্ত রাঙা ঝান্ডা উড়ে আকাশে', 'ব্যারিকেড বেয়োনেট বেড়াজাল', 'মানুষ হ মানুষ হ, আবার তোরা মানুষ হ', 'ওরে বিষম দৈরার ঢেউ উথাল পাথাল করে', 'মোদের গরব মোদের আশা', 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহি', 'ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদি', 'চল যাই চল যাই চল যাই', 'শিকল পরা ছল মোদের এই', 'কারার ওই লৌহ কপাট', 'পাক পশুদের মারতে হবে চলো রে নাও বাইয়া' প্রভৃতি গান পরিবেশন করা হয়।[১৭৯] এই সকল গানের মধ্য দিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৮০]

বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী (১৯৭১)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার অন্যতম শিল্পী কল্যাণী ঘোষের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের প্রায় ৩৫জন কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্র শিল্পী, আবৃত্তিকারদের নিয়ে বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী গঠিত হয়।[১৮১]এই শিল্পী গোষ্ঠীর নারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মিতালী মুখার্জী, পূর্ণিমা দাশ চৌধুরী, উমা চৌধুরী, জয়ন্তী লালা, দেবী চৌধুরী প্রমুখ।[১৮২] এই শিল্পী গোষ্ঠী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী শিবিরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনে প্রতিনিয়ত সংগীত পরিবেশন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।[১৮৩] এই সংগঠন যে সকল অঞ্চলে জাগরণী গান পরিবেশন করে তার মধ্যে দুর্গাপুর, বর্ধমান, বহরমপুর, আসানসোল, জামশেদপুর, কলালীম, বারাসাত, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট, সল্টলেক, মেদিনীপুর, রবীন্দ্রসদন, মহাজাতিসদন, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮৪]

বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী (১৯৭১)

১৯৭১ সালে গঠিত এই সংগঠনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এ.এইচ.এম কামারুজ্জামানকে প্রধান উপদেষ্টা, কে এম ওবায়দুর রহমানকে কার্যকরী পরিষদের সভাপতি এবং আব্দুল জব্বারকে সাধারণ সম্পাদক করে বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী গঠন করা হয়। এই সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন নুরজাহান মুরশিদ।[১৮৫] এই গোষ্ঠীতে নারী শিল্পীদের মধ্যে স্বপ্না রায়, রমা ভৌমিক, নমিতা ঘোষ, মাধুরী আচার্য, অরুণা সাহা, সুমিতা দেবী প্রমুখ যুক্ত ছিলেন।[১৮৬] বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠীর আয়োজনে ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর কলকাতায় 'বিক্ষুব্ধ' বাংলা গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।[১৮৭] এই অনুষ্ঠানে অন্য শিল্পীবৃন্দের সাথে গীতি আলেখ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন নমিতা ঘোষ।[১৮৮] বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তহবিল সংগ্রহের জন্য সংগীত পরিবেশন করেন। এই শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ পরবর্তীসময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হন।

ভ্রাম্যমাণ শিল্পী সংস্থা (১৯৭১)

১৯৭১ সালে আগরতলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগত সংস্কৃতি কর্মীরা এই সংগঠন গড়ে তোলেন। এ দলটি মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে উদ্দীপনামূলক গান পরিবেশন করতেন। এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ছবি পাল, রুবি পাল, শঙ্করী রায়, সুমিত্রা ভট্টাচার্য, দিলারা হারুন প্রমুখ।[১৮৯]

স্বাধীনতা সংগীত দল (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লার পশ্চিম নোয়াবাদী শরণার্থী শিবিরে স্বাধীনতা সংগীত দল গঠিত হয়। এই সংগঠনটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কুলেন্দু দাস, কল্যাণ দাস, কণিকা দাস, বেবী দাস, কৃষ্ণ দাস, লিপিকা দাস, হেনা, দীপালি রায়, উমা, শান্তি, মুরারী সাহা, মিসেস মুরারী সাহা, শেফালি রায়

প্রমুখ।[১৯০] এই সংগীত দলের শিল্পীরা পশ্চিম নোয়াবাদী শরণার্থী শিবির, গোমতী যুব শিবির, দুর্গা চৌধুরী পাড়া যুব শিবির, ইছামতি যুবশিবিরসহ অন্যান্য যুবশিবিরে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।[১৯১]

কলম-তুলি-কণ্ঠ সংগ্রাম পরিষদ (১৯৭১)

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ সিলেটে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সমস্বর লেখক শিল্পী সংস্থার এক জরুরি সভায় কলম-তুলি-কণ্ঠ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরদিন কবি দিলওয়ারকে সভাপতি, সিরাজউদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক এবং আরতি ধর ও শামসুন্নাহার করিমকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে চল্লিশ জন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতিতে কলম-তুলি-কণ্ঠ সংগ্রাম পরিষদের কমিটি গঠিত হয়।[১৯২] এই দিনের সভায় নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরতি ধর, রুমা ঘোষ, আমিরুন্নেসা খাতুন, কেয়া চৌধুরী, মুক্তা চৌধুরী, জয়া দত্ত, রাখী চক্রবর্তী, শামসুন্নাহার করিম, ফাহমিদা রশিদ চৌধুরী, ফাহমিদা নাহার লিপি প্রমুখ।[১৯৩]

আন্তঃজেলা শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলার সংহতি ও গণবিরোধী যে কোনো কাজ প্রতিহত করাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই সংগঠনের উদ্যোগে ২২ মার্চ 'দুর্জয় বাংলা' শীর্ষক আলেখ্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাথে উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন কেয়া চৌধুরী। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন রাখী চক্রবর্তী, শামসুন্নাহার করিম, রুমা শ্যাম, মুক্তা চৌধুরী, আরতি ধর, সুতপা ভট্টাচার্য, ছন্দা পুরকায়স্থ, জয়া দত্ত, নাসরীন বেগম রোজী, আমিরুন্নেসা খাতুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গানগুলোর মধ্যে ছিল 'জয় জয় দুর্জয় বাংলা', 'আয়রে চাষী মজুর কুলি মেথর কুমার কামার', 'বাংলা ভাষা ডাক দিয়েছে বাংলা তোমার আমার', 'দিকে দিকে ধিকি ধিকি লাল উত্তাল', 'ওগো মা তুলো মুখ মুছো আঁখি', 'আমাদের ইতিহাস পৃথ্বীর সমুদ্র সম্ভাষে ধন্যা', 'সাত কোটি তোর সন্তান আজ বেঁধেছে মিলন রাখী' ইত্যাদি।[১৯৪]

স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘ (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কুমিল্লার স্থানীয় বিক্ষুব্ধ শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা গণসংগীত শিল্পী সুখেন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 'স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘ' গড়ে তোলেন।[১৯৫] এই সাংস্কৃতিক সংঘে সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন জোৎস্না রাণী ভৌমিক, মায়া সাহা, শাকিলা চৌধুরী, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, নীলিমা সাহা, রত্না বিশ্বাস প্রমুখ।[১৯৬] মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস শরণার্থী শিবির, যুব শিবির ও মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবিরাম জাগরণী গান গেয়েছে এ সাংস্কৃতিক সংঘের সদস্যরা। ক্যাম্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পালাটানা, কোনাবন, ধ্বজনগর, খিলপাড়া, রাজারবাগ, মাতারবাড়ি প্রভৃতি। এছাড়া এই সংঘ বিভিন্ন স্কুলের মাঠেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। সুখেন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এ সংঘের গীত গানগুলির মধ্যে ছিল 'যুদ্ধ যুদ্ধ বাংলায় যুদ্ধ', 'ইতিহাস জান তুমি আমরা পরাজিত হইনি', 'ওরা নাকি আমাদের ক্ষেতে আর খামারের সবুজের স্বপ্ন কেড়ে নিতে চায়', 'মা গো তোমার জন্য জীবন দিলাম', 'ভয় কী মরণে', 'আমরা করি না ভয়, 'অত্যাচারের হিমালয়', 'ঐ না নদীর তীরে তীরে সবুজ শ্যামল গাঁওরে'।[১৯৭]

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থা (১৯৭১)

বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের আলোকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হন। প্রচারের উদ্দেশ্যে এ কে এম হারুনুর রশীদ ও জীবন বর্মণের কণ্ঠে দুটি গানও বাণীবদ্ধ

করেন। কিন্তু অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে পাকিস্তানি বাহিনী বেতারকেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেয় এবং এর সকল সদস্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার কলেজটিলায়, এমবিবি কলেজের নির্মীয়মাণ ভবনে ১৯৭১ সালের ৩ জুন পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[১৯৮] এই সংস্থার শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরণার্থী শিবিরে গিয়ে সংগীত পরিবেশন করে, কবিতা পাঠ করে, বক্তব্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেন। মুক্তিকামী প্রতিটি মানুষের মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছিল এই সংস্থা। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্বীকৃত পূর্বাঞ্চলের একমাত্র এই সাংস্কৃতিক দলে দেশের নানা প্রান্তের শরণার্থী শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। এই সংস্থার নারী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেণু চক্রবর্তী, সুমিত্রা ভট্টাচার্য, জয়শ্রী চৌধুরী, মুক্তা চক্রবর্তী, ছায়া রায়, নিয়তি ভূঁইয়া, গীতশ্রী চৌধুরী, দিলারা বেগম, শিথি কর, অনুভা হোর, ছন্দা হোর, ছায়া চক্রবর্তী, সুধা কর।[১৯৯] অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেও এ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। গীতশ্রী চৌধুরী জিবি ও ভিএম হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি এই সংস্থার কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। নারী শিল্পীদের অধিকাংশ কাছাকাছি কোনো শিবির কিংবা আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে থাকতো। সংস্থাটি পূর্বাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি শরণার্থী শিবির, যুবশিবির ও মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রচলিত গানসহ সে সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত অনেক নতুন গানও ধ্বনিত হতো সংস্থার শিল্পীদের মুখে। এ বিষয়ে শিল্পী জয়শ্রী চৌধুরীর স্মৃতিচারণ:

> আমাদের গানে সবাই একাত্ম হয়ে যেত। আবেগে আপ্লুত হয়ে কেউ কেউ কেঁদে ওঠতো। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল উচিয়ে স্লোগান ধরতো ‘জয় বাংলা’। গভীর রাত পর্যন্ত গান হতো। অনেক সময় সারা রাত অনুষ্ঠান করে সকালে কাছাকাছি কোনো শিবিরে অনুষ্ঠান করে ফিরে আসতো দল। ... শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিল। গান গাওয়ার সময় সেই কষ্ট ও যন্ত্রণা বাঙময়রূপ লাভ করতো।[২০০]

এইভাবে এ সংস্থা জুন মাস থেকে ডিসেম্বরে বিজয়ের প্রান্ত পর্যন্ত একের পর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছে।

বাংলাদেশ গণমুক্তি শিল্পী সংস্থা (১৯৭১)

১৯৭১ সালের মার্চের শেষ দিকে আসামের শিলচরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরকে নিয়ে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে স্থানীয় জেলা প্রশাসক, গুরুচরণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসহ অন্যান্যের সহযোগিতায় বাংলাদেশ গণমুক্তি শিল্পী সংস্থা গড়ে উঠে।[২০১] গুরুচরণ কলেজের দুটি কক্ষ এই সংগঠনের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত। বাংলাদেশ গণমুক্তি শিল্পী সংস্থা শিলচর জেলা পাঠাগার এবং বদরপুর রেলওয়ে মিলনায়তনে বড় ধরনের দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা হয় এবং কিছু অর্থ সদস্যদের সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হয়। এ সংস্থার সদস্যসংখ্যা ছিল ২৬ জন। সংগঠনটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন আরতি ধর।[২০২]

শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের সমাজসেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জনাব কে এম ওবায়দুর রহমানকে উপদেষ্টা এবং খোন্দকার আব্দুল হান্নানকে কার্যকরী পরিষদের সভাপতি করে গঠিত হয় শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।[২০৩] এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম দিনাজপুরের বালুর ঘাটের নারায়ণপুরে এবং কলকাতায় যোগাযোগের দপ্তর ছিল নারকেলডাঙ্গা মেইন রোডে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে শরণার্থী শিল্পীগোষ্ঠীর আয়োজনে কলকাতায় ‘এক পথিকের গল্প’ নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয় এবং বহুল প্রশংসিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা, জনমত তৈরি করা এবং তহবিল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা হয়। নৃত্যনাট্য মঞ্চায়ন উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরে শুভেচ্ছা

বাণী দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনার জনাব এম হোসেন আলী, কে এম ওবায়দুর রহমান এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়।[২০৪]
শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তৃপ্তি রায় চৌধুরী। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন বেগম এ এ জলিল। এই গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অনামিকা চাকলাদার, শিখা দাশ, রেখা দাশ, দিপা দাশ, শুক্লা সরকার, সুনন্দা চাকলাদার এবং সংগীতশিল্পী হিসেবে ছিলেন মমতাজ বেগম, আফরোজা মামুন, মিতালী মুখার্জী প্রমুখ। এই সংগঠনের সাথে আরও সম্পৃক্ত ছিলেন জিনাত চৌধুরী, জ্যোতি দাশ এবং মীরা রায়।[২০৫]

মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি। এই সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ তহবিলে জমা দেয়া হতো। **১৯৭১** সালের ৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি যশোরের নাভারণ বাজারে এক বিজয়ানুষ্ঠানের আয়োজন করে।[২০৬] এই সমিতির সদস্যসহ মুজিবনগর সরকারে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন মঞ্জুশ্রী নিয়োগী।[২০৭]

বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিষদ (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আবিদ আলী কর্তৃক রংপুরের (বর্তমান লালমনিরহাট) পাটগ্রামে গঠিত হয় বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিষদ। এই পরিষদের সাথে যে সকল নারী সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বদরুন্নাহার তানি, শামীম আরা (বিউটি), সাজেদা খাতুন, আলম আরা ইকবাল বানু (হেলেন) প্রমুখ।[২০৮]

মুক্তিযুদ্ধ শিল্পীগোষ্ঠী (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত অন্যান্য সংগঠনগুলোর মতো এই সংগঠনও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। এই শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ঝর্ণা ব্যানার্জি, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহীন মাহমুদ, অর্চণা বসু, ডালিয়া নওশীন, মঞ্জুলা দাস গুপ্তা, শান্তি মুখার্জি। এই শিল্পী গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্যই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।[২০৯]

অন্যান্য

নাট্যশিল্পী শিবু ভট্টাচার্য ও সুজেয় শ্যামের সম্পৃক্ততায় হাইলাকান্দিতে সাংস্কৃতিক দল গড়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক দল হাইলাকান্দি ও রামকৃষ্ণ নগরসহ বিভিন্ন স্থানে ফনী ভট্টাচার্য ও শঙ্কর সরকারের লেখা গীতিনাট্য পরিবেশেনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে। এই দলে নারীদের মধ্যে যুক্ত ছিলেন অনিতা সিনহা, ছবি দত্ত, প্রণতি শ্যাম, মুনমুন সোম, মধুমিতা দেব, মহুয়া দেব, তিন্নি দেব প্রমুখ।[২১০] সুদত্তা পুরকায়স্থ এবং তার দুই ভাই নিশীথ পুরকায়স্থ ও নীহার রঞ্জন পুরকায়স্থের উদ্যোগে শিলচরে একটি সাংস্কৃতিক সংঘ গঠিত হয়। তারা বিভিন্ন বৈঠকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতে মুকুন্দ দাসের 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে' গানটি পরিবেশন করতেন।[২১১]

মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যারিস্টার বাদল রশিদের নেতৃত্বে দীলিপ সোমের গীতি আলেখ্য পরিবেশনের জন্য **১৪**জন সদস্যের একটি দল দিল্লি, বোম্বে, গোয়া, পুনা, কানপুর প্রভৃতি জায়গায়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এ দলের অনুষ্ঠান পরিচালক ছিলেন ওয়াহিদা রহমান, সংগীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, সবিতা চৌধুরী। এই দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন মাধুরী আচার্য, স্বপ্না রায়, নমিতা ঘোষ, অরুণা সাহা, রমা ভৌমিক, শান্তি মুখার্জী।[২১২]

মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তাঞ্চলে ও প্রবাসে বিশেষ করে কলকাতা কেন্দ্রিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন যেমন তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ঢাকায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছিলেন ছায়ানটের নির্বাহী সদস্য হোসনে আরা ইসলাম। গোপালগঞ্জের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রেখেছিলেন আভা মণ্ডল। তিনি তার ভাইবোনদের সহায়তায় প্রতি সন্ধ্যায় গণসংগীতের আসর বসাতেন। সেখানে উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করা হত এবং জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হত।[২১৩] পিরোজপুর শহরের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন শাহানা আক্তার ও ক্ষমা দাশগুপ্ত। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন শেফালী ঘোষ, কবরী চৌধুরী, জয়ন্তী লালা, উমা নন্দী, লতা চৌধুরী প্রমুখ।[২১৪]

মূল্যায়ন

পঞ্চাশের দশক থেকে পূর্ব বাংলায় যে সাংস্কৃতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আর প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই সংগঠনগুলো গণসংগীত ও নাটক পরিবেশনাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছে। কোনো কোনো সংগঠন আবার সংস্কৃতিকে মুক্তিসংগ্রামের ধারার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। প্রসঙ্গত উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা যায়। তবে পঞ্চাশের দশক থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গঠিত প্রতিটি সংগঠনেই উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। ঢাকা কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষেত্রে এই কথাটা যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও। চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, কুমিল্লার প্রগতি মজলিস, খুলনার সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, বগুড়ার করতোয়া শিল্পী গোষ্ঠীতেও নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। এমনকি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন সংগঠন সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী এবং ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই প্রগতিশীল সাহিত্য চর্চার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সুফিয়া কামাল, লায়লা সামাদ, শামসুন নাহার মাহমুদ প্রমুখ। পরবর্তীসময়ে ষাটের দশকে নারীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে বেগম ক্লাব। *বেগম* পত্রিকা ও বেগম ক্লাবের কার্যক্রম একদিকে যেমন পূর্ব বাংলার নারী জাগরণে ভূমিকা রেখেছে তেমনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও ত্বরান্বিত করেছে। আবার কিছু কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নারীরা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ছায়ানট প্রতিষ্ঠায় সন্‌জীদা খাতুনের উদ্যোগ এবং অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রয়াস দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। সেই সময় দেশের ভেতরে এবং দেশের বাইরে বিশেষ করে কলকাতা এবং আসামে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠনের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। আর এই সকল সংগঠনেই নারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। তারা মুক্তিযুদ্ধকালে স্থানীয় জনগণ, মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির, যুব শিবির, মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা ও তহবিল সংগ্রহের জন্য গণসংগীত, জাগরণী গান, দেশের গান, মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, নাটক, নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের জন্য তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে নারীদের জয় করতে হয়েছে সামাজিক রক্ষণশীলতাকে। তাই দেখা যায় ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ আয়োজিত 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চায়নের সময় কলেজ ছাত্রী তালেয়া খান এই নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হলেও সামাজিক নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে বিপরীত চিত্রও ছিল। কারণ অনেক প্রগতিশীল, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব তাদের স্ত্রী, বোন বা পরিবারের নারী সদস্যদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের উৎসাহে নারীরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। আবার পারিবারিক বা সামাজিক প্রতিকূলতা দূর করতে পারলেও অনেকেই পড়েছেন সরকারি রোষানলে। তবে সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতা এবং ভয়-ভীতিকে জয় করে নারীরা সাংস্কৃতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পথটি মোটেও মসৃণ ছিল না।

তথ্যসূত্র

১. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০, পৃ. ১২৪।

২. বীণা রানী রায়, *বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী* ১৯৪৭-১৯৭১, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ. ১৮৮।

৩. প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন চিরঞ্জীব দাশ শর্মা, অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, নির্মল মিত্র, স্নেহময় রক্ষিত, গোপাল বিশ্বাস, সুনিল চক্রবর্ত্তী, মাহবুব হাসান, কাঁলাচান, সমীরণ সেন, সুচরিত চৌধুরী, রমেন মজুমদার, সিরাজুল ইসলাম এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরী। (সূত্র: মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১, পৃ. ৮)।

৪. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *স্মৃতির সন্ধানে*, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৫০৭-০৮।

৫. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

৬. সিরাজুল ইসলাম, 'পঞ্চাশ দশকের শুরু: প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

৭. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*।

৮. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১০. শওকত ওসমান, 'স্মৃতিখণ্ড: চট্টগ্রাম', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১১. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

১২. মাহবুব হাসান, 'চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

১৩. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুফিয়া কামালের সম্পূর্ণ ভাষণ দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-৫।

১৪. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

১৫. মাহবুব হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩।

১৬. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১৮. দীন নাথ সেন, 'পঞ্চাশের তরঙ্গ', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

১৯. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

২০. চিরঞ্জীব দাস শর্মা, 'সাংস্কৃতিক চর্চা চট্টগ্রামে', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

২১. মাহবুব হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

২২. শংকর দাশ গুপ্ত, 'পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সাংস্কৃতিক চর্চা: প্রসঙ্গ নৃত্য', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩২।

২৩. মাহবুব হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

২৪. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। শুরু থেকেই এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, অজিত কুমার গুহ, কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, আবদুল গণি হাজারী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফয়েজ আহমদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর,

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, খালেদ চৌধুরী, আবু জাফর ওয়াবদুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুর্তাজা বশীর, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন প্রমুখ।

২৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০২, পৃ. ৮৭।

২৬. লায়লা সামাদ, 'হাসান হাফিজুর রহমান', খালেদ খালেদুর রহমান (সম্পা.), *হাসান হাফিজুর রহমান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: ১৯৮৩, পৃ. ১১৯।

২৭. *দৈনিক মিল্লাত*, ১৬ এপ্রিল ১৯৫৪।

২৮. শেখ মেহেদী হাসান, *নৃত্যচর্চায় ঢাকার নারী*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৬২।

২৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯১।

৩০. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৪, পৃ. ৫৪।

৩১. মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৫৫।

৩২. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা: সওগাত প্রেস, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৪৩।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪৪।

৩৪. ঐ, পৃ. ১৩৪৫।

৩৫. নূরজাহান বেগম, 'বাঙালি নারীর শতবর্ষের প্রান্তকথা', *অন্যদিন*, বৈশাখী সংখ্যা, ১৪১১।

৩৬. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

৩৭. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪৭-৫০।

৩৮. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

৩৯. প্রকৃত নাম রশীদ আহমদ চৌধুরী, 'বুলবুল চৌধুরী' ছদ্মনাম। ১৯১৯ সালের ১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার চুনতি গ্রামে তার জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে গৃহশিক্ষকের নিকট আরবি-ফারসি শেখার মধ্য দিয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯২৪ সালে তিনি হাওড়া প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আইএ, ১৯৩৮ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। নৃত্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবনের ব্রত হিসেবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র থাকাকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নৃত্যশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এ সময় কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী সরোদবাদক সন্তোষচন্দ্র, সুরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর, সাধনা বসু প্রমুখের সঙ্গে বুলবুল চৌধুরীর যোগাযোগ ঘটে, যারা ছিলেন তার প্রতিভা বিকাশের অন্যতম প্রেরণা। ১৯৩৬ সালে সাধনা বসুর সাথে যৌথভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নৃত্যনাট্য 'কচ ও দেবযানী' পরিবেশনে নৃত্যের ক্ষেত্রে তার দক্ষতা প্রকাশ পায়। নাচের সঙ্গে অভিনয় যোগ করে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পরিস্ফুট করে তোলাই ছিল তার নৃত্যনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র ধরনের এবং অসম্প্রদায়িক চেতনা সম্পন্ন। ১৯৩৭ সালে ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন (OFA) প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি নাচের দল নিয়ে ঢাকায় এসে কয়েকটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ১৯৪১ সালের ৩১ মার্চ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'কলকাতা কৃষ্টি কেন্দ্র'। ১৯৫৩ সালে তিনি নাচের দল নিয়ে ইউরোপ যান এবং ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। ১৯৩৪-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় ৭০টি নৃত্যনাট্য রচনা এবং সফলভাবে পরিবেশন করেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নৃত্যনাট্য 'অভিমন্যু', 'ইন্দ্রসভা', 'সাপুড়ে', 'ক্ষুধিত পাষাণ',' শৃঙ্খলের নিপীড়নে', 'দেশপ্রেমিক', 'ভারত ছাড়', 'চাঁদ সুলতানা', 'অজন্তা জাগরণ', 'দি রেইনবো ফেয়ারিজ' প্রভৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তিনি *প্রাচী* (১৯৪২) শিরোনামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়া তার লেখা কয়েকটি

ছোটগল্পও রয়েছে। ১৯৫৪ সালের ১৭ মে কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া, অনলাইন সংস্করণ, প্রবেশের তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

৪০. শাহিদা আখতার, *বুলবুল চৌধুরী*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯০, পৃ. ৫২।

৪১. *বাংলাপিডিয়া*, অনলাইন সংস্করণ, প্রবেশের তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৭।

৪২. আফরোজা বুলবুলের জন্ম ১৯২৬ সালের ৪ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জে। প্রকৃত নাম প্রতিভা মোদক। উচ্চশিক্ষা লাভ করেন লেডি ব্রভাম কলেজে। তিনি ছোটবেলা থেকেই কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও সংগঠনের অনুষ্ঠানে নৃত্য, গান ও মঞ্চ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী সাধনা বোস তাকে বোম্বের চলচ্চিত্র ভুবনে নৃত্য ও অভিনয়শিল্পী হিসেবে নিয়ে আসেন। বোম্বে চলচ্চিত্র ভুবনে এসে তিনি পরিচিত হন অভিনেতা ও অভিনেত্রী মতিলাল, নলিনী জয়বন্ত, ডেভিড দুর্ঘা খোটে এবং চলচ্চিত্র পরিচালক মেহবুব খানের সঙ্গে। ১৯৪১ সালে মেহবুব খানের 'বেহান' চলচ্চিত্র তিনি অভিনয় করেন নলিনী জয়বন্তের সঙ্গে। মেহবুব খানের অপর চলচ্চিত্র 'আসরা'তে সংগীত পরিবেশন করেন। পরবর্তীকালে বোম্বের চলচ্চিত্র ভুবন ভালো না লাগায় আফরোজা বুলবুল কলকাতায় ফিরে আসেন। চল্লিশের দশকে উপমহাদেশের কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে প্রতিভা মোদকের এবং বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বেঁধে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেন। ১৯৪৩ সালে তিনি আফরোজা বুলবুল নাম গ্রহণ করে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যুর পর আফরোজা বুলবুল পাকিস্তানের করাচিতে প্রতিষ্ঠা করেন বুলবুল ইনস্টিটিউট অব কালচার। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সাথেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। নৃত্যশিল্পী আফরোজা বুলবুল মারা যান ১৯৯০ সালে লন্ডনে। (সূত্রঃ আফরোজা বুলবুল, *সুন্দর এই পৃথিবী আমার*, ঢাকাঃ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৫)।

৪৩. মাহমুদ নূরুল হুদা, *আমার জীবনস্মৃতি*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ২৬১-২৬২।

৪৪. *ঐ*, পৃ. ২৯১-২৯২।

৪৫. *ঐ*, পৃ. ২৮০।

৪৬. সেলিনা বাহার জামান, *পথে চলে যেতে যেতে*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ১০১।

৪৭. বাসন্তী গুহঠাকুরতার জন্ম ১৯২২ সালে। তিনি ১৯৩৭ সালে নারায়ণগঞ্জের মর্গ্যান বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য এমএ ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। পরবর্তীকালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি শিক্ষাদানে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৪৪-১৯৮৭ কালপর্বে তিনি গেন্ডারিয়া মনিজা রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬৪-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থিত Tower Hamlets Secondary School for Girls-এ শিক্ষকতা করেছেন। নারী শিক্ষার প্রসারে সুদীর্ঘ ও গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছেন 'কাজী মাহবুবউল্লাহ পুরস্কার ১৯৯১'। এছাড়া গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ও বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদও তার বিভিন্ন সমাজসেবা ও সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি ১৯৯৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। *একাত্তরের স্মৃতি* (১৯৯১), এবং *কালের ভেলা* (১৯৯৪) তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। (সূত্রঃ বাসন্তী গুহঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯১)।

৪৮. মাহমুদ নুরুল হুদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১-২৮৫।

৪৯. সেলিনা বাহার জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১২।

৫০. *ঐ*, পৃ. ১১২।

৫১. *ঐ*, পৃ. ১৩০-৩২।

৫২. মাহমুদ নুরুল হুদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫-৯৬।

৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ এপ্রিল ১৯৬১।

৫৪. সেলিনা বাহার জামান ১৯৪০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাবীবুল্লাহ বাহার, মাতা আনোয়ারা বাহার চৌধুরী। তার স্কুল জীবনের শুরু কলকাতায়। তবে ভারত বিভাগের পর তিনি ঢাকা এসে কামরুন্নেসা স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে এই বিদ্যালয় থেকেই ম্যাট্রিক পাস করেন তিনি। ১৯৫৬ সালে ইডেন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬১ সালে ইডেন কলেজে গণিতের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে বদরুন্নেসা কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে জগন্নাথ কলেজে গণিতের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে এই কলেজে অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই সেলিনা বাহার শিশুশিল্পী হিসেবে ঢাকা বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পরবর্তীসময়ে নৃত্য এবং আবৃত্তিতে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তার সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে *নজরুল পাণ্ডুলিপি* (১৯৯৪) এবং নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে *নজরুলের ধূমকেতু* (২০০১)। এছাড়া সম্পাদনা করেছেন ৭টি স্মারকগ্রন্থ। তিনি ২০০৪ সালের ১ ডিসেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর স্বামী বদিউজ্জামানের উদ্যোগে তার দুইটি পাণ্ডুলিপি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে তার আত্মজীবনীমূলক রচনা *পথে চলে যেতে যেতে* (২০০৬) এবং *কালান্তরে নারী* (২০০৯)।

৫৫. সেলিনা বাহার জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮-৩৯।

৫৬. জিন্নাত গণি, 'আনোয়ারা বাহার সম্পর্কে', সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৬।

৫৭. সেলিনা বাহার জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-৬১।

৫৮. আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর জন্ম ১৯১৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিজগঞ্জে। তার শৈশব কেটেছে মানিকগঞ্জ জেলায়। শিক্ষাজীবনের সূচনা ঢাকায় হলেও ১৯৩৪ সালে প্রবেশিকা পাস করেন কলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল থেকে। আইএ পাস করেন বেথুন কলেজ থেকে। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং ১৯৪০ সালে বিটি পাস করেন। কলকাতার লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীসময়ে তিনি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল, ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুল, ঢাকার কামরুন্নেসা স্কুল এবং বাংলাবাজার হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ১৯৪১ সালে 'সুরবিতান' নামে নৃত্য ও সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাহিত্য চর্চার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *ছবি দেখি ছড়া শিখি*, *কিচির মিচির*, *হরেক রকম*, *বিচিত্রা*, *আমার চেতনার রং*। এছাড়া তিনি 'আপওয়া'র সহসভানেত্রী এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজসেবার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ২৭ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। (তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭)।

৫৯. এম. এ. মোহায়মেন, 'ভুলি নাই', সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

৬০. *ঐ*।

৬১. মাহমুদ নূরুল হুদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬।

৬২. বুলবুল ললিতকলা একাডেমী বিভিন্ন সময়ে যেসব নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছে তার মধ্যে রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চণ্ডালিকা' (১৯৫৮), 'প্রকৃতির লীলা' (১৯৫৮) জসীমউদ্‌দনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯৫৯), কাজী নজরুল ইসলামের 'সিন্ধু' (১৯৬১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামল মাটির ধরাজল' (১৯৬৪) এবং 'মায়ার খেলা' (১৯৬৪), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৬৬), এনামুল হকের 'হাজার তারের বীণা' (১৯৬৭), রফিকুল ইসলামের 'বাদল বরিষণে' (১৯৬৭), এনামুল হকের 'রাজপথ জনপথ' (১৯৬৯) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' (১৯৭০)।

৬৩. সেলিনা বাহার জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

৬৪. মাহমুদ নূরুল হুদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০।

৬৫. সেলিনা বাহার জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।

৬৬. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ২৭৮।

৬৭. *প্রাগুক্ত*।

৬৮. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১১৫।

৬৯. *ঐ*, পৃ. ১১৮।

৭০. *দৈনিক সংবাদ*, ৬ জুলাই ১৯৬৮।

৭১. *ঐ*, ৭ জুলাই ১৯৬৮।

৭২. *ঐ*, ৮ জুলাই ১৯৬৮।

৭৩. *ঐ*, ১০ জুলাই ১৯৬৮।

৭৪. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, পৃ. ৩৭৪-৩৭৬।

৭৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২২।

৭৬. সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা, ভাষা-আন্দোলন: নববর্ষ: ছায়ানট: মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৯১।

৭৭. সন্‌জীদা খাতুন, 'ছায়ানট', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা*, ঢাকা: ছায়ানট, ২০০৬, পৃ. ১০-১১।

৭৮. সন্‌জীদা খাতুন, *সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৬৭।

৭৯. সন্‌জীদা খাতুন, 'ছায়ানট', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪।

৮০. ওয়াহিদুল হক, 'ছায়ানট: আরম্ভ কথা', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৮১. সন্‌জীদা খাতুন, 'ছায়ানট', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

৮২. ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান, 'নিজেকে জয় করবার সাধনা', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

৮৩. সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা: ভাষা-আন্দোলন: নববর্ষ: ছায়ানট: মুক্তিযুদ্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৮।

৮৪. সন্‌জীদা খাতুন, 'ছায়ানটের পহেলা বৈশাখ', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *আলোকের ঝরণাতলায়*, ঢাকা: ছায়ানট, ২০১৭, পৃ. ১৪-১৫।

৮৫. *ঐ*।

৮৬. সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা: ভাষা আন্দোলন: নববর্ষ: ছায়ানট: মুক্তিযুদ্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

৮৭. *ঐ*, পৃ. ১০২।

৮৮. সন্‌জীদা খাতুন, *সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৬-৭৭।

৮৯. সাদিয়া আফরিন মল্লিক, 'আলোয় ভুবন ভরা', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

৯০. ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫।

৯১. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২৭৭।

৯২. সেলিনা বাহার জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

৯৩. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী, ২০০৬, পৃ. ৬২।

৯৪. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭।

৯৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩।

৯৬. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৮৩, পৃ. ১০৩।

৯৭. *মাসিক মাহে নও*, অক্টোবর ১৯৬৮।

৯৮. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৯৯. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ১৭২।

১০০. *প্রাগুক্ত*।

১০১. শুভ রহমান, 'শহীদ মিনারের প্রথম নাটক', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, অমর একুশে বিশেষ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

১০২. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩।

১০৪. সাক্ষাৎকার, কামাল লোহানী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, ঢাকা, ২৯ অক্টোবর ২০১৭।

১০৫. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

১০৬. কামাল লোহানী, *লড়াইয়ের গান*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২০।

১০৭. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

১০৮. মাহমুদ সেলিম ও অমিত রঞ্জন দে, 'উদীচী: বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার', কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.), *উদীচী বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তারাধিকার*, ঢাকা: বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ২০০৯, পৃ. ১৮।

১০৯. *ঐ*, পৃ. ১৯।

১১০. *দৈনিক সংবাদ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

১১১. অমিত রঞ্জন দে, 'নাটক ও সংগ্রামে উদীচী', কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬৩।

১১২. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

১১৩. *ঐ*, ৬ মার্চ ১৯৭১।

১১৪. *ঐ*, ১৬ মার্চ ১৯৭১।

১১৫. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ এপ্রিল ২০১৮।

১১৬. শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ৮৫।

১১৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ মার্চ ১৯৭১।

১১৮. *ঐ*।

১১৯. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ মার্চ ২০১৫।

১২০. *ঐ*।

১২১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ মার্চ ১৯৭১।

১২২. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৭১।

১২৩. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ মার্চ ২০১৫।

১২৪. *ঐ*।

১২৫. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

১২৬. আতিকুর রহমান, 'মুক্তিকামী বাঙ্গালীর প্রেরণার উৎস-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র', রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড: মুক্তিযুদ্ধপর্ব, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ২১৪।

১২৭. বেগম মুশতারী শফীর জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৫ জানুয়ারি। পিতার কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গে। তার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার গেরদা গ্রামে। ১৯৪৯ সালে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় মুকুলের মাহফিলে ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে লেখালেখির সূচনা। ষাটের দশকের প্রথমভাগে নারীমুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে তিনি বান্ধবী সংঘ নামে চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সংঘের মুখপত্র হিসেবে ১৯৬৪ সাল থেকে মাসিক *বান্ধবী* পত্রিকাটি নিয়মিত দশ বছর সম্পাদনা করেন এবং ১৯৬৯ সালে সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত *বান্ধবী*'র নিজস্ব ছাপাখানা মেয়েদের প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার স্বামী ডা. মোহাম্মদ শফী ও তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছোট ভাই এহসান শহিদ হন। তার পরিবার সবসময়ই চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তার পরিবারের ভূমিকা ছিল। উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কিশোর গল্পগ্রন্থ, স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন তিনি। এর মধ্যে *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, *চিঠি জাহানারা ইমামকে* এবং *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন* উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, সৃজনশীল সাহিত্য ও সাহিত্য সংগঠক হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পেয়েছেন অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৪। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ নভেম্বর ২০১৭)।

১২৮. বেগম মুশতারী শফী, 'মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় রণাঙ্গন-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র', সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১১৯-১২০।

১২৯. বেলাল মোহাম্মদ, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দিন', সেলিম রেজা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯২।

১৩০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ১৪তম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২য় সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১৪১।

১৩১. এম. আর আখতার মুকুল, 'স্বাধীন বাংলা বেতারের ধ্বনি', সেলিম রেজা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

১৩২. সাক্ষাৎকার, নাসরীন আহমাদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপ-উপাচার্য কার্যালয় (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬।

১৩৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ৪০৫।

১৩৪. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬, পৃ. ৮৫।

১৩৫. সাক্ষাৎকার, বুলবুল মহলানবীশ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মহাখালী, ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ২০১৭।

১৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৯৯।

১৩৭. বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ২৪২।

১৩৮. সাক্ষাৎকার, বুলবুল মহলানবীশ, *প্রাগুক্ত*।

১৩৯. সাক্ষাৎকার, নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*।

১৪০. তারেক মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১৬৪।

১৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

১৪২. কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৭৫-৭৭।

১৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৯।

১৪৪. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

১৪৫. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১১৬-১১৭।

১৪৬. বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও শব্দসৈনিক*, ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১০, পৃ. ২৫৫-৫৬।

১৪৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

১৪৮. *ঐ*, পৃ. ২৫১-২৫২।

১৪৯. *ঐ*, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

১৫০. *ঐ*, পৃ. ২৬৭-২৬৯।

১৫১. *ঐ*, পৃ. ২৭০-২৭২।

১৫২. *ঐ*, পৃ. ৩০১-৩০৩।

১৫৩. *ঐ*, পৃ. ৩০৮-৩১০।

১৫৪. সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত: বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ২২৬।

১৫৫. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম নারী শিল্পী নমিতা ঘোষ। নমিতা ঘোষ মূলত কীর্তন ও নজরুল সংগীত শিল্পী। জন্ম ১৯৫৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকাতে। তার পিতা হরেন্দ্র ঘোষ, মাতা যশোধা ঘোষ। পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন জগন্নাথ কলেজ থেকে। তিনি ওস্তাদ বারীন মজুমদার, পিসি গোমেজ, মুন্সি রইসউদ্দীন, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী, জাহেদুর রহিম সহ প্রখ্যাত সংগীত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় নমিতা ঘোষ এবং তার পরিবার ঢাকা ছেড়ে কলকাতা চলে যান। এ সময় দেশের জন্য কিছু করার অভিপ্রায়েই সংগীতকে অস্ত্র করে যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। 'নোঙর তোলো তোলো', 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবে'সহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রায় সব গানেই নমিতা ঘোষ কণ্ঠ দিয়েছেন। (সূত্র: নমিতা ঘোষ, 'আমি ও একাত্তর', জাহিদ হোসেন (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৫, পৃ. ৯৮)।

১৫৬. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক ছিলেন কল্যাণী ঘোষ। কল্যাণী ঘোষের জন্ম ১৯৪৬ সালের ৬ মে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারে। পিতা মনমোহন চৌধুরী এবং মাতা লীলাবতী চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে সংগীত পরিবেশন করেছেন। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংগীত শিল্পী কল্যাণী ঘোষ মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে বহুল প্রচারিত 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'নোঙর তোলো তোলো', 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম', 'আহা ধন্য আমার জন্মভূমির পুণ্য সলিলে' ইত্যাদি দেশাত্মবোধক গানে কণ্ঠ দিয়ে জাতিকে উজ্জীবিত করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রায় ২৫-৩০ জন শিল্পীকে নিয়ে ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্প, মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প, ভারতের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে সংগীত পরিবেশন করেন। কল্যাণী ঘোষের দুই বোন উমা খান এবং পূর্নিমা দাসও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শব্দসৈনিক ছিলেন। (সূত্র: তারেক মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা ,আগামী প্রকাশনী ,২০১৩ ,পৃ.৯১)।

১৫৭. বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মৃন্ময় দাসগুপ্তের স্ত্রী মঞ্জুলা দাসগুপ্তা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শব্দসৈনিক। মঞ্জুলা দাসগুপ্ত ১৯৪০ সালে রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শ্রী অমল চন্দ্র সেনগুপ্ত, মাতা শ্রীমতি শেফালি সেনগুপ্ত। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। ওস্তাদ শ্রী কালিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সাধক চন্দ্রের কাছে তিনি সংগীতে তালিম নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মঞ্জুলা দাসগুপ্তা তার পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমেই যোগ দেন বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থায়। এরপর তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেশ কিছু গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'জয় বাংলা বাংলার জয়',' তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর', 'নোঙর তোলো তোলো', 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই' ইত্যাদি। (সূত্রঃ তারেক মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫)।

১৫৮. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিক হিসেবে ভূমিকা রাখেন শীলা ভদ্র। শীলা ভদ্রের জন্ম ১৯৫২ সালের ১৭ অক্টোবর কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার শ্রীকাইল গ্রামে। তার পিতা ভানুরাম চন্দ্র, মাতা মানু ভদ্র। সংগীতে তার হাতে খড়ি হয়েছিল ওস্তাদ নারায়ণ চন্দ্র বসাকের কাছে। পরবর্তীসময়ে তিনি ঢাকা মিউজিক কলেজ থেকে সংগীতে ডিপ্লোমা করেছেন। মূলত তিনি ক্লাসিক্যাল গানের শিল্পী। ১৯৭১ সালে তিনি নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। তখন তিনি ও তার পরিবার কলকাতা চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বেশ কিছু গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর', 'নোঙর তোলো তোলো'। তার অপর দুই বোন শীপ্রা ভদ্র ও শুক্লা ভদ্র তার সহযোদ্ধা ও শব্দসৈনিক হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতারে অংশ নেন। (সূত্রঃ তারেক মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০)।

১৫৯. ডালিয়া নওশীন পাঁচ বছর বয়সে সুধীন দাশের কাছে উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত ও নজরুল সংগীতে দীক্ষা নেন। ১৯৭৩ সালে ছায়ানট থেকে সংগীতের উপর পাঁচ বছর মেয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সময় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরকুট কন্নাবিরণ, বারীণ মজুমদার, জসরাজ, সগিরউদ্দিন খান, মাসকুর আলী খান, সোহরাব হোসেন, শেখ লুতফর রহমান, ওস্তাদ ফুল মুহাম্মদের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেতারে বিশেষ গ্রেডের শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত। তিনি ভারতের বর্ধমানে অবস্থিত অন্তর সংগীত মহাবিদ্যালয় এবং চণ্ডীগরের প্রাচীন কলা কেন্দ্র থেকে উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত ও নজরুল সংগীতে 'সংগীত বিশারদ' উপাধি লাভ করেন। সংগীতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০২০ সালে একুশে পদক প্রদান করে। (সাক্ষাৎকার, ডালিয়া নওশীন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ জাতীয় জাদুঘর, সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, শাহবাগ, ঢাকা, ৫ জুলাই ২০১৯)।

১৬০. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

১৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৯৯।

১৬২. জাহিদ হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

১৬৩. তারেক মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৬৪. বেগম মুশতারী শফী, 'স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্মকথা', মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, ঢাকাঃ সিডিএল, ২০০৬, পৃ. ৩৩৪।

১৬৫. বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-২৭১।

১৬৬. বেলাল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

১৬৭. *ঐ*, পৃ. ১১৮।

১৬৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪১২।

১৬৯. সাক্ষাৎকার, মুনতাসীর মামুন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ৬৩/বি, গিয়াসউদ্দিন আবাসিক এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬।

১৭০. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

১৭১. *ঐ*, পৃ. ৮৬।

১৭২. ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি তাদের সমিতির প্যাডে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের একটি সনদপত্র প্রদান করেন। নমুনা সনদপত্র দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-৬।

১৭৩. কামাল লোহানী, *মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

১৭৪. *দৈনিক সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

১৭৫. সাক্ষাৎকার, শাহীন মাহমুদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ২৮ মার্চ ২০১৭।

১৭৬. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

১৭৭. সাক্ষাৎকার, শীলা দাশ (মোমেন), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ৪/বি, শহীদ আবুল খায়ের ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

১৭৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

১৭৯. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।

১৮০. মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার কর্মকাণ্ড নিয়ে মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন প্রামাণ্যচিত্র (জয় বাংলা) ক্যামেরায় ধারণ করেন। তিনি এই দলের সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে এই প্রামাণ্য চিত্র ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ সেটি সম্পাদনা করে 'মুক্তির গান' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে গণসংগীত আন্দোলনের একটি প্রামাণ্য দলিল এই চলচ্চিত্রটি। এই প্রামাণ্যচিত্রে যে সকল নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন লুবনা মরিয়ম, শাহীন মাহমুদ, শারমীন মুর্শিদ, নায়লা জামান প্রমুখ।

১৮১. কল্যাণী ঘোষ, 'অস্ত্রের নাম সংগীত', মহিউদ্দিন আহমদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, ঢাকা: সিডিএল, ২০০৬, পৃ. ৩৭৯।

১৮২. বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-৭।

১৮৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

১৮৪. কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*।

১৮৫. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

১৮৬. বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-৮

১৮৭. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭, পৃ. ১৪১।

১৮৮. আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *স্বাধীন বাংলা বেতারের সেই মেয়েটি*, ঢাকা: ত্রিভুজ প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪।

১৮৯. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

১৯০. স্বাধীনতা সংগীত দলের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-৯।

১৯১. মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষ্য*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৭, পৃ. ১১৮-২০।

১৯২. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

১৯৩. *প্রাগুক্ত*।

১৯৪. *ঐ*।

১৯৫. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১৭।

১৯৬. স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-১০।

১৯৭. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১৭।

১৯৮. *ঐ*, পৃ. ১০৬-০৭।

১৯৯. বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীদের নামের তালিকা, দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-১১।

২০০. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

২০১. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

২০২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠসৈনিক আরতি ধর। জন্ম ১৯৪৫ সালে সিলেটে। পিতা বনবিহারী ধর, মাতা শুধারাণী ধর। ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল তার। ১৯৬২ সাল থেকে বেতারের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে গান গাওয়া শুরু করেন। পরবর্তীসময়ে ঢাকা থেকে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হলে ১৯৬৬ সাল থেকে টেলিভিশনে গান গাইতেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ 'গণমুক্তি শিল্পী সংস্থা'র সাথে সম্পৃক্ত হন। বিভিন্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন তিনি এবং তার সহকর্মীরা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবারও বেতার এবং টেলিভিশনে নিয়মিত শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশেন করেন। বিশেষ করে সিলেটের বিভিন্ন আঞ্চলিক গান, শাহজালালকে নিয়ে ভক্তিমূলক গান এবং হাসন রাজার গানে রয়েছে তার বিশেষ খ্যাতি। (হোসাইন আব্দুল হাই, 'বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা আরতি ধর', www.dw.com, প্রবেশের তারিখ , ২৪ অক্টোবর ২০১৯)।

২০৩. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

২০৪. *প্রাগুক্ত*।

২০৫. শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-১২।

২০৬. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

২০৭. মঞ্জুশ্রী নিয়োগীর জন্ম ১৯৪৫ সালের ১০ অক্টোবর শেরপুরে। তার বাবা রবি নিয়োগী এবং মা জ্যোৎস্না নিয়োগী। তার বাবা-মা দুজনই তেভাগা আন্দোলন ও টংক আন্দোলনসহ নানা আন্দোলন সংগ্রামে সম্পৃক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি স্নাতক শেষ করে ঢাকায় সমাজকল্যাণ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে পুনরায় শেরপুরে ফিরে যান। এপ্রিল মাসে তিনি ভারতে যান এবং মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে গান গাইতেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। (হোসাইন আব্দুল হাই, 'মুক্তিযুদ্ধের সাহসী কণ্ঠযোদ্ধা মঞ্জুশ্রী নিয়োগী', www.dw.com, প্রবেশের তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৯)।

২০৮. বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-১৩।

২০৯. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

২১০. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

২১১. *ঐ*।

২১২. জাহিদ হোসেন প্রধান, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১০১।

২১৩. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

২১৪. *ঐ*।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে নারী

ভাষা আন্দোলন- উত্তরকালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিশেষ করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে তার প্রভাব এই সময়ের সাহিত্যেও লক্ষণীয়। ভাষা আন্দোলন উত্তর বাঙালি জাতিসত্তা চেতনার লালন ও শিল্প সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটানো ছিল এ সময়ের মুখ্য সাহিত্য প্রবণতা। এই সময়ের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নারীরাও প্রধানত উল্লিখিত চেতনাধারায় স্নাত হয়েছেন। নারী কবি-সাহিত্যিকরা তাদের বিভিন্ন লেখনীতে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়কে চিত্রায়িত করেছেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পত্র-পত্রিকায় তাদের লেখনীও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৫২-১৯৭১ পর্যায়ে ঢাকার উল্লেখযোগ্য সাময়িক ও সাহিত্যপত্র হচ্ছে *মাহেনও*, *মোহাম্মদী*, *অগত্যা*, *সওগাত*, *বেগম*, *অনন্যা*, *সমকাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের গবেষণা জার্নাল সাহিত্য পত্রিকা এবং বাংলা একাডেমি পত্রিকা। এ সব পত্র পত্রিকার মধ্যে *মাহেনও*, *অনন্যা* এবং *বেগম* পত্রিকাতেই মূলত নারীরা নিজেদের লেখা প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছেন।[১] কিন্তু *মাহেনও* ও *মোহাম্মদী* ছিল মূলত পাকিস্তানি ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক।[২] তবে বিশ শতকে *বেগম* পত্রিকা নারীদের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পথকে প্রশস্ত করার পাশাপাশি নারীদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা করেছিল। বর্তমান অধ্যায়ে *বেগম* পত্রিকায় পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করা হবে। একই সাথে যে সকল নারী কবি-সাহিত্যিক ১৯৫২-১৯৭১ পর্বে তাদের লেখনীতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকসহ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরেছেন তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

বেগম পত্রিকায় প্রতিফলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতার ১২ নং ওয়েলসলী স্ট্রীট থেকে *বেগম* পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সুফিয়া কামাল, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন নূরজাহান বেগম।[৩] ১৯৫০ সালের মে মাসে বেগম ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানের একটি আধুনিক পত্রিকায় আমরা যে বিভাগগুলো দেখি, লেখিকাদের সংখ্যা কমসহ অন্যান্য অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও *বেগম* পত্রিকাতেও আমরা সেই বিভাগগুলো দেখতে পাই। পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকেই যারা নিয়মিত লেখা দিয়ে পত্রিকাটিকে সচল রেখেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া কামাল, শামসুন নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, রাজিয়া খাতুন, জাহানারা আরজু, নূরুন নাহার, মাজেদা খাতুন, বেগম আফসারুন্নেসা, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আইনুন নাহার, সুরুচিবালা সেনগুপ্ত, হাসিরাশি দেবী, হুসনা বানু খানম, নাসিমা বানু, ইন্দিরা দেবী, রাবেয়া খাতুন, প্রতিভা বসু, মোখলেসা খাতুন, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, সুপ্রভা সেন, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, খোদেজা খাতুন, তাহমিনা বানু, সালেহা চাকলাদার, প্রশান্তি দেবী, আয়েশা নোমান, বেগম আজিজা এন মোহাম্মদ, লায়লা সামাদ, হাজেরা খাতুন, সবিতা ঘোষ, সেলিনা পন্নী, রোকেয়া আনোয়ার, জোবেদা রহীম, নূরুন নাহার জুহুর, প্রতিভা গাঙ্গুলী, কাজী আমিনা বেগম, রেবেকা সুলতানা চৌধুরী, সাহেরা সরকার, যোগমায়া দেবী, মনোয়ারা মাহবুব, মঞ্জুলিকা দাসগুপ্ত, লায়লী চৌধুরী, উর্মিলা দাসগুপ্তা, নইমা হোসেন, আনোয়ারা বেগম, রওশন আরা খান, আমিনা বেগম, হামিদা দিলশাদ, সৈয়দা সুফিয়া সাহিত্যরত্ন, নূরজাহান আহমেদ, জাহান আরা রহমান, মাহমুদা খাতুন, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সেন, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, ঝর্ণাদাস পূরকায়স্থ, নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ।[৪]

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই *বেগম* পত্রিকায় বেশকিছু সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে নারীরা রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ জুলাই 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে মিসেস এম. এ. হক বলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, তা লইয়া বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, কেহ বলিতেছেন উর্দু, আবার কেহ ইংরাজীর কথাও বলিতেছেন। ... সমগ্র পাকিস্তানের তিনভাগের প্রায় দুই ভাগ অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে এবং ইহাদের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা ... সেহেতু রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সর্বাপেক্ষা প্রবল বাংলা ভাষার।"[৫] ১৯৪৭ সালে *বেগম* পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়:

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে আজ বিভিন্ন পত্রিকায় যে সব আলোচনা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় সর্বসম্মতভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের দাবী এই যে, সমগ্র পাকিস্তানে না হোক-অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে। তার অর্থ এই যে, পাকিস্তানে দুটি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে। সমগ্র পাকিস্তানে বাংলা বা উর্দু কোনো ভাষাকেই এককভাবে রাষ্ট্রভাষা করা সমর্থন করা যায় না। ... কিছুদিন পূর্বে ড. জিয়াউদ্দিনের মতো একজন মনীষী বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে উর্দু এবং শিক্ষার মাধ্যমও হবে উর্দু। ... ড. শহীদুল্লার মতো মনীষীগণ এই মতের বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের নারী সমাজও যে অচেতন নন তার প্রমাণ 'বেগম'-এর গত সংখ্যায় এবং বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত এই বিষয় নিয়ে লেখা দুটি প্রবন্ধ। আশা করি যে, আমাদের নারী সমাজ সমগ্রভাবে বাংলা ভাষাকে সমর্থন করবেন।[৬]

বাংলা ভাষাকে সমর্থন করে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামের এক প্রবন্ধে মোহসেনা ইসলাম লিখেন:

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক উঠছে। কেউ কেউ উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার পক্ষে ওকালতী করছেন, আবার কেউ বাংলা ভাষাকে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান আজো হয়নি। ...পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হচ্ছে বাংলা। বাংলা ভাষা পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর প্রাণের ভাষা ... বিশ্বের দরবারে আজ বাংলা সাহিত্য এক শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। ...পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাধারণ শিক্ষিতের হার আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ভেতর অধিকাংশই অল্প বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত। এমতাবস্থায়, রাষ্ট্রের যে কোনো দোষ-ত্রুটি, অভাব-অভিযোগ জানাতে হলে এমন একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন যদ্দ্বারা দেশের জনগণ অনায়াসেই রাষ্ট্রের সম্মুখে তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারে এবং তারাও তা' সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাই তাদের কাছে সাধারণ ভাষা ...পাকিস্তান সরকার যেন উর্দ্দুর মত অপরিচিত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ না করেন তজ্জন্য নারী সমাজের পক্ষ থেকে আমরা অনমনীয় দাবী জানাচ্ছি।[৭]

বেগম আফসারুন্নেসা বি-এ 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামের এক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে সমর্থন করে বলেন:

> স্বাধীনতা লাভের পর যেসব সমস্যা আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রভাষা নির্ব্বাচন তাদের অন্যতম। এই নির্ব্বাচনের উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে, এর গুরুত্ব সুদূর প্রসারী...সৌভাগ্যের বিষয় রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চিন্তার স্বাধীনতার যুগেও পদার্পণ করছি, তাই আজ রাষ্ট্রভাষা নির্ব্বাচনের অধিকার পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের– মোট কথা বাংলার চাষী মজুর থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত ভদ্র সন্তান-যাঁরা বাংলার মাটী-জলে মানুষ-যারা বিদেশ থেকে আমদানী হয়ে বিদেশী হয়ে থাকেননি- যাঁরা মুসলমান অথচ বাঙ্গালী। বহুযুগের মরণ ঘুম থেকে বাঙ্গালী মুসলমান জেগে উঠেছে-রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তার চিত্ত জগতে এনেছে ভাবের বিপ্লব-তার নব নব চিন্তা, নব নব আশা, আকাঙ্ক্ষা, রূপ পেতে চায়– ভাষা পেতে চায়। এই মুহূর্ত্তে তার

জবানকে আরও দশবিশ বছরের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা মুর্খতা নয় কি? বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে এত বড় শুভ দিন আর আসেনি– মুসলমান রাজত্বকালেও তারা উপেক্ষিত হয়েছিলেন-রাজ দরবার আগলে ছিল বিদেশীরা– এতকাল পরে বাঙ্গালী মুসলমান জেগেছে নিজের স্বার্থ নিয়ে বৈশিষ্ট্য নিয়ে– আজ সে কেবল মুসলমানই নয়, বাঙ্গালীও বটে– বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে তার কোনো অগৌরব নেই।... কেউ-যেন-মনে না করেন আমি বাঙ্গালী মুসলমানের স্বার্থকে আলাদা করে দেখে প্রাদেশিকতার পরিচয় দিচ্ছি। ব্যষ্টিকে নিয়ে সমষ্টি। ব্যষ্টির স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থের কাছে বলি দেওয়া ফ্যাসিষ্ট নীতি। তাতে ইসলামের সমর্থন থাকতে পারে না।[৮]

তিনি রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কথাও বিবেচনা করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৫২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মোসফেকা রহমান, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন:

ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান দু'অংশে বিভক্ত- পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ রয়েছে যথা:- সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান। এদের নিজ নিজ মাতৃভাষাও রয়েছে। যেমন: সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পস্তু ও বেলুচ। পূর্ব্ব পাকিস্তান পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সিলেট জেলা নিয়ে গঠিত।... রাষ্ট্র নায়কেরা উর্দ্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করতে চাইছেন। কিন্তু পাকিস্তানের সকল অংশ এই বিবেচনাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের কথিত ভাষা হিসেবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গণিত করবার দাবী জানাচ্ছেন।...উর্দ্দুভাষা বংলাদেশে প্রচলন করলে বাংলাভাষীদের গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি শিশু জ্ঞানলাভের পর থেকেই উর্দ্দু শিখতে ও বলতে অভ্যস্ত হয়; অপরদিকে পূর্ব্ব পাকিস্তানী প্রথম শেখে বাংলা, উর্দ্দু তাকে পরে শিখতে হবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। এতে শিশুমনের উপর বড্ড বেশী চাপ পড়বে পশ্চিমী শিশু অপেক্ষা বাঙ্গালী শিশুর দ্বিগুণ শক্তি ক্ষয় হবে।...সমান শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ভাষা বিভ্রাটের দরুণ যুগযুগান্তর ধরে বংশ পরাক্রমে বাঙ্গালী পিছনে থাকবে।[৯]

তিনি প্রবন্ধে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিশেষ করে শিশুরা এর ফলে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। ভাষা বির্তকের সূচনালগ্ন থেকেই নারীরা এই বিষয়ে *বেগম* পত্রিকায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের লিখিত প্রবন্ধ সাধারণ নারীদেরকে ভাষাবির্তকের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করতে ভূমিকা রাখে। পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও বাংলা ভাষার সমর্থনে বিভিন্ন বক্তব্য প্রকাশিত হয়। এছাড়া অনেক নারী চিঠিপত্রের মাধ্যমেও ভাষা প্রশ্নে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামের মতই মুক্তিযুদ্ধের সময়ও নারীদের উৎসাহিত করতে *বেগম* পত্রিকা ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধের সময় নারীদেরকে তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ *বেগম* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ আবার জেগে উঠেছে। আবার বাংলার কোটি কোটি বীর সন্তান অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।... গত ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বরেণ্য নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে চূড়ান্ত ঘোষণা করেছেন, তাতে প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিপাগল বাংলার প্রতিটি অধিবাসীর মনোভাব।... বাঙ্গালীর এই বাঁচার সংগ্রামে কিশোর যুবক ও বৃদ্ধের পাশাপাশি রাজপথে নেমে এসেছে অগণিত কিশোরী, যুবতী আর বৃদ্ধা। মিছিলে মিছিলে তাদের ঐ দৃপ্ত স্লোগান আজ দশ দিগন্তে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।... শুধু শিক্ষায়তনের চার-দেয়ালে নয়, শুধু রাজপথের মিছিলে নয়, বাংলার সংগ্রামী নারী-সমাজ আজ পুরুষের সমান তৎপর হয়ে উঠেছে শহরে-নগরে, গ্রামে গ্রামান্তরে। সংসার সাজানোর সীমাবদ্ধ-ভাবনার বেড়াজাল ছিন্ন করে বাংলার বীরাঙ্গনারা আজ গুলিবিদ্ধ মুক্তি-সংগ্রামীর সেবাকল্পে এসে দাঁড়িয়েছে নার্সের বেশে। রক্তহীনতায়

যেসব বীর যুবক আজ মৃত্যুপথযাত্রী, তাদের আহত শরীরে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগাবার আশায় সে আপন রক্ত উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছে ব্লাড-ব্যাঙ্কের ভীড়াক্রান্ত করিডোরে। বিক্ষোভ আর অসহযোগ মিছিলে দলে দলে পথে বেরিয়েছেন গৃহিণী, গায়িকা, লেখিকা, শিক্ষার্থিনী, শিক্ষিকা, অভিনেত্রী প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের মহিলাগণ। জীবনের চলার পথে মেয়েরা আজ পুরুষের সহগামিনী। কিন্তু সে যাত্রা যে কেবল সংসারের ক্ষীণ-গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ নয়, এবারের মহাসংগ্রামে তাঁরা তা সুপ্রমাণিত করেছেন। আজকের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নারীদের একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রাণের যে জোয়ারে একবার তারা অবগাহন করেছেন, সে অনুভূতিকে স্থায়ী রাখতে হবে। স্থায়ী রাখতে হবে এজন্যেই যে, সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। আরো বড় আঘাত প্রতিহত করার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ঘোষণায় শেখ মুজিব বলেছেন, 'আপনারা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন।' ঘরে ঘরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলে ঘরনীকেই সবার আগে তৎপর হতে হবে। এই তৎপরতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা স্তরে প্রসারিত। বাংলার নারীদের আরো পরিশ্রমী, আরো ধৈর্যশীলা হবার প্রয়োজন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীর যে-ভূমিকা রয়েছে, তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে যেতে হবে।... অসংখ্য নারী আজ একাধিক শিল্প কাজের সাথে জড়িত! সংগ্রামের সময় যাতে দেশের উৎপাদন ব্যাহত না হয় সেদিকে সজাগ থাকা তাদের অন্যতম কর্তব্য।... বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যে এই বাংলার মাটিতেই জন্মেছিলেন, তা যেন আমরা ভুলে না যাই। আসুন, বাংলার এ মুক্তি-সংগ্রামকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি আমরাও আমাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর হই। সেই সঙ্গে আর একবার স্মরণ করি বিদ্রোহী কবি নজরুলের সেই অমর-অভিমত:

> কোনোকালে একা হয়নিকো জয়ী
>
> পুরুষের তরবারি,
>
> শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে
>
> বিজয়লক্ষ্মী নারী।[১০]

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্বের উল্লেখযোগ্য নারী লেখকরা হলেন: হোসনে আরা, দৌলতননেছা খাতুন, জোবেদা খানম, জেব-উন-নেসা জামাল, রাজিয়া মাহবুব, লায়লা সামাদ, সন্‌জীদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, নাহার কামাল আহমদ, রাজিয়া খান, আখতার ইমাম, মেহের কবীর, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, হামিদা রহমান, হেলেনা খান, জাহানারা ইমাম, মনোয়ারা বেগম, রাজিয়া মজিদ, খালেদা সালাহউদ্দিন, দিলারা হাশেম, মকবুলা মনজুর, বদরুন্নেসা আবদুল্লা, আনোয়ারা রহমান এ্যানা, রিজিয়া রহমান, নীলুফার বেগম, সালেহা চৌধুরী, দিলারা জামান, ফরিদা হোসেন, সালমা নাসির, ডলি, সেলিনা হোসেন, দিলদার বেগম, রোকেয়া আখতার, নিলুফার হোসেন, পার্ব্বতী দেবী, নীহারিকা, নূরুন্নাহার প্রমুখ।[১১]

বেগম পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন কবি হোসনে আরা[১২] (১৯১৬-৯৮)। তার লেখা প্রথম কবিতার বই *ফুলঝুড়ি* প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় নির্বাচিত কবিতার সংকলন *মিছিল*। *মিছিল* সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর লেখা হোসনে আরার একটি বিখ্যাত কবিতা।[১৩]

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দৌলতননেছা খাতুন[১৪] (১৯২২-১৯৯৭)। তার প্রথম উপন্যাস *পথের পরশ* (১৯৫৭) এবং দ্বিতীয় উপন্যাস *বধূর লাগিয়া* (১৯৬২) প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি সমালোচক ও পাঠকমহলে উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত হন। পরবর্তীসময়ে *নাসিমা ক্লিনিক*, *কমরপুরের ছোট বৌ*, *বিবস্ত্র ধরণী* শিরোনামে আরও তিনটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি ছোটগল্প, নাটক এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। বেশকিছু প্রবন্ধও রচনা করেছেন তিনি, যেগুলো সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৯

ডিসেম্বর *সৈনিক* পত্রিকায় 'ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি আরজি' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'যে ভাষায় প্রথম মা বলিয়া ডাকিয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি, ঝগড়া করিয়াছি, যে ভাষার সহিত আমাদের বত্রিশ নাড়ীর বহু যুগ-যুগান্তরের অবিচ্ছিন্ন মিশ্রণ; বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই চিক্কণ শ্যামলিয়া ভূপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য ঋত বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলাইয়া-মিশাইয়া একান্ত তাহারই হইয়া বড় হইয়াছি, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাঁচিব কি লইয়া"?[১৫] দৌলতননেছা খাতুনের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। একজন বাঙলি মুসলিম নারী হিসেবে সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় সাময়িক পত্রিকায় গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ ঘটে রাবেয়া খাতুনের[১৬](১৯৩৫)। ষাটের দশকের সূচনা থেকেই তিনি উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন এবং ক্রমে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তার উপন্যাসসমূহের মধ্যে রয়েছে *মধুমতি* (১৯৬৩), *সাহেব বাজার* (১৯৬৫), *অনন্ত অন্বেষা* (১৯৬৯), *শালিমারবাগ রাজারবাগ* (১৯৬৯), *মন এক শ্বেত কপোতী* (১৯৬৭)। উপন্যাসের বিপুল ভাণ্ডারের পাশাপাশি রয়েছে তার অসংখ্য ছোটগল্পগ্রন্থ এবং ভ্রমণকাহিনী। এছাড়া তার স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ *একাত্তরের নয় মাস* (১৯৯০) এবং *স্বপ্নের শহর ঢাকা* (১৯৯৪) তে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ঢাকার নগরজীবনের নানা উপাত্তের সন্ধান পাওয়া যায়।

সমসাময়িক সৃষ্টিশীল নারীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লায়লা সামাদ[১৭] (১৯২৮-১৯৮৯)। তার রচিত ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হলো, *দু:স্বপ্নের অন্ধকারে* (১৯৬৩), *কুয়াশার নদী* (১৯৬৫), *অরণ্যে নক্ষত্রের আলো* (১৯৭৫), *অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা* (১৯৭৮)। *আদিম স্বপ্নে বসতি* (১৯৮৮) তার রচিত একমাত্র উপন্যাস। এছাড়া মাসিক *অনন্যা* এবং মাসিক *চিত্রিতার* সম্পাদক হিসেবেও তিনি স্মরণীয়।

পঞ্চাশের দশকের একজন প্রতিভাধর লেখক ছিলেন রাজিয়া খান[১৮](১৯৩৬-২০১১)। তিনি বাংলাদেশের উপন্যাসে বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই আধুনিকবাদকে আবাহন করেছেন। উপন্যাস, নাটক, কবিতাসহ সাহিত্যের সবগুলো শাখায় তার সমান পদচারণা ছিল। ১৯৫৮ সালে তার প্রথম সাহিত্যকর্ম *বট তলার উপন্যাস* প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে দেশভাগজনিত সংকট এবং উপমহাদেশের বিশাল ভৌগোলিক পরিসরে সৃষ্ট সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তার রচিত অন্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *অনুকল্প* (১৯৫৯), *প্রতিচিত্র* (১৯৭৬), *চিত্রকাব্য* (১৯৮০), *দ্রৌপদী* (১৯৯৩), *পাদবিক* (১৯৯৮)। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *দ্রৌপদী* পাঠকমহলে খুব সমাদৃত হয়েছে। তার কবিতা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Arus* (১৯৭৮), *Cruel April* (১৯৭৭) এবং *সোনালী ঘাসের দেশ* (১৯৭৮)।

এই সময়ে আবির্ভূত নারী লেখকদের মধ্যে আখতার ইমাম[১৯] (১৯১৭-২০০৯) বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। ১৯৭০ সালে রম্য গল্পের গ্রন্থ *গল্প নয়* প্রকাশের মাধ্যমে ঢাকার সাহিত্য জগতে তার আবির্ভাব। সাহিত্য জগতে তার আবির্ভাব তুলনামূলকভাবে বিলম্বিত হলেও প্রবন্ধ-গবেষণা, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথামূলক রচনায় তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। তিন খণ্ড আত্মজীবনীসহ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৮টি।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত *গজ কচ্ছপ* গ্রন্থের মাধ্যমে ঢাকার সাহিত্য জগতে আবির্ভাব ঘটে জাহানারা ইমামের[২০] (১৯২৯-৯৪)। তবে তার লেখকসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা নিয়ে তার স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৬) ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদায় অভিসিক্ত।

সমসাময়িক কালে বাংলাদেশের প্রধান নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম রাজিয়া মজিদ[২১] (১৯৩০-২০১৮)। ষাটের দশকে সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। ১৯৬৬ সালে *তমসাবলয়* উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যজগতে তার আবির্ভাব হয়। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *দিগন্তের স্বপ্ন*। উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, আলেখ্য, জীবনীসহ রাজিয়া মজিদের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি।

সমসাময়িক অপর বিশিষ্ট কথাশিল্পী দিলারা হাশেম[২২] (১৯৩৬)। ১৯৬৫ সালে তার প্রথম উপন্যাস *ঘর মন জানালা* প্রকাশিত হয়। এটি পাঠক ও সমালোচক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তীসময়ে এই উপন্যাসটি রুশ এবং চীনা ভাষায়ও অনূদিত হয়। তার প্রকাশিত অন্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, *একদা এবং অনন্ত* (১৯৭৫), *স্তব্ধতার কানে কানে* (১৯৭৭), *আমলকীর মৌ* (১৯৭৮), *কাকতালীয়* (১৯৮৫)। ছোটগল্প রচনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭০ সালে তার প্রথম ছোটগল্পের বই *হলদে পাখীর কান্না* প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য সময়স্তরের অন্যতম সাহিত্যিক মকবুলা মনজুর[২৩] (১৯৩৮-২০২০)। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *আর এক জীবন* (১৯৬৮)। তবে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশেই তার অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি তার রচনায় ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট, নারীর বিবিধ সংকট প্রভৃতি বিষয় চিত্রায়িত করেছেন। তিনি তার *কালের মন্দিরা* (১৯৯৭) উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরেছেন।

সমসাময়িক কালের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী রিজিয়া রহমান[২৪] (১৯৩৯-২০১৯)। সাহিত্যিক হিসেবে তার আবির্ভার ষাটের দশকে। তখন থেকেই গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও শিশুসাহিত্যে তার বিচরণ। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ *অগ্নিস্বাক্ষরা*। *ইত্তেফাক* এবং *ললনা* পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে লিখেছেন। সাহিত্যের অঙ্গনে ছোটগল্পকার হিসেবে তার আবির্ভাব হলেও তিনি মূলত ঔপন্যাসিক পরিচয়ে সমধিক বিখ্যাত। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *উত্তর পুরুষ* (১৯৭৭), *রক্তের অক্ষর* (১৯৭৮), *ঘর ভাঙা ঘর* (১৯৮৪), *বং থেকে বাংলা* (১৯৮৭)।

বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যের এক প্রধান স্তম্ভ কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন[২৫](১৯৪৭)। সাহিত্যিক হিসেবে তার আবির্ভাব ঘটে ষাটের দশকের শেষপ্রান্তে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্পগ্রন্থ *উৎস থেকে নিরন্তর*। সৃষ্টির নানা শাখায় তার সৃজনসামর্থ্য দৃশ্যমান। তার উপন্যাসে সমকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকট প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত তার প্রধান দুটি উপন্যাস *যাপিত জীবন* (১৯৮১), *নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি* (১৯৮৭)। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস সমূহের মধ্যে *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬) এবং *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (১ম খণ্ড ১৯৯৪, ২য় খণ্ড ১৯৯৫, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৬) উল্লেখযোগ্য।

যে সকল নারী কবি-সাহিত্যিকরা ১৯৫২-১৯৭১ পর্বে তাদের লেখনীতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকসহ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম, সেলিনা পারভীন, জাহানারা আরজু এবং কবি মেহেরুন্নেসা। এই পর্যায়ে ১৯৫২-১৯৭১ পর্বে তাদের বিভিন্ন রচনা কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করা হবে।

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

বাংলা সাহিত্যে সুফিয়া কামাল[২৬] পরিচিত নাম। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রাজপথে যেমন ঠিক তেমনি সাহিত্য সাধনায়ও তিনি ছিলেন নিরলস। বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তার অবস্থান সবসময়ই ছিল পুরোভাগে। কবিতা, গল্প, শিশুছড়া, ভ্রমণ, দিনপঞ্জি, কিংবা আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালির সারস্বত সমাজে তিনি নির্মাণ করেছেন তার সুদৃঢ় আসন।[২৭] তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *দীওয়ান* (১৯৬৬), *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৬৮), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০), *মোর যাদুদের সমাধি পরে* (১৯৭২)। কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ *কেয়ার কাঁটা*, ১৯৬৫ সালে শিশুতোষ গ্রন্থ *ইতল বিতল*, ১৯৬৮ সালে ভ্রমণকাহিনী *সোভিয়েটের দিনগুলি*, ১৯৮১ সালে শিশুতোষ গ্রন্থ *নওল কিশোরের দরবারে*, ১৯৮৮ সালে আত্মজীবনীমূলক রচনা *একালে আমাদের কাল* এবং ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় *একাত্তরের ডায়েরী*।

সুফিয়া কামালের চেতনা প্রবাহে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। যার ফলে তার কাব্যপ্রবাহেও সেই পরিবর্তনের ছাপ লক্ষণীয়। তার কবিতায় ভাষা আন্দোলন, স্বদেশ চেতনা, পাকিস্তানের স্বৈরাচারী মনোভাব ও অচেতন জাতি হিসেবে বাঙালির উদাসীনতার ইঙ্গিত জোরালো ও যুক্তিযুক্ত ভাষায় উচ্চকিত হয়েছে। তারাই স্বাক্ষর বহন করে *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থের ‘শহীদ রক্তের ঋণ’ কবিতায় তিনি লিখেছেন:

> প্রভাতে যাহারা পথে এল বাহিরিয়া
>
> তারা আর যায়নি ফিরিয়া
>
> মায়ের ব্যাকুল বক্ষ- কোলে
>
> সেই শূণ্যতার ব্যথা দিগন্ত ব্যাপিয়া যেন দোলে!
>
> তবু মনে হয়
>
> আছে তারা। রয়েছে নিশ্চয়[২৮]

অভিযাত্রিক কাব্যগ্রন্থের ‘এমন আশ্চর্য এই দিন’ কবিতায়ও সুফিয়া কামাল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করেছেন। লিখেছেন সালাম, বরকতের আত্মত্যাগের কথা। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারির দিনকে অভিহিত করেছেন শোকহীন, ভয়হীন, শঙ্কাহীন দিন হিসেবে। সুফিয়া কামালের ভাষায়:

> আশ্চর্য এমন দিন! মৃত্যুতে করে না কেহ শোক,
>
> মৃত্যুরে করে না ভয়, শঙ্কাহীন। কিসের আলোক
>
> উদ্ভাসিত করে তোলে ক্লান্ত দেহ মুখ পদক্ষেপ,
>
> সংকল্পের দ্যুতি তরে দৃঢ়তার প্রজ্ঞার প্রলেপ
>
> করেছে ভাস্বর!
>
> এরা যেন করেছে স্বাক্ষর
>
> মৃত্যুর পরওয়ানা পরে বাংলা ভাষায় লিখি নাম:
>
> “আমার মায়েরে আমি মাটি থেকে মোর বুকে তুলিয়া নিলাম।”
>
> সালাম বরকত ছিল, আরও ছিল নাম নাহি জানা কতজন

পিতার অন্তিম আশা, জননীর বুক জোড়া ধন
কাহারও জীবন সাথী, বোনদের একমাত্র ভাই–
তারা আজ নাই!
নাই? আছে আছে–
আকাশে বাতাসে আর হিয়ার একান্ত কাছে কাছে।
তাইত মিছিল চলে দৃঢ় দৃপ্ত পদে, কণ্ঠ ভরা
মৃত্যুর অমর গান, তাই দৃষ্টি তীব্র অগ্নিক্ষরা।
মাতা-বধূ-ভগ্নিদের সব মুখ সংকল্প কঠিন
এমন আশ্চর্য এই দিন!
অমর একুশে
অজেয় হয়েছে বাংলা ভাষা রক্তে মিশে।[২৯]

সুফিয়া কামালের স্বদেশ চেতনার পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে *অভিযাত্রিক* কাব্যগ্রন্থের 'বাহান্ন থেকে চৌষট্টির পরিক্রমা' কবিতায়। এই দীর্ঘ পরিসরে তিনি সরকার ও নানা রাজনৈতিক দলের ভালো-মন্দ, সমাজ ও সংস্কৃতির এগিয়ে চলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাঙালি জাতির উত্থানপর্বকে যেমন দেখেছেন, তেমনি বাঙালির প্রতি সরকারের অবজ্ঞার বিষয়টিও দেখেছেন। তার কাব্যিক ভাষ্য:

শহীদ মিনার হয়নি ত, পাঁচ কঙ্কাল খাড়া হলো,
দেখে হবে মন বেদনা আতুর, চোখ হবে ছলোছলো।
রাস্তায় যেতে ধাঁধা লাগে চোখে, কোথা যে এলাম পড়ে না মনে,
ফুলার রোড-এর মাথায় এসেছি? এসেছি কি লণ্ডনে?
ইংলিশ রোড মুখ ভ্যাঙ্গচায়? বাঙ্গালী রোড কই?
বাংলা দেশেতে এখনও আমরা প্রধান হলাম কই?
'বেলি' মিন্টো'র পাশ দিয়ে যেতে মনে হয় রাজধানী,
বেগম রোকেয়া তোমারে হেরিয়া টেনেছে ঘোমটাখানি।
কার্জন, এস. এম. হল
গৌরবে করে কখনও কখনও দিনে রাতে ঝল মল।
হোম ইকনমিক্স্ কলেজে হাজারো নিয়নের বাতি জ্বলে,
রাত্রে দিবসে ভরে ওঠে শত দুহিতার কলরোলে।
কিছু সন্দেহ, তবু মনে জাগে আশা:
বাংলা দেশের মেয়েরা বাঁচাবে বাংলা দেশের ভাষা।[৩০]

সুফিয়া কামাল ধ্বংসের অবসানে নতুনকে সৃজনের স্বপ্নে আশাবাদী ছিলেন। তাই তার কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে দীপ্ত প্রত্যাশার কথা। অভিযাত্রিক কাব্যগ্রন্থের 'কালের যাত্রার ধ্বনি' কবিতায় তিনি লিখেছেন:

...কত প্রভাতের সূর্য হেসে আসে বাড়াইয়া কর,
হেলে পড়ে শোণিতাক্ত দীপ্ত দ্বিপ্রহর,
শোকাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আসে,
নিশীথের সুপ্তি ভাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে অবিশ্বাসে।
তারও পরে আসে সেই দিন
মৃতের কঙ্কাল পরে জেগে ওঠে জীবন নবীন।[৩১]

একই প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত হয়েছে অভিযাত্রিক কাব্যগ্রন্থের 'নতুন সূর্য গগনে উঠেছে' কবিতায়। কবি লিখেছেন:

আমার দেশের তাঁতি চাষী আর কামার কুমার জেলে
আবার নতুন মাটিতে দাঁড়ায়
বাধার পাহাড় ঠেলে।[৩২]

অভিযাত্রিক কাব্যগ্রন্থে জাগরণমূলক অন্যান্য কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'অভিযাত্রিক', 'জাগৃতি', 'পণ', 'আবার শপথ লই', 'নতুন দিনের সূর্য', 'ভুলি নাই', 'ঝাণ্ডা উড়িছে নভে', 'আমার দেশ', 'নববারতা', 'এই দিনে', 'অমৃত স্মৃতি', 'পথ নহে অন্তহীন', 'হে মানুষ!', 'জেগে ওঠো', 'অমৃত কন্যা', 'তপস্যা কেটেছে', 'শেষের প্রার্থনা' প্রভৃতি। এ কাব্যের কবিতাসমূহে তিনি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রামী মানুষ, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ, জাগ্রত সত্তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভূমিকা রাখে।

মোর যাদুদের সমাধি পরে কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা সংগ্রামী যোদ্ধা ও শহিদদের প্রতি উৎসাহমূলক জয়গানের স্বাক্ষর। ১৯৭১-এর উত্তাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ, বিজয়ের উচ্ছ্বাস সবকিছুকে তিনি ছন্দবদ্ধ করেছেন কবিতার কথামালায়। কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই রচনা করেছেন ১৯৭১ সালে। প্রতিটি কবিতার শেষে তারিখ লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। 'উনসত্তুরের এই দিনে' কবিতাটি রচনা করেন ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি। তিনি এই কবিতায় মুক্তিকামী সংগ্রামী জনতার সাথে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। অনেক সংকট সংগ্রাম শেষে দেশে যে নতুন জাগরণ এসেছে তার উল্লেখ করে লিখেছেন:

অনেক সংগ্রাম আর অনেক সঙ্কট ক্ষতি শেষে
এবার জেগেছে এই দেশে
রক্তাক্ত হৃদয় হতে আলোক কমল
আত্মচেতনার রঙে মেলি শতদল
বিথারি উঠেছে এতদিনে
এইবার পথ নিবে চিনে
ঊনসত্তুরের সেই দিন শেষে আজ
সংগ্রামী সেনারা তোলে নতুন আওয়াজ।[৩৩]

মোর যাদুদের সমাধি পরে কাব্যগ্রন্থের 'নীরবে চলেছে', 'আজো ডাকে', 'বাতাসে বারুদ', 'তাদের সে রক্তিম শপথ', 'আজ এই দিন', 'কান্না নয়', 'রক্তের আলেখ্য', 'মিছিল সারি সারি', 'শিশির

ভেজানো পথ', 'মরণ ভয়কে জয় করেছে', 'উদাত্ত বাংলা', একত্রিশে চৈত্র ১৩৭৭', 'বৈশাখ ১৩৭৮', 'হে রুদ্র', 'আমরা নেমেছি সংগ্রামে', 'এ আমার দেশ', 'এই ফাল্গুন মাস'-প্রভৃতি কবিতায় মাতৃভূমিপ্রীতি, স্বাদেশিক চেতনা, অগ্নিঝরা সংগ্রাম, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় বদর বাহিনীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন কবি। এদেরকে তিনি হিংস্র জন্তু, শ্বাপদ, কুটিল মাংসাশীসম আরণ্য অসুর, রক্ত মাংসলোভী মানুষ রূপে অভিহিত করেছেন 'আমরা আদিম অধিবাসী' কবিতায়। তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতার পাশাপাশি তরুণ সন্তানদের অংশগ্রহণকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে রচনা করেন 'মোর যাদুদের সমাধি পরে' কবিতাটি।[৩৪]

তার কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে দেশের স্বাধীনতায় নারীর অবদান, সেদিনের সেই সাহসী নারীদের কথা। নারীর অমিত শক্তির অগ্রগণ্য ভূমিকাকে লিপিবদ্ধ করেছেন তার 'বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই' কবিতায়। সুফিয়া কামাল লিখেছেন:

বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই,
শাড়ীতে শোভন পাড় আছে-কি-নেই
ললাটে তিলক, নয়নে কাজল, অধর রাঙাবার বেলা।
নেই, আর নেই। এবার চলেছে জীবন-মরণ খেলা।
কিশোরী তরুণী বধূদের মুখে হাসি নেই মনোরম,
সুচারু চিবুক ওষ্ঠ অধর দৃঢ় শপথ সম
তৎপর সদা। শাণিত তীক্ষ্ণ অসির মতো
আয়ত নয়নও উচ্চকিত, হয় না নত।
হরিণীর মতো ভীরু নয় আর, সে দিঠি আজ
সন্ধানী-যেন শিকারী বাজ।
কঠিন পাষাণ হৃদয় হয়ে ক্রুর
নিতে প্রতিশোধ হীন দস্যুর
নারীর সলাজ কোমল পেলবতা আজকে নেই,
যত প্রিয়জন স্বজন সাথীরে হারানো দুঃখের শোধ নেবেই।
ক্ষীণ কটি আর বক্ষে বহিছে সিংহ তেজ
অমিত শক্তি ধরে সাহসিকা, কণ্ঠেও তার নেই আমেজ
প্রণয়-গীতির। দেশ মাতৃকা জনগণ জয়–
জয় জয় যত মুক্তিসেনা।
শহীদ শোণিতে রাঙায়ে আঁচল নারীরা শোধিছে মাটির দেনা।[৩৫]

প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সুফিয়া কামালের কৃতজ্ঞতার সার্থক রূপায়ণ *মোর যাদুদের সমাধি পরে* কাব্যগ্রন্থটি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে সুফিয়া কামালের দেশপ্রীতি, স্বাজত্যবোধের প্রামাণ্য স্বাক্ষরবাহী গ্রন্থ *একাত্তরের ডায়েরী*। এই রচনায় কবির আত্মোপলব্ধি একজন মুক্তিকামী মানুষের প্রতীক হিসেবে প্রতিবিম্বিত। তিনি একাত্তরের ডায়েরীতে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭০ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দিনলিপি লিখেছেন। গ্রন্থটির প্রতিটি পাতায় যুদ্ধকালীন বীভৎসতা, জ্বালাও-পোড়াও দমননীতির রূঢ়তা প্রতিফলিত হয়েছে। পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায় তিনি

পাকিস্তানিদের জালেম, নির্লজ্জ, মোনাফেক, পিশাচ দল, মীরজাফরের দল, পশু, দানব, অসুর, মূর্খ, মূঢ়, অধম, ঘৃণিত পশু, দস্যু, বর্বর হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি পাকিস্তানিদের অত্যাচারের সীমাকে 'কুফরি জুলমাত' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৬] গ্রন্থটিতে তার দেশপ্রেমের সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ১৯৭১ সালের ২৭ জুন সুফিয়া কামাল তার দিনলিপিতে লিখেছেন, "... এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজী নই। আমার দেশ আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক-এ দেখে যেন আমি এই মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি।"[৩৭] দৃঢ়চেতা মানসিকতার অধিকারী সুফিয়া কামাল বিশ্বাস করতেন এ দেশের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তিনি লিখেছেন, "অতীব সত্য, মুক্তি আসবে একদিন তোমার রহমতে। আপনজনেরা এত অত্যাচার সহ্য করছে। দেশের সোনার ছেলেমেয়েরা আজ কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের মুক্তিযুদ্ধে সাহস বুদ্ধি দাও।"[৩৮] বুদ্ধিজীবী হত্যা, যুদ্ধের বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে অস্থির উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত সব কিছুই লিপিবদ্ধ হয়েছে তার দিনলিপিতে।

সাহিত্যিক মাত্রই সময় ও সমাজকে তার সাহিত্যকর্মে ধারণ করেন। সুফিয়া কামালের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরিবর্তিত সমাজের রূপ তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে বারবার। তার প্রথম দিকের কিছু রচনায় তিনি পাকিস্তানের বন্দনা করলেও পাকিস্তানি শাসনের স্বৈরাচারী মনোভাব বুঝতে পেরে এর বিরুদ্ধাচরণ করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। সে কথা তার বক্তব্য, ডায়রিতে, কবিতায়, সোচ্চারে ধ্বনিতে হয়েছে।

নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২)

যাদের মননশীলতা এবং সৃষ্টিনৈপুণ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়েছে নীলিমা ইব্রাহিম[৩৯] তাদের অন্যতম। বাংলাদেশের শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে নীলিমা ইব্রাহিম একটি উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম। স্কুলের বার্ষিকীতে গল্প, প্রবন্ধ লিখার মাধ্যমেই তার সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৫৫ সালে *বেগম* পত্রিকায় *পথ-শ্রান্ত* উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে ঢাকার সাহিত্য অঙ্গনে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৪০] তিনি *বেগম* পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। তৎকালীন নারীর সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণার কেন্দ্রবিন্দু বেগম ক্লাবের সাথেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তখন বেগম ক্লাব ছিল শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা নারীর মিলন স্থান। ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুণী শিল্পীদের সংবর্ধনাসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ক্লাবের সকল অনুষ্ঠান আয়োজনই মূল ভূমিকা পালন করতেন নীলিমা ইব্রাহিম। এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় নূরজাহান বেগমের স্মৃতিচারণায়:

> বাবা নাসিরউদ্দিনকে দেখেছি কিভাবে কি করতে হবে তা আপাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'নীলিমা অনুষ্ঠানটি এভাবেই সাজাও।' আপা ঠিক ঠিক মত বাবার নির্দেশ মেনে নিজের মনের ও জ্ঞানের উৎকর্ষ দিয়ে চমৎকার সব অনুষ্ঠান নিজে নিজে সাজিয়ে পরিচালনা করতেন। তখনই বিদেশী অতিথিকে সংবর্ধনা দেওয়া হ'ত তখন একমাত্র ড. নীলিমা ইব্রাহিম-ই পারতেন ইংরেজীতে সব কিছু পরিচালনা করতে। তখন তেমন অনেকেই ইংরেজী বলতে লিখতে পারদর্শী না হওয়ায় নীলিমা আপাই দারুণ দক্ষতায় বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে কথোপকথন চালাতেন। বাবাও নিশ্চিত মনে আপার উপর সব দায়িত্বভার অর্পণ করতেন।[৪১]

এছাড়া পূর্ব বাংলার নারী জাগরণের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে শিক্ষা নিয়ে *বেগম* পত্রিকায় তার লেখনীর মাধ্যমে নারী সমাজ সচেতন ও উৎসাহী হয়েছেন। তিনি পত্রিকাটির সাহিত্য বিভাগেও নিয়মিত লিখেছেন।

নীলিমা ইব্রাহিমের সাহিত্য সাধনা ছিল দুটি ধারায় বিভাজিত। একটি সৃজনশীল সাহিত্য, অপরটি প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক রচনার ধারা। তার সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে আছে ছোটগল্প, উপন্যাস, কথানাট্য, ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনী ইত্যাদি।[৪২] তবে প্রবন্ধ গবেষণাই তার সাহিত্যিক পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি। *শরৎ-প্রতিভা* (১৯৬০) তার প্রথম গবেষণাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি শরৎ-কথাসাহিত্যের বিষয় ও শিল্পরূপ বিবেচনা করেছেন। *বাংলার কবি মধুসূদন* (১৯৬১) গ্রন্থে তিনি মাইকেল মধুসূধন দত্তের কবি মানসের বাঙালি সত্তা বিশ্লেষণ করেছেন। পাকিস্তান শাসিত পূর্ব বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার পটভূমিকায় এই গ্রন্থ দুটি গুরুত্বপূর্ণ। 'আইয়ুবি দশক'-এর শুরুতে আধুনিক বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যের অন্যতম দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সাহিত্য অবলম্বনে মূল্যায়নধর্মী দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে সাহিত্য সমালোচনার গতিপথ নির্ধারণেও তিনি অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[৪৩]

১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক' বিষয়ে গবেষণা করে তিনি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। এই অভিসন্দর্ভেরই গ্রন্থরূপ *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক*। বিষয় হিসেবে তিনিই প্রথম বাংলা নাটক তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে এদেশের সাহিত্যগবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করলেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে বিস্তৃত পরিসরে বিশ্লেষিত হয়েছে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের স্বরূপ। এরপর বাংলা নাটক রচনার সামাজিক পটভূমি এবং নাটকে প্রতিফলিত সমাজচিত্র বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা নাটককে তিনি পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। এগুলি হলো 'কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহসম্বন্ধীয় নাটক', 'ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারে মদ্যপানাশক্তি ও তার প্রতিকারকল্পে রচিত নাটক', 'নারীকল্যাণ কামনায় রচিত নাটক', 'জাতীয়তাবাদ প্রচারমূলক নাটক', 'ধর্মমূলক নাটক' এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রচিত নাটক। আলোচ্য গ্রন্থে 'নারীকল্যাণ কামনায় রচিত নাটক' পরিচ্ছেদের পরিকল্পনায় ও বিশ্লেষণে নীলিমা ইব্রাহিমের পরিশীলিত নারীভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "... আধুনিক পাক-ভারতের নারীসমাজ অবশ্য বাইরের বিশ্বে বিচরণের অবাধ ছাড়পত্র এখনও পায়নি তবুও তার যে একটা স্বাধীন সত্তা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এ চেতনাবোধ তাকে আত্মমুক্তির জন্য ক্রমাগত বেদনা দিচ্ছে এবং এ অনুভূতিই আশা করি একদিন তাদের কাম্য জীবন পথের দ্বার তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে।"[৪৪]

জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে নাটকের ভূমিকা বিষয়েও আলোচনা করেছেন তিনি। বাংলা নাটক সম্পর্কে নীলিমা ইব্রাহিমের অপর গ্রন্থ *বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা* তে তিনি বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়া তার প্রবন্ধ গ্রন্থ *বাঙালীমানস ও বাংলা সাহিত্য* এবং *সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ* তে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তার রচনাসমূহ জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে অসামান্য ভূমিকা রাখে। নীলিমা ইব্রাহিমের সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে তার নারীবাদী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তার কথাসাহিত্য ও নাটকে নারীজীবনের বহুমাত্রিক চিত্র-রূপায়ন করেছেন। তার *এক পথ দুই বাক* (১৯৫৮) উপন্যাসটি সাতচল্লিশ উত্তর দুই বাংলার ভূগোলে নাগরিক জীবনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারীর অসহায়ত্ব, নারীর নিরাপত্তা যন্ত্রণা এবং তা থেকে মুক্তির অনুসন্ধান নিয়ে আবর্তিত। *বিশ শতকের মেয়ে* (১৯৫৮) উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে সাতচল্লিশ উত্তর ঢাকার নগরজীবন থেকে শুরু করে মফঃস্বল শহরের নারীর জীবনযাপন নিয়ে। তার *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* শীর্ষক কথানাট্যে একাত্তর সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে বন্দি নারীদের জীবন যন্ত্রণার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। পাকিস্তান শাসিত পূর্ব বাংলার যে সময়ে সাহিত্য গবেষণায় নবযুগ সূচিত হয়েছিল, সেই ক্রান্তিকালে নীলিমা ইব্রাহিম পালন করেছিলেন অগ্রপথিকের ভূমিকা।

নীলিমা ইব্রাহিম পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম লিখেছেন:

> সামরিকজান্তা শাসিত পাকিস্তানে ষাটের দশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই অস্থির ছিলো। একদিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেমন রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী, ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রতিরোধ সংগ্রাম, অপরদিকে ছাত্র সমাজের সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামের তীব্রতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। সবটা মিলে একটা উত্তেজনার সময়। ষাটের দশকে বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্রসমাজের সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে ছাত্রনেতা ও কর্মীদের সঙ্গে লোকচক্ষুর আড়ালে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম। বস্তুত সেই বিপজ্জনক সময়ে ইকবাল হল নিকটবর্তী ফুলার রোড আবাসিক এলাকার নীলিমা ইব্রাহিমের বাসাটি ছিলো ছাত্রনেতা ও কর্মীদের নির্ভয় আশ্রয়স্থল, তিনি ছিলেন তাদের জননীসদৃশ। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের দিনগুলোতে পাকিস্তান সামরিক জান্তার চোখে বিপজ্জনক ছাত্রনেতা ও কর্মীদের জন্য নীলিমা ইব্রাহিমের বাড়ির দরজা ছিলো দিবারাত্রি উন্মুক্ত। রণক্লান্ত ছাত্রকর্মীরা নীলিমা আপার কাছে পেতো মায়ের স্নেহ ও সেবাযত্ন। ইকবাল হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে থেকে ঊনসত্তরের মহান গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোতে ওই দৃশ্য দেখার সুযোগ আমার হয়েছিলো। বস্তুত ১৯৬৯, ’৭০, ’৭১ সালের দিনগুলোতে চরম উত্তেজনা ও বিপদের মধ্যে নীলিমা ইব্রাহিমকে দেখেছি অবিচলিত, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।[৪৫]

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নীলিমা ইব্রাহিমের সক্রিয় ভূমিকা পাকিস্তান বাহিনীর কাছে গোপন থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ এনে জেনারেল টিক্কা খান এক সতর্কপত্রের মাধ্যমে তাকে সতর্ক করে দেন। সতর্ক পত্রের ভাষ্য নিম্নরূপ:[৪৬]

Martial Law Headquarters, Zone, ‘B’, Dhaka

I, Lt. General Tikka Khan, HQA, S. Pk., as Chancellor of the Dacca University, hereby warn you, Dr. Nilima Ibrahim of Bengali Department, Dacca University, that you will not indulge in the antistate activities in future.

sd/- Tikka Khan, Lt. General

Martial Law Administrator, Place: Dacca, Zone ‘B’,

Government of East Pakistan

Dated: 1 September, 1971.

কিন্তু অকুতোভয় এই নারী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখেও দেশ ছাড়েননি। ঢাকা শহর বা শহরের আশে পাশে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাসহ নানাবিধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। ন্যায় বিচারের অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে বাঙালি জাতির স্বপক্ষে সর্বদাই সোচ্চার ছিলেন তিনি। নীলিমা ইব্রাহিম আমৃত্যু মানুষের শুভ ও কল্যাণী চেতনায় আস্থাশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, “মাটি বড় ঠাণ্ডা শীতল, ধরিত্রী সর্বংসহা ... মানুষের চেয়ে বড় দেবতায় আমি বিশ্বাস করি না, ঠিক তেমনি পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর স্বর্গও আমার আকাঙ্ক্ষার বাইরে।”[৪৭] তিনি সারা জীবন ধরে এই মানুষ আর মৃত্তিকার মঙ্গল কামনা করেছেন, চেষ্টা করেছেন উভয়ের উৎকর্ষ সাধনের। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মুক্তবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা বোধেই ছিল নীলিমা ইব্রাহিমের জীবনদর্শন, তার সৃষ্ট সাহিত্যেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

সেলিনা পারভীন (১৯৩১-১৯৭১)

নারী কবি-সাহিত্যিকরা যেমন লেখনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনি নারী সাংবাদিকরাও কলমকে অস্ত্র করে এই সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এদেরই একজন শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন।[৪৮] ১৯৬৬ সালে *সাপ্তাহিক বেগম* পত্রিকায় সম্পাদিকার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করার সময় থেকেই সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনায়ও উৎসাহী ছিলেন তিনি। তার লেখা কবিতা, নিবন্ধ ও প্রতিবেদন *পূর্বদেশ*, *আজাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *সংবাদ*, *বেগম* ও *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে *সাপ্তাহিক ললনা* পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ শুরু করেন। *সাপ্তাহিক ললনা*য় কাজ করার সময়ই ১৯৬৯ সালে প্রকাশ করেন *শিলালিপি* পত্রিকা। তিনি নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন।[৪৯] পত্রিকার কাজে দিন রাত ঘুরে বেড়াতেন লেখা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে এবং পত্রিকাটি প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে একাজটি সহজ ছিল না মোটেই। নীলিমা ইব্রাহিম লিখেছেন, "সেলিনা পারভীন যখন সাংবাদিকতা শুরু করেন তখন একমাত্র বেগম সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম ও লায়লা সামাদ ছাড়া পত্রিকা সম্পাদনায় আর কোনো বাঙ্গালী মহিলা এসেছেন বলে আমার জানা নাই। আজকের মতো তখন মেয়েদের জন্য পেশা গ্রহণের দ্বার এতো উন্মুক্ত ছিল না আর সাংবাদিকতা তো কঠিনতম কাজ।"[৫০] সেলিনা পারভীনকে নিয়ে স্মৃতিচারণায় লিখেছেন জাহানারা ইমাম:

> ৬৯ এ রাস্তায় এক হকার এর কাছ থেকে এক পত্রিকা নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখি তার মধ্যে কোনো সম্পাদকের নাম নেই, আছে সম্পাদিকার নাম- সেই সেলিনা পারভীন। পত্রিকার নাম 'শিলালিপি' হলুদ ও বেগুনী মলাটে শৈল্পিক নক্সা করা। খুলে পড়ে বুঝলাম সেলিনার সাহিত্যনুরাগের রুচি, জ্ঞান ও প্রকাশের ক্ষমতা। ... শিলালিপি'টা দেখে আমি চিন্তা করেছিলাম একজন মহিলা কি করে পত্রিকার সবদিক দেখাশুনা করে। লেখা সংগ্রহ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ থেকে শুরু করে পত্রিকা ছাপা হয়ে বের হওয়া পর্যন্ত সব কাজই সে একা করতো। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ও পরিশ্রমী না হলে এটা সম্ভব হতো না। বুঝা যায় সে ছিল আপোসহীন, স্বাধীনচেতা, সংগ্রামী ও বীরঙ্গনা নারী। বাস্তবতার সাথে যুদ্ধ করে ললনায় চাকুরীর পাশাপাশি একটি পত্রিকা বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।[৫১]

দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীর লেখা নিয়ে প্রকাশিত *শিলালিপি* পত্রিকা সকলেরই নজর কেড়েছিল। পত্রিকায় শহীদুল্লা কায়সার, মুনীর চৌধুরী, জহির রায়হান, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, ফয়েজ আহমদ, রফিক আজাদ সহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামী লেখক ও কবিদের লেখা গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপা হতো।[৫২] তিনি নিজেও লিখতেন স্বাধীনতার পক্ষে। তাই খুব দ্রুতই *শিলালিপি* হয়ে উঠে স্বাধীনতার পক্ষের পত্রিকা। লেখালেখির পাশাপাশি গণআন্দোলনেও সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। পল্টনের জনসভায় বা শহিদ মিনার থেকে বের হওয়া নারীদের মিছিলে ছোট্ট ছেলেকে নিয়েই যোগ দিতেন তিনি। অংশ নিতেন বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ সভাতেও। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ঢাকার বাসায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি ঔষধ, কাপড় এবং অর্থ দিয়েও সহায়তা করেছেন। *শিলালিপি*'র বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন। এসব কারণেই ধীরে ধীরে *শিলালিপি*'র ওপরও নেমে আসে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর খড়্গ। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাও ফরমান আলী সেলিনা পারভীনকে পত্রিকার লেখক, কবি এবং প্রচ্ছদে বাংলার লোকশিল্পের অলঙ্কার দেখে এসব অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি ভাবধারার লেখা ও ছবি দিয়ে *শিলালিপি* প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৫৩]

সেলিনা পারভীন এই নির্দেশ ও পরামর্শ পালন করতে পারেননি। তাই হাশেম খানের প্রচ্ছদ করা *শিলালিপি*র একটি প্রকাশিতব্য সংখ্যা নিষিদ্ধ করে দেয় পাকিস্তানি সরকার। পরে প্রকাশের অনুমতি

মিললেও পত্রিকাটিকে নতুনভাবে সাজানোর শর্ত দেয়া হয়। সেলিনা পারভীন বরাবরের মতো প্রচ্ছদ না দিয়ে তার ভাইয়ের ছেলের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে *শিলালিপি*র সর্বশেষ সংখ্যা বের করেন। কিন্তু তার পূর্ববর্তী সংখ্যার জন্যই সেলিনা পারভীন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দালালদের নজরে পড়ে যান কারণ সেটাতে ছিল দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতার পক্ষের লেখা। তাই পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সকালে সিদ্ধেশ্বরীর ১১৫ নম্বর নিউ সার্কুলার রোডের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় তাকে। ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্য দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীর সাথে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে সেলিনা পারভীনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাকে হত্যার কারণ সম্পর্কে শামসুর রাহমান লিখেছেন:

> তিনি স্বদেশকে ভালোবাসতেন, হানাদারদের কবল থেকে, বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কবল থেকে নিজের মাতৃভূমিকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ছিলেন প্রগতির পক্ষে। কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, সাম্প্রদায়িকতা ছিল তার দু' চোখের বিষ। সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। তার এই উপলব্ধির জন্যেই তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো।[৫৪]

সেলিনা পারভীনের মৃত্যুর পর *শিলালিপি*র কয়েক হাজার কপি এবং তার বহু অপ্রকাশিত রচনা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল।[৫৫] কারণ তিনি তার লেখনী এবং পত্রিকার মাধ্যমে এই দেশের স্বাধীনতার স্পৃহাকে উজ্জীবিত করেছেন। সেলিনা পারভীনকে স্মরণ করে সুফিয়া কামাল রচনা করেছেন 'শিলালিপি অক্ষয়' শিরোনামে কবিতা। সুফিয়া কামালের কাব্যিক ভাষ্য:

> শিলালিপি অক্ষয়!
> কালের বক্ষে লিখে গেল তার জীবনের পরিচয়
> বাংলাদেশের দুলালী দুহিতা রাতজাগা পাখী তার
> নিঃসীম নীল নভে করেছিল পাখা দু'টি বিস্তার।
> স্বপ্ন ছিল সে চোখে
> এ মাটিরে ভালোবেসেছিল-তাই চেয়েছিল সে আলোকে
> এ মাটির ঘর উজলি তুলিবে জ্বলিয়া প্রাণের শিখা,
> দস্যুদানব নির্মম হাতে মুছে দিল সেই লিখা।
> তবুও জননী অয়ি!
> শিলালিপি'পরি তব নাম লিখা হয়ে রবে কালজয়ী।[৫৬]

সেলিনা পারভীন স্রোতের বিপরীতে গিয়ে সাহসী সব লেখা প্রকাশ করতেন *শিলালিপি*তে। নারীরা যখন পশ্চাৎপদতা, অশিক্ষা, সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিকূলতার আর্বত থেকে মুক্তির আশায় লড়াই করছে, সেই সময় একা এক নারীর পক্ষে এরকম একটি পত্রিকা চালাবার কথা চিন্তা করাও ছিল দুঃসাহসের কাজ। যে দুঃসাহসের চরম মূল্য তিনি শোধ করেছেন নিজের জীবন দিয়ে, তবে স্থান করে নিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়, একজন সাহসী, নির্ভীক, সূর্যসন্তান হিসেবে।

জাহানারা আরজু (জন্ম ১৯৩২)

পঞ্চাশের দশকে ঢাকার যেসব নারী কাব্যচর্চা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম জাহানারা আরজু।[৫৭] ভারত বিভাগের পূর্বের কলকাতার *সওগাত* পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে কাব্য জগতে তার আর্বিভাব ঘটে। মূলত কবি হলেও গল্পও লিখেছেন তিনি। তবে গ্রন্থকার হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ

ষাটের দশকের ঢাকায়। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নীলস্বপ্ন* ১৯৬২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *রৌদ্রঝরা গান*, *শোণিতাক্ত আখর*, *আমার শব্দে আজন্ম আমি*, *ক্রন্দসী*, *স্বনির্বাচিত শত কবিতা*, *বিমুক্ত পংক্তিমালা* প্রমুখ। তার ছোট গল্পগ্রন্থ *বাতাসী*, *একমুঠো সাদা ভাত* এবং *বারুদের ঘ্রাণ*।[৫৮]

জাহানারা আরজুর কাব্যে এ দেশের মাটি ও মানুষের জীবনপ্রবাহ অবিমিশ্রভাবে মিশে গেছে। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য বিমুগ্ধ কবি মাটি, মানুষ, সমাজ ও পৃথিবীর নানা বিষয়কে তার রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এদেশের সংস্কৃতির তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নানা বিষয়ও তার কাব্যে ফুঠে উঠেছে। ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে রচনা করেছেন কবিতা 'শোণিতাক্ত আখর'। তিনি মনে করেন ভাষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে ভাষা শহিদেরা তার ভাষায়:

> যৌবনের স্বর্ণ দুয়ারে তারপর প্রবেশ করেছিলে সবে সেদিন
> রমনার পথ-ঘাট, রেস্তোঁরা, ভার্সিটির সোপান যখন মুখর
> তোমাদের সরব শতকণ্ঠে, অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার চুমকি যখন
> ছিটানো ছিল তোমাদের মনের নীলাভ আকাশে, তখনই
> তোমরা নীরব হলে, নিশ্চুপ হলে। তোমাদের মুখর
> কথার গুলিবিদ্ধ আহত পাখিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে
> থাকলো; চমকে উঠলো এ দেশ মৃত্তিকা। পৃথিবীর ইতিহাসে
> তোমরা এক মহান ইতিহাস রেখে গেলে, যে ইতিহাস কেউ কোনোদিন
> শোনেনি, কেউ করেনি পাঠ এমন শোণিতাক্ত আখরে লেখা
> এমন এক স্বর্ণ ইতিহাসের পাতা।[৫৯]

তিনি মনে করেন এদেশের মাটি-গানে, আকাশ আলোয় স্বপ্নে-জাগরণে, মিছিলে-পুষ্পস্তবকে ভাষা শহিদেরা মিশে আছে। তাদের নাম লেখা আছে এ দেশের জনগণের বক্ষের শোণিতাক্ত আখরে আখরে। জাহানারা আরজু পূর্ব বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রকৃতিকে তার কাব্যে ধারণ করার মাধ্যমে এ অঞ্চলের নিজস্ব সত্তাকে তুলে ধরেছেন। তার রচনার মাধ্যমেই তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন।

মেহেরুন্নেসা (১৯৪২-১৯৭১)

বাংলাদেশের প্রথম শহিদ নারী কবি মেহেরুন্নেসা।[৬০] প্রায় বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া দুঃসাহসী এক কবির নাম মেহেরুন্নেসা। শৈশব থেকেই তার কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। ১৯৫২ সালে দশ বছর বয়সে তার প্রথম কবিতা 'চাষী' *সংবাদ* পত্রিকার খেলাঘর পাতায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালে *কাফেলা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবিতা 'রাজবন্দী'। এই কবিতায় 'আমাদের দাবি মানতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' -এর মত বক্তব্য উচ্চারণ করেন তিনি।[৬১] তখন থেকেই তার কবিতা *ইত্তেফাক*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *মোহাম্মদী*, *সূর্যজ্যোতির পাখি*, *দরবার*, *কৃষিকথা*, *ললনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তবে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তার অধিকাংশ কবিতা সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। মেহেরুন্নেসা সম্পর্কে নূরজাহান বেগম বলেন:

> ... ১৯৫৪ সালেই *বেগম* এ মেহেরুন্নেসার প্রথম কবিতা ছাপা হলো। কবিতাটির নাম 'কবিতা'। মেহেরুন্নেসা ছিল বয়সের দিক থেকে আমাদের সর্বকনিষ্ঠ কবি। কিন্তু ওই বয়সেই সে অজস্র

লিখেছে। কাগজে ছাপবার জন্যে পাঠিয়েছে সে সব লেখা।... কবিতা রচনায় মেহেরুন্নেসার যে উৎসাহ, কবি-সাহিত্যিক সুধীজনের সভা-সমিতি অনুষ্ঠানে যোগদানের উৎসাহও ছিল তার তেমনি প্রবল। কবি-সাহিত্যিকদের সমাজকেও একান্ত আপনার সমাজ বলে গণ্য করেছিল। ... ১৯৫৪ সালে আমরা সাপ্তাহিক 'বেগম' কার্যালয়ে বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই ক্লাবের সংগঠন ও তার বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মেহেরুন্নেসার উৎসাহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ক্লাবের উৎসব অনুষ্ঠানে দায়িত্বশীল কর্মীর কাজ থেকে শুরু করে স্বরচিত কবিতা পাঠ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই ছিল তার সমান আনন্দ।[৬২]

কবি মেহেরুননেসা দেশপ্রেম, একুশের চেতনা, স্বাধীনতার বোধস্বপ্ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখের জন্ম-মৃত্যু দিবস নিয়েও কবিতা লিখেছেন। '৬৬ এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচন, '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম কিছুই তার কবিতা থেকে বাদ যায় নি। একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে তার লিখিত কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে। তবে একই বছর একুশ নিয়ে লিখিত একাধিক কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। ১৯৬৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি *বেগম* পত্রিকায় একুশ নিয়ে লিখিত কবিতা 'আজকের শপথ' প্রকাশিত হয়। কবির কাব্যিক ভাষ্য:

মৃত্যুকাতর তরুণ রক্ত রাজপথে দোল খায়
সেই দোল যেন ঠেলে উঠে সারা বাঙলার চেতনায়
জাগে বাঙালীর মন,
জাগে ফাল্গুনী রোদের ঝলকে রাঙ্গা পলাশের বন
দাবীর সড়কে জমা হয় শুধু বেয়নেট কারাগার
সাহসী যাত্রী থামেনি, তারা দুরন্ত দুর্বার।

একুশের পটভূমিকায় রচিত কবি মেহেরুননেসার অপর কবিতা 'লক্ষসূর্য আগুন জ্বেলেছে'। কবিতাটি ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি *ললনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি লিখেছেন:

শহীদ ভাইরা! স্বর্গ শিখর হোতে
চোখ মেলে দ্যাখো আজ বাংলার
পীচমোড়া কালো পথে
তোমাদের যত উত্তরসূরী বুলেটের মুখে হাসে
লক্ষসূর্য আগুন জ্বেলেছে, দুর্বার আক্রোশে।

কবির কাব্যিক ভাষ্যে ভাষার প্রতি ভালাবাসা এবং রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির আশাই ফুটে উঠেছে বারবার। বাংলা ভাষার প্রতি ভালাবাসা থেকেই কবি লিখেছেন 'আজীবন জানি ভালোবাসি বাঙলাকে/বাঙলাকে নিয়ে আমাদের হাসা-কাঁদা'।[৬৩] ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ সফল করতে এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করতে তাই তিনি শপথ নিয়েছেন,

বুলেটের ঝড়ে আরো যদি দিতে হয়
দিয়ে যাব মোরা উত্তরসুরী তোমাদের পরিচয়
তোমাদের মত আমরা যে নির্ভীক

আমাদের দাবী স্থির নিশ্চিত

আমরা বাঁচব ঠিক।[৬৪]

১৯৬৯ -এর আইয়ুববিরোধী উত্তাল গণআন্দোলনে রানু আপা ছদ্মনামে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। ১৯৭১ সালে বিহারি অধ্যুষিত মিরপুরে কবি কাজী রোজীর নেতৃত্বে এ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে লেখক সংগ্রাম শিবির আয়োজিত বিপ্লবী কবিতা পাঠের আসরে হাসান হাফিজুর রহমান, আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হুমায়ুন কবিরসহ অন্যান্য কবির সাথে স্বরচিত কবিতাপাঠে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে তিনি 'জনতা জেগেছে' কবিতা আবৃত্তি করেন।[৬৫] এটিই ছিল কবির রচিত শেষ কবিতা যেটি ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ বেগম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির পূর্ণরূপ থেকে তার চিন্তা চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

মুক্তি শপথে দীপ্ত আমরা দুরন্ত দুর্বার

সাত কোটি বীর জনতা জেগেছে এই জয়-বাঙলার।

পাহাড় সাগর নদী প্রান্তর জুড়ে–

আমরা জেগেছি নব চেতনার ন্যায্য নবাঙ্কুরে

বাঁচবার আর বাঁচাবার দাবি দীপ্ত শপথে জ্বলি–

আমরা দিয়েছি সব-ভীরুতাকে পূর্ণ জলাঞ্জলি–

কায়েমী স্বার্থবাদীর চেতনা আমরা দিয়েছি নাড়া

জয় বাঙলার সাত কোটি বীর, মুক্তি সড়কে খাড়া

গণতন্ত্রের দীপ্ত শপথ কণ্ঠে কণ্ঠে সাধা-

আমরা ভেঙ্গেছি জয় বাঙলার বিজয়ের যত বাধা।

কায়েমী স্বার্থবাদী হে মহল! কান পেতে শুধু শোনো

সাত কোটি জয় বাঙলার বীর! ভয় করিনাকো কোনো।

বেয়নেট আর বুলেটের ঝড় ঠেলে–

চির বিজয়ের পতাকাকে দেবো, সপ্ত আকাশে মেলে।

আনো দেখি আনো সাত কোটি এই দাবির মৃত্যু তুমি,

চির বিজয়ের অটল শপথ 'জয় এ বাঙলা ভূমি'।[৬৬]

এই কবিতাটি তাকে পাকিস্তানবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তাছাড়া ২৩ মার্চ তিনি তার দুই ভাইকে নিয়ে জয় বাংলা স্লোগানে মিরপুরে নিজ বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এর ফলে ২৭ মার্চ পাকিস্তানি আলবদর বাহিনী তার দুই ভাই, মা সহ তাকে হত্যা করে।[৬৭] তার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে *বেগম* পত্রিকায় তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, "কবি মেহেরুন্নেসা বেগমে'র লেখিকা ও পাঠক পাঠিকাদের কাছে একটি সুপরিচিত নাম। দীর্ঘদিন ধরে মেহেরুন্নেসা 'বেগমে'র পাতায় বিভিন্ন কবিতা লিখেছেন। কিন্তু আমাদের অত্যন্ত দুভার্গ্য যে, কবি মেহেরুন্নেসা আর কোনোদিন কোনো পত্রিকার পাতায় লিখবেন না।"[৬৮]

মেহেরুন্নেসা ছিলেন একজন সৃজনশীল কবি। তার কবিতা জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার 'আমি যে আশায় বাঁচি' কবিতার প্রতিটি ছত্রে দেশপ্রেমের বাণী ফুটে উঠেছে। তিনি কলম ধরেছিলেন পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। কবি কাজী রোজী কবি মেহেরুন্নেসার স্মরণে লিখেছেন, "তোমার দুটি হাতকে যখন প্রসারিত হতে দেখি, প্রতিটি রেখায় রেখায় যেন সোচ্চার প্রতিবাদ ভাসে।"[৬৯] তিনি আরও লিখেছেন "কবি মেহেরুননেসা একটি অদম্য শক্তির নাম। একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততার নাম। একটি মিছিল-সমাবেশের নির্ভীক উচ্চারণের নাম। একটি অসম্ভব সাহসের নাম। শহীদ কবি মেহেরুননেসা একটি শাণিত অঙ্গিকারের নাম। একটি থেমে না থাকা প্রজ্জ্বলিত উচ্চারণের নাম। দেশ মাতৃকার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।"[৭০]

কবি মেহেরুন্নেসা স্মরণে কবিতায় সুফিয়া কামাল লিখেছেন:

ভালোবেসেছিলি এই ধরণীরে, ভালোবেসেছিলি দেশ
তাইতোরে তোর কুমারী তনুতে জড়ায়ে রক্ত বেশ
প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে
দু'টি ভাই আর মায়ের তপ্ত বক্ষরক্তে নেয়ে
দেশের মাটির পরে
গান গাওয়া পাখী নীড় হারা হয়ে লুটালী প্রবল ঝড়ে।
ঝড় থেমে গেছে বাংলাদেশের, কেটেছে অন্ধকার,
সোনাঝরা এই রোদের আলোকে তুই ফিরিবি না আর।[৭১]

কবি মেহেরুন্নেসা আমাদের ইতিহাসের অংশ। তার কবিতা জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। তাকে নিয়ে নূরজাহান বেগম বলেন, "আমাদের মুক্তি সংগ্রামীরা যেমন দেশকে শত্রুমুক্ত করার দুর্জয় সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি সেই সংগ্রামে অযুত শান্তি সঞ্চারী প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা তাদের অসির চেয়েও শাণিত মসী চালনা করে। মেহেরুন্নেসা এই মুক্তি সংগ্রামী কবি-সাহিত্যিকদের অন্যতম।"[৭২] তিনি যে সময় আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন সে সময় একজন নারীর জন্য বিপ্লবী হওয়া, বিপ্লবী কবিতা লেখা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে তিনি আত্মদানে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মূল্যায়ন

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পত্র-পত্রিকায় নারীদের লেখনী এবং তাদের সৃষ্ট সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশ শতকে *বেগম* পত্রিকা নারীদের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পথকে প্রশস্ত করার পাশাপাশি নারীদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা করেছিল। এক্ষেত্রে নারী কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদেরও সাহসী ভূমিকা লক্ষ করি। তারা তাদের বিভিন্ন লেখনীতে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়কে চিত্রায়িত করে জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন। তাদের মননশীলতা এবং সৃষ্টি নৈপুণ্যে ত্বরান্বিত হয়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই সাহসী ভূমিকার চরমমূল্যও তারা পরিশোধ করেছেন নিজেদের জীবন দিয়ে। এক্ষেত্রে শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন এবং শহিদ কবি মেহেরুন্নেসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের অধিকাংশ নারীরা যখন পশ্চাৎপদতা, অশিক্ষা, সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিকূলতার আবর্ত থেকে মুক্তির আশায় লড়াই করছে সেই সময়ে এই আলোকিত নারীদের সাহসী প্রচেষ্টাই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

তথ্যসূত্র

১. পূর্ব বাংলায় নারী সম্পাদিত এবং নারীদের জন্য প্রকাশিত পত্র পত্রিকার মধ্যে রয়েছে *সুলতানা* (১৯৪৯), *মানসী* (১৯৫০), *অনন্যা* (১৯৫৫), *খাওয়াতীন* (১৩৫৯), *অবরুদ্ধা* (১৯৫৮), *মহিলা* (১৯৬১), *অঙ্গনা* (১৩৫৮), *কবরী* (১৯৬৩), *বান্ধবী* (১৯৬৫), *গৃহশ্রী* (১৯৬৩), *ললনা* (১৯৬৬), *শ্যামলী* (১৯৫৮), *রশ্মি* (১৯৬৫), *আপনি ও আপনার শিশু* (১৯৬৭), *মা* (১৯৬৯), *মধুমিতা* (১৯৬৯), *লাবণী* (১৯৭০) প্রভৃতি। তবে এগুলোর অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এর মধ্যে *বান্ধবী*, *ললনা* এবং *বেগম* জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি জগতেও এগুলোর অবদান স্বীকার্য। (ইসরাইল খান, *পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা* ১৯৪৭-৭১, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ. ১৫)।

২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *সাহিত্য-সাধনায় ঢাকার নারী*, ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১১, পৃ. ৪০।

৩. নূরজাহান বেগম ১৯২৫ সালের ৪ জুন চাঁদপুর জেলার চালিতাতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, মা ফাতেমা বেগম। বাবা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪২ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯৪৪ সালে লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন *বেগম* পত্রিকা প্রকাশ করলে তিনি পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীসময়ে তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা চলে আসেন তখন পত্রিকাটির নতুন ঠিকানা হয় বর্তমানে পুরোনো ঢাকার পাটুয়াটুলিতে। এছাড়া ১৯৫৪ সালে ঢাকায় 'বেগম ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ক্লাবটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে লাভ করেছেন রোকেয়া পদকসহ দেশি-বিদেশি নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। সাংবাদিকতায় নারীসমাজের পথপ্রদর্শক এই সাহসী নারী ২০১৬ সালের ২৩ মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্র: নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, ঢাকা: প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ২২৪-২৮)।

৪. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা: সওগাত প্রেস, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৫২।

৫. *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৭ জুলাই ১৯৪৭।

৬. *ঐ*, ২৩ আগস্ট ১৯৪৭।

৭. *ঐ*।

৮. *ঐ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

৯. *ঐ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১০. *ঐ*, ১৪ মার্চ ১৯৭১।

১১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪৫।

১২. হোসনে আরার জন্ম ১৯১৬ সালের ৮ জুলাই। পিতা মুন্সি মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ এবং মাতা হালিমা খাতুন। তার পিতা পেশাগত জীবনে সাব-রেজিস্টার ছিলেন। তবে পুঁথি সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। শৈশবে পিতার অকাল মৃত্যুর পর চাচা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উৎসাহে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মাসিক *মক্তব* পত্রিকায় তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে মোহাম্মদ মোদাবেরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর স্বামীর প্রভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে কারাবরণও করেছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সাল থেকে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে তার স্বামীর সঙ্গে মিলিতভাবে *অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান* নামে পত্রিকা

প্রকাশ করেন। অবসর সময়ে তাদের বাড়িতে বসতো সাংস্কৃতিক আসর। সেই আসরে রবীন্দ্র-নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি। তার প্রকাশিত কবিতার বই সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ফুলঝুড়ি*, *খেয়ালখুশী*, *হল্লা*, *টুংটাং*, *মিছিল*। লেখার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমি এবং ১৯৯২ সালে শিশু একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। হোসনে আরা ১৯৯৮ সালের ৩০ মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। (নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯-৭১)।

১৩. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।

১৪. দৌলতননেছা খাতুন ১৯২২ সালে বগুড়া জেলার সোনাতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ইয়াছিন আলী ছিলেন রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার। মা নছিরন নেসা। শৈশব থেকেই পড়াশোনার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। মাত্র আট বছর বয়সে গাইবান্ধার ডা. হাফিজুর রহমান এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। নিজের অদম্য চেষ্টা, বাবার উৎসাহ এবং স্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পড়াশোনা চালিয়ে যান তিনি। দৌলতননেছা খাতুন ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪০ সালে আই এ পাস করেন। ১৯৪২ সালে স্নাতক পরীক্ষায় প্রাইভেট প্রার্থীরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। একই সাথে তিনি রাজনীতি এবং সাহিত্য সাধনায়ও সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালে লবণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সচেতন ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৪ সালে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া সমন্বয়ে গঠিত মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার নারীদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদের কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা এলাকার সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তার উদ্যোগে যৌতুক বিরোধী আইন পাস হয়। ১৯৫৭ সালে দৌলতননেছা খাতুনের প্রথম উপন্যাস *পথের পরশ* এবং ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় উপন্যাস *বধূর লাগিয়া* প্রকাশিত হয়। এছাড়াও পরবর্তীসময়ে *কোমরপুরের ছোট বউ*, *বিবস্ত্র ধরণী* এবং *নাসিমা ক্লিনিক* নামে তিনটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালে উপন্যাসে 'নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের 'আবদুর রাজ্জাক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' এবং ১৯৮৮ সালে 'দৈনিক দাবানল পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ১৯৯৭ সালের ৪ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্রঃ গোলাম কিবরিয়া পিনু, *দৌলতননেছা খাতুন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ১১-১২)।

১৫. গোলাম কিবরিয়া পিনু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

১৬. রাবেয়া খাতুন ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী মোহাম্মদ মুল্লুক চাঁদ এবং মাতা হামিদা খাতুন। ১৯৪৮ সালে আরমানিটোলা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাবেয়া খাতুন ১২-১৩ বছর বয়স থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তার প্রথম ছোটগল্প 'প্রশ্ন' পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল সাপ্তাহিক *যুগের দাবী*তে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস *মধুমতী*। তার রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, *জীবনের আর এক নাম* (১৯৭৩), *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৪), *দিবস রজনী* (১৯৮১), *নীল নিশীথ* (১৯৮৩), *মোহর আলী* (১৯৮৫), *পাখি সব করে রব* (১৯৮৭), *মিড সামারে* (১৯৮৮), *হানিফের ঘোড়া* (১৯৯৫), *এই বিরল কাল* (১৯৯৫), *বসন্ত ভিলা* (১৯৯৯), *ঘাতক রাত্রি* (১৯৯৯), *রঙিন কাঁচের জানালা* (২০০১), *মেঘের পরে মেঘ* (২০০১), *যা কিছু অপ্রত্যাশিত* (২০০২), *দূরে বৃষ্টি* (২০০৩), *কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি* (২০০৪), *শঙ্খ সকাল প্রকৃতি* (২০০৫), *জাগতিক* (২০০৬)। তার প্রধান ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী* (১৯৮৬), *মুক্তিযুদ্ধের গল্পসমগ্র* (১৯৯৮)। *হে বিদেশি ভোর* (১৯৯০), *মোহময়ী ব্যাংকক* (১৯৯১), *টেমস্ থেকে নায়াগ্রা* (১৯৯৩), *কুমারী মাটির দেশে* (১৯৯৪), *হিমালয় থেকে আরব সাগরে* (১৯৯৯), *চেরি ফোটার দিনে জাপানে* (২০০১), *মমি উপত্যাকা এবং অন্যান্য* (২০০৫) তার উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী। সাাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ রাবেয়া খাতুন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৯৩), মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৯৫)।

১৭. লায়লা সামাদ একাধারে ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, নাট্যকর্মী ও নারী সংগঠক। তিনি ১৯২৮ সালের ৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ির এক বনেদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খানবাহাদুর আমিনুল হক ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মা তাহমিনা হক ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির

প্রতি বিশেষ অনুরাগী। কলকাতার ডাইসেশন স্কুল ও নারী শিক্ষা মন্দিরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৯৪২ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাস করেন। কিছুদিন তিনি আশুতোষ কলেজ ও লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পরে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বিএ পাস করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে সাংবাদিকতায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বংশীধর জালাল স্বর্ণ পদক লাভ করেন। সাংবাদিক হিসেবে লায়লা সামাদ *বেগম*, *সংবাদ*, *চিত্রালী*, *পূর্বদেশ* ও *দৈনিক বাংলায়* কাজ করেন। এছাড়া তিনি নারীদের বিনোদন পত্রিকা *অনন্যা* ও *বিচিত্রা* সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তার কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, *দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে* (১৯৬৩), *কুয়াশার নদী* (১৯৬৫), *অরণ্যে নক্ষত্রের আলো* (১৯৭৫), *অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা* (১৯৭৮), *দিনপঞ্জী কড়চা*' ৭১ (১৯৭৫) ইত্যাদি। মুসলিম নারী হিসেবে পঞ্চাশের দশকে ঢাকার মঞ্চ ও বেতার এবং ষাটের দশকে টিভির নাটক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তহবিল সংগ্রহের জন্য কাজ করেছেন। সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চা, অভিনয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণপদক (১৯৭৭), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণ পদক (১৯৭৯), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) লাভ করেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ৯ আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। (লায়লা সামাদ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য; সেলিনা হোসেন, *কথাশিল্পী লায়লা সামাদ*, ঢাকা: রূপসী বাংলা প্রকাশ, ২০১৫)।

১৮. রাজিয়া খান ১৯৩৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তমিজউদ্দিন খান, মাতা রাবেয়া রাহাত খান। তার পিতা অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, আইন সভার সদস্য এবং জাতীয় পরিষদের স্পীকার ছিলেন। রাজিয়া খান কলকাতা এবং করাচীতে স্কুল ও কলেজ জীবন সমাপ্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৯৩ সালে 'Multidimensional Vision in George Eliot's last Novel' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষকতা ছাড়াও সংবাদপত্রে সাংবাদিক এবং সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে ইংরেজি বিভাগের ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৫), একুশে পদক (১৯৯৭)সহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি ২০১১ সালের ২৮ ডিসেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৯. আখতার ইমাম ১৯৯৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার নারিন্দায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইডেন মহিলা স্কুল ও কলেজ থেকে ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৩৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৩৭ সালে বেথুন কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী নিবাস রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে, *যেমন ভেবেছি যেমন দেখেছি* (১৯৮১), *যে হুলে বিষ নেই* (১৯৮৪), *Philosophical Papers* (১৯৮৪), *রোকেয়া হলে বিশ বছর* (১৯৮৬), *দূরের ছায়া* (১৯৮৮), *ইডেন থেকে বেথুন* (১৯৯০), *প্রসঙ্গ নারী* (১৯৯২), *আমার জীবনকথা* (১৯৯৩), *David Hume on the Nature of the Self* (১৯৯৬), *আমার জীবনকথা: বিলেতের দিনগুলো* (১৯৯৭), *আমার জীবনকথা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* (২০০২), *My life* (২০০২)। নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির ক্ষেত্রেও তার উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা, নারী অধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০২ সালে বেগম রোকেয়া পদক এ ভূষিত হন। ২০০৯ সালের ২২ জুন তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

২০. জাহানারা ইমাম ১৯২৯ সালের ৩ মে মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সৈয়দ আবদুল আলী ও মা সৈয়দা বেগম। আধুনিক মনস্ক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবার তত্ত্বাবধানে আধুনিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৪ সালে রংপুরের কারমাইকেল কলেজ থেকে

ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহিত জীবনে তিনি পুরকৌশল স্বামী শরীফ ইমামের কাছ থেকে লেখাপড়ায় উৎসাহ ও আনুকূল্য পেয়েছেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ করেন। জাহানারা ইমাম শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৬-১৯৬৮ পর্যন্ত তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুল, ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর শিশু স্কুলেও শিক্ষকতা করেন। ষাটের দশকে সাহিত্য জগতে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে তার পরিচিতি ঘটে। তবে দিনপঞ্জিরূপে লেখা অনবদ্য গ্রন্থ *একাত্তরের দিনগুলি*র জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি কিছুদিন সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত ছিলেন। *দৈনিক বাংলায়* কলাম লেখার পাশাপাশি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের সমালোচনা করেছেন সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়*। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পুত্র রুমী ও স্বামীকে হারান। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তিনি ‘শহিদ জননী’র মর্যাদায় ভূষিত হন। এই সময় তিনি লেখালেখিতে ব্যস্ত সময় কাটান এবং তার প্রধান গ্রন্থগুলি এ সময়ে প্রকাশিত হয়। তার কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *অন্য জীবন* (১৯৮৫), *বীরশ্রেষ্ঠ* (১৯৮৫), *জীবন মৃত্যু* (১৯৮৮), *চিরায়ত সাহিত্য* (১৯৮৯), *বুকের ভিতরে আগুন* (১৯৯০), *নাটকের অবসান* (১৯০), *দুই মেরু* (১৯৯০), *নিঃসঙ্গ পাইন* (১৯৯০), *নয় এ মধুর খেলা* (১৯৯০), *ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস* (১৯৯১) ও *প্রবাসের দিনলিপি* (১৯৯২)। এছাড়া তিনি ১৯৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে গণআদালত গড়ে তোলেন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২১. রাজিয়া মজিদের জন্ম ১৯৩০ সালে জামালপুর জেলার শ্যামপুর গ্রামে। তার পিতা আব্দুস সবুর সিদ্দিকী, মাতা কামরুন নেসা। ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতার লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৮ সালে বিএ পাস করেন। ১৯৫০-৫১ সালে তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, *আকাশে অনেক রং* (১৯৭৯), *নক্ষত্রের পতন* (১৯৮২), *সেই তুমি* (১৯৮৪), *দিনের আলো রাতের আঁধার* (১৯৮৪), *এই মাটি এই প্রেম* (১৯৮৫), *অরণ্যে জনতা* (১৯৮৭), *শতাব্দীর সূর্যশিখা* (১৯৮৭), *সুন্দরতম* (১৯৮৮), *জ্যোৎস্নায় শূন্য মাঠ* (১৯৮৯), *অন্তরলোকে জ্বলে জোনাকি* (১৯৯৩), *বৃষ্টি ভেজা মুখ* (১৯৯৪), *যুদ্ধ ও ভালবাসা* (১৯৯৬), *নীলিমায় অশনি সংকেত* (২০০৬)। এছাড়া *রাজিয়া মজিদের গল্প সংগ্রহ* (১৯৮৮) এবং *রাজিয়া মজিদের সেরা গল্প* (২০০০) তার রচিত ছোটগল্পের সংকলন। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৮), একুশে পদক (১৯৮৯) সহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি ২০১৮ সালের ৩০ জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

২২. দিলারা হাশেম ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক এবং ১৯৫৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোটগল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্য জীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে প্রথম উপন্যাস *ঘর মন জানালা* প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, *একদা এবং অনন্ত* (১৯৭৫), *স্তব্ধতার কানে কানে* (১৯৭৭), *আমলকীর মৌ* (১৯৭৮), *বাদামী বিকেলের গল্প* (১৯৮৩), *কাকতালীয়* (১৯৮৫), *মিউর‍্যাল* (১৯৮৬), *শঙ্খ করাত* (১৯৯৫), *অনুক্ত পদাবলী* (১৯৯৮), *সদর অন্দর* (১৯৯৮), *সেতু* (২০০০), *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমূহ* (২০১১)। ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, *হলদে পাখীর কান্না* (১৯৭০), *সিন্ধুপারের উপাখ্যান* (১৯৮৮), *নায়ক* (১৯৮৯)। ১৯৭৭ সালে তার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ *ফেরারী* প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। বর্তমানে তিনি ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে স্থায়ী সদস্য হিসেবে কর্মরত।

২৩. মকবুলা মনজুর ১৯৩৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার মুগবেলাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মিজানুর রহমান, মাতা মাহমুদা খাতুন। মকবুলা মনজুর ১৯৫২ সালে টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী

কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৫৮ সালে ইডেন মহিলা কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। পরবর্তীসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি *সাপ্তাহিক বেগম* পত্রিকার ফিচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফিচার সম্পাদক হিসেবে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *আর এক জীবন* (১৯৬৮)। অন্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, *অবসন্ন গান* (১৯৮২), *বৈশাখে শীর্ণ নদী* (১৯৮৩), *জল রং ছবি* (১৯৮৪), *আত্মজ ও আমরা* (১৯৮৮), *পতিতা পৃথিবী* (১৯৮৯), *প্রেম এক সোনালি নদী* (১৯৮৯), *শিয়রে নিয়ত সূর্য* (১৯৮৯), *অচেনা নক্ষত্র* (১৯৯০), *কনে দেখা আলো* (১৯৯১), *নদীতে অন্ধকার* (১৯৯৬), *লীলা কমল* (১৯৯৬), *কালের মন্দিরা* (১৯৯৭), *বাউল বাতাস* (২০০১), *ছায়াপথে দেখা* (২০০২), *একটাই জীবন* (২০০৪)। তার আত্মজৈবনিক উপন্যাস *কালের মন্দিরা* ১৯৯৭ সালে জাতীয় আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পুরস্কার অর্জন করে। প্রধান পরিচয় ঔপন্যাসিক হলেও তিনি অনেক ছোটগল্পও লিখেছেন। ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, *সায়াহ্ন যূথিকা* (১৯৭৮), *শকুনেরা সবখানে* (১৯৮৯), *নক্ষত্রের তলে* (১৯৮৯), *একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯১), *দিন রজনী* (১৯৯৩), *মাতৃঋণ* (২০০৪)। তার একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ *জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯২)। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেছেন বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক (১৯৮৪), কমর মুশতারী স্মৃতি পদক (১৯৯০), অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (১৯১৪), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০০৫)। এই কথাশিল্পী ২০২০ সালের ৩ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

২৪. রিজিয়া রহমান ১৯৩৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার নয়াবাদ গ্রামে। পিতা আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক, মাতা মরিয়াম বেগম। ১৯৪৭ সালে তিনি পরিবারের সাথে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। ১৯৬৫ সালে ইডেন মহিলা কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সাহিত্য পত্রিকা *ত্রিভুজ* এর সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ষাটের দশক থেকেই *ইত্তেফাক* এবং *ললনা* পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, *উত্তর পুরুষ* (১৯৭৭), *রক্তের অক্ষর* (১৯৭৮), *অরণ্যের কাছে* (১৯৮০), *অলিখিত উপন্যাস* (১৯৮০), *শিলায় শিলায় আগুন* (১৯৮০), *সূর্য সবুজ রক্ত* (১৯৮০), *ধবল জ্যোৎস্না* (১৯৮০), *ঘর ভাঙা ঘর* (১৯৮৪), *একটি ফুলের জন্য* (১৯৮৬), *বং থেকে বাংলা* (১৯৮৭), *শুধু তোমাদের জন্য* (১৯৮৮), *হে মানব মানবী* (১৯৮৯), *হারুন ফেরেনি* (১৯৯৪), *বাঘবন্দী* (২০০৬), *সীতা পাহাড়ে আগুন* (২০১০)। *অভিবাসী আমি* এবং *নদী নিরবধি* তার আত্মজীবনীমূলক রচনা। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৮), একুশে পদক (২০১৯) সহ নানা পুরস্কার এবং সম্মাননা। ২০১৯ সালে ১৬ আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন ।

২৫. সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহীতে। পৈতৃক নিবাস লক্ষীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। পিতা এ কে মোশাররফ হোসেন, মাতা মরিয়ম-উন-নিসা বকুল। সেলিনা হোসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬৭ সালে স্নাতক এবং ১৯৬৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। ১৯৬৯ সালে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ *উৎস থেকে নিরন্তর* প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় বিশ বছর *ধান শালিকের দেশ* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রায় ৪০টি উপন্যাস, ৭টি গল্পগ্রন্থ, ৪টি প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা সেলিনা হোসেন বর্তমানে বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তার বই সমগ্র ইংরেজি, ফরাসি, জাপানি, স্প্যানিশ, রুশসহ একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার রচিত কালজয়ী উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬), *যাপিত জীবন* (১৯৮১), *ক্ষরণ* (১৯৮৮), *কাঁটাতারে প্রজাপতি* (১৯৮৯), *ভালোবাসা প্রীতিলতা* (১৯৯২), *যুদ্ধ* (১৯৯৮), *গায়েত্রী সন্ধ্যা* (তিনখণ্ড)। *স্বদেশে পরবাসী* (১৯৮৫), *ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন* (১৯৮৫), *একাত্তরের ঢাকা* (১৯৮৯) ইত্যাদি তার জনপ্রিয় প্রবন্ধ। কিশোরদের জন্য তিনি লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ *কাকতাড়ুয়া* (১৯৯৬)। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮০), একুশে পদক (২০০৯), স্বাধীনতা পদক (২০১৮) সহ নানাবিধ পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ

করেছেন তিনি। জনপ্রিয় এ কথাসাহিত্যিক ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

২৬. সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবদুল বারি, মা সৈয়দা সাবেরা খাতুন। উকিল পিতা সুফিয়ার সাত বছর বয়সে গৃহত্যাগ করলে মূলত মার কাছেই তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। সুফিয়া কামাল তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতায় গেলে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সান্নিধ্য আসেন এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৩ সালে সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর উৎসাহে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ সালে তিনি তার প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ' রচনা করেন। ১৯২৬ সালে তার প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত মুসলিম মহিলা সংগঠন আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলামে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে তিনি ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে স্বামী মারা যাবার পর ১৯৩৩-৪১ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি তার সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালে *বেগম* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ বছরই তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৮ সালে তাকে সভানেত্রী করে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তার যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সুলতানা* পত্রিকা। একই বছর চট্টগ্রামের লেখক ও অনুবাদক কামাল উদ্দীন আহমদের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১৯৫২-১৯৭১ পর্বে সকল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথেই তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাচিত হন এবং আজীবন এই সংগঠনটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতার পরেও তিনি অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য সুফিয়া কামাল অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় তার জীবনাবসান ঘটে। *একালে আমাদের কাল* তার আত্মজীবনীমূলক রচনা। (বাংলাপিডিয়া, অনলাইন সংস্করণ, প্রবেশের তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৯)।

২৭. সুফিয়া কামালের গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য; সাজেদ কামাল (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ. ৬৫৮।

২৮. 'শহীদ রক্তের ঋণ' সম্পূর্ণ কবিতা দ্রষ্টব্য; সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫।

২৯. সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬।

৩০. 'বাহান্ন থেকে চৌষট্টির পরিক্রমা' সম্পূর্ণ কবিতা দ্রষ্টব্য; সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭।

৩১. সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯।

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮-৩৯।

৩৩. 'ঊনসত্তুরের এই দিনে' সম্পূর্ণ কবিতা দ্রষ্টব্য; সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯।

৩৪. 'মোর যাদুদের সমাধি পরে' সম্পূর্ণ কবিতা দ্রষ্টব্য; সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭-১৮।

৩৫. সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯।

৩৬. সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৪১।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৮. *ঐ*, পৃ. ৫৫।

৩৯. ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে নীলিমা ইব্রাহিম (নীলিমা রায় চৌধুরী) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী এবং মাতা কুসুমকুমারী দেবী। তিনি খুলনা করোনেশন বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৫),

কলকাতা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট থেকে আইএ (১৯৩৭) এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বিএবিটি (১৯৩৯) পাস করেন। ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম 'বিহারীলাল মিত্র গবেষণা' বৃত্তি লাভ করেন। একই বছর তিনি ইন্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোরের ক্যাপ্টেন ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়। তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৭১-৭৫), বাংলা একাডেমির অবৈতনিক মহাপরিচালক (১৯৭৪-৭৫) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষের (১৯৭১-৭৭) দায়িত্ব পালন করেন। একজন সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নীলিমা ইব্রাহিম সমাজকর্ম ও সাহিত্যে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য বহু পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), রোকেয়া পদক (১৯৯৬), একুশে পদক (২০০০)। ২০০২ সালের ১৮ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্র: রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩)।

৪০. নূরজাহান বেগম, 'নীলিমা ইব্রাহিম: বেগমকে করেছেন সমৃদ্ধ', রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩, পৃ. ৬৩।

৪১. *ঐ*, পৃ. ৬২।

৪২. নীলিমা ইব্রাহিমের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে, প্রবন্ধ-গবেষণা: *শরৎ-প্রতিভা* (১৯৬০), *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১৯৬০), *বাংলার কবি মধুসূধন* (১৯৬১), *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক* (১৯৬৪), *বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা* (১৯৭২), *বেগম রোকেয়া* (১৯৭৪), *বাঙ্গালী মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৮৭), *সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ* (১৯৯১), *সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত: অতঃপর অমানিশার অন্ধকার* (১৯৯৫), *অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভাস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি* (১৯৯৫), *বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব* (১৯৯৬); ছোটগল্প: রমনা পার্কে (১৯৬৪); উপন্যাস: *বিশ শতকের মেয়ে* (১৯৫৮), *পথ শ্রান্ত* (১৯৫৮), *এক পথ দুই বাঁক* (১৯৫৮), *কেয়াবন সঞ্চারিণী* (১৯৬২), *বহ্নিবলয়* (১৯৮৫) ; কথানাট্য: *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১ম খণ্ড ১৯৬৬, ২য় খণ্ড ১৯৯৭) ; নাটক: *দুয়ে দুয়ে চার* (১৯৬৪), *যে অরণ্যে আলো নেই* (১৯৭৪), *রোদ-জ্বলা বিকেল* (১৯৭৪), *সূর্যাস্তের পর* (১৯৭৪) ; অনুবাদ: *এলিনর রুজভেল্ট* (১৯৫৫), *কথাশিল্পী জেমস ফেনিমোর কুপার* (১৯৬৮), *বস্টনের পথে* (১৯৬৯); ভ্রমণকাহিনী: *শাহী এলাকার পথে পথে* (১৯৬৩); আত্মকাহিনী: *বিন্দু বিসর্গ* (১৯৯১) এবং *নীলিমা ইব্রাহিম রচনাসমগ্র* (২০০১)।

৪৩. ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'নীলিমা ইব্রাহিমের সাহিত্যগবেষণা', *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।

৪৫. রফিকুল ইসলাম, 'অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম: এক অনন্য সাধারণ অকুতোভয় বিদুষী', *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

৪৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'নীলিমা ইব্রাহিম: জীবনকথা', *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

৪৭. *ঐ*, পৃ. ২০।

৪৮. সেলিনা পারভীন ১৯৩১ সালের ৩১ মার্চ নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ছোট কল্যাণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৌলভী আবিদুর রহমান, মা মোসাম্মৎ সাজেদা খাতুন। শৈশবে পিতৃদত্ত নাম ছিল মনোয়ারা বেগম মনি। তবে ১৯৫৪ সালে তিনি এফিডেভিট করে সেলিনা পারভীন নাম গ্রহণ করেন। ফেনী সরলা বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ নানা পারিবারিক প্রতিকূলতার জন্য পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হননি। ১৯৪৯ সালে প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ১৯৪৫ সালে মোহনগঞ্জ থাকার সময় কলকাতানিবাসী শিক্ষয়িত্রী উমার সংস্পর্শে আসেন। তিনি সেলিনা পারভীনকে সাহিত্য সাধনায়

অনুপ্রাণিত করেন। তার লেখা *পূর্বদেশ*, *আজাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *সংবাদ*, *বেগম* ও *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। ফেনীতে ছাত্র পড়িয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও ১৯৫৬ সালে চলে আসেন ঢাকায়। ১৯৫৭ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালে নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে রোকেয়া হলে মেট্রনের চাকরি, ১৯৬০-৬১ সালে আজিমপুর বেবী হোমে শিক্ষকতা এবং ১৯৬৫ সালে সলিমুল্লাহ এতিম খানায় চাকরি করেন। ১৯৬৬ সালে সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় সম্পাদকের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেই সময় থেকেই লেখালেখি এবং সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে তার প্রচেষ্টা এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *শিলালিপি* পত্রিকা। এছাড়া ছবি আঁকা, সংগীত চর্চা, ব্লক তৈরি এবং ডিজাইনের কাজেও পারদর্শী ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্য দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীর সাথে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া, অনলাইন সংস্করণ, প্রবেশের তারিখ, ২৮ অক্টোবর ২০১৯)।

৪৯. *শিলালিপি*র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট-১৪

৫০. নীলিমা ইব্রাহিম, 'নিষ্ঠাবতী সাংবাদিক শহীদ সেলিনা পারভীন', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকাঃ ১৯৯৬, পৃ. ৩৩।

৫১. জাহানারা ইমাম, 'সংগ্রামী এক নারী সেলিনাকে ঘিরে', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪।

৫২. মকবুলা মনজুর, 'স্মৃতি থেকে নেয়া', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।

৫৩. সাক্ষাৎকার, হাশেম খান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা, ১৭ জুলাই ২০১৯।

৫৪. শামসুর রাহমান, 'সেলিনা পারভীন স্মরণে', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

৫৫. শেলী শাহাবউদ্দিন, 'শহীদ সেলিনা পারভীন ও শিলালিপি', *ভোরের কাগজ*, ২৯ মার্চ ২০১৯।

৫৬. সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০।

৫৭. জাহানারা আরজু ১৯৩২ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আফিল উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, মা খোদেজা খাতুন। মানিকগঞ্জে স্কুলজীবন শেষ করে ইডেন গার্লস কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সম্মানসহ এমএ পাস করেন। তার প্রথম কবিতা ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলায় *আজাদ* পত্রিকায় মুকুলের মাহফিলে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে তার লেখা *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *বেগম*, *মিল্লাত*, *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্যচর্চা ছাড়া সম্পাদনা কর্মেও তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ সাল থেকে তিনি এবং সুফিয়া কামাল *সাপ্তাহিক সুলতানা* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার রচিত গ্রন্থ দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। ইংরেজি ছাড়াও তার বেশকিছু কবিতা ফারসি, স্প্যানিশ ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার কবিতা অবলম্বনে 'শব মেহের' নামক স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নারী আন্দোলন সৃষ্টিতে এই চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক (১৯৮৭) সহ অনেক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। (সূত্রঃ 'জাহানারা আরজুঃ তার দিনকাল',ওয়ার্ল্ড বাংলা ডট কম, প্রবেশের তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮; মুহম্মদ মতিউর রহমান, 'কবি জাহানারা আরজু', দৈনিক সংগ্রাম, ৪ ডিসেম্বর ২০১৫)।

৫৮. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।

৫৯. 'শোণিতাক্ত আখর' সম্পূর্ণ কবিতা দ্রষ্টব্য; শামসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পা.), *একুশের কবিতা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯।

৬০. মেহেরুন্নেসা ১৯৪২ সালের ২০ আগস্ট কলকাতার খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আব্দুর রাজ্জাক, মা নুরুননেসা। চার ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তার পরিবার ঢাকায় চলে আসে। প্রথমে পুরান ঢাকায়, পরবর্তীতে মিরপুরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। শৈশব থেকেই তার কবিতা লেখার প্রতি আগ্রহ ছিল। মেহেরুন্নেসা বাংলা একাডেমিতে কিছুদিন অনুলিখনের কাজ করেন। পরে ১৯৬১ সালে ফিলিপস রেডিও কোম্পানিতে চাকরি নেন। এছাড়া তিনি

ইউএসআইএস লাইব্রেরিতেও অনুলিখনের কাজ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি চলে তার লেখালেখি ও অন্যান্য কার্যক্রম। এছাড়া প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথেও তার সম্পৃক্ততা ছিল। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা না করা নিয়ে বিহারিদের সাথে দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে ২৩ মার্চ সকাল ১০ টায় মিরপুরের ৬ নম্বর সেকশনের, ডি ব্লক, ১২ নম্বর রোডে নিজ বাড়িতে বাংলাদেশের মানচিত্রে খচিত পতাকা উত্তোলন করেন। এর ফলে ২৭ মার্চ আলবদর বাহিনী তাকে হত্যা করে। (মেহেরুন্নেসা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: কাজী রোজী, *শহীদ কবি মেহেরুননেসা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১১)।

৬১. রিয়াজ মাহমুদ মিঠু, 'শহিদ কবি মেহেরুন্নেসার জন্মবার্ষিকী মঙ্গলবার', www. bahumatrik.com, প্রবেশের তারিখ, ২০ আগস্ট ২০১৯।

৬২. *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৬ মার্চ ১৯৭২।

৬৩. 'ফাল্গুন ১৩৫৮ স্মরণে; আজকে' শিরোনামে এই কবিতাটি ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি *বেগম* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬৪. 'আজকে শপথ' শিরোনামে এই কবিতাটি ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি *বেগম* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬৫. রিয়াজ মাহমুদ মিঠু, *প্রাগুক্ত*।

৬৬. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১২, পৃ. ৯২।

৬৭. *প্রথম আলো*, ২৯ আগস্ট ২০১৯।

৬৮. সম্পাদকীয়, *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৬ মার্চ ১৯৭২।

৬৯. সাক্ষাৎকার, কাজী রোজী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বনানী, ঢাকা, ২৮ আগস্ট ২০১৯।

৭০. কাজী রোজী, *শহীদ কবি মেহেরুননেসা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১১, পৃ. সাত।

৭১. কবি মেহেরুন্নেসা স্মরণে সুফিয়া কামালের লেখা সম্পূর্ণ কবিতা দ্রষ্টব্য; সাজেদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০।

৭২. *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৬ মার্চ ১৯৭২।

উপসংহার

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় বিশালায়তন ভারতবর্ষের দু'প্রান্তে অবস্থিত দু'টি ভিন্ন (ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক, রীতিনীতি, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে) ভূখণ্ড পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা হস্তগত করে নেন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করতে থাকেন। পাশাপাশি চলে বাঙালি সংস্কৃতিকে দমিয়ে রাখার অব্যাহত প্রয়াস। যখনই বাঙালির ভাষা তথা সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছে তখনই সর্বাগ্রে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সংস্কৃতিকর্মীরা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা জনগণকে সচেতন করেছেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মী, সংগঠক ও শিল্পী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক অবদমনের যে চেষ্টা চালায় তার প্রথম শিকার হয় বাংলা ভাষা। সেই সময় সারা দেশে ভাষা সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা সভা সমিতি, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল এবং নারীরাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ভাষার সমর্থনে বিবৃতি ও স্মারকলিপি প্রদান, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ, ধর্মঘট এবং পত্রপত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে ভূমিকা রেখেছিলেন তারা। এছাড়া তমদ্দুন মজলিশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক তৎপরতার সাথেও নারীরা সম্পৃক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের আগে সাধারণ নারীরা ঢাকায় বিশেষভাবে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন এ জাতীয় প্রথম আন্দোলন যেখানে নারীসমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি যে স্বতন্ত্র তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জনমানসে স্পষ্টতই এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে স্বতন্ত্র চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। তবে বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। দেশ বিভাগ উত্তরকালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ'। এই সংগঠন দুটির সম্মিলিত উদ্যোগে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে ১৯৫১ সালের মার্চে চার দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করে উদ্বোধনী অভিভাষণে সুফিয়া কামাল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে যে বক্তব্য প্রদান করেন তা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলার নতুন সংস্কৃতি চেতনার পথপ্রদর্শক। একই সময়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সংসদের তৎপরতা ছিল বহুমাত্রিক। সংস্কৃতি সংসদের সূচনালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সংস্কৃতি সংসদের কার্যকরী পরিষদেও বেশ কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। এছাড়া সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, বিচিত্রানুষ্ঠান, নাটক মঞ্চায়ন, নৃত্যানুষ্ঠান, গণসংগীত, আবৃত্তি, কবি সম্মেলন, বসন্ত উৎসব, রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত জন্মজয়ন্তীসহ সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উদার ও মননশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সংস্কৃতি সংসদ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল যার প্রভাব সমগ্র পূর্ব বাংলায় পড়েছিল। এভাবে পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার সূচনা হয়।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলার ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির ওপর আঘাত অব্যাহত থাকে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ১৯৪৮-১৯৫২ সালের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভাষা বিতর্ককে উর্দুর সপক্ষে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে প্রথম নিরবতা ভাঙেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার মাধ্যমে। ফলে পুনরায় রাষ্ট্রভাষা বিতর্কটি নতুন মাত্রা পায় এবং নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়। এই পর্যায়ের আন্দোলন শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা এবং মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়ে। মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই বাংলার নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। নারীরা ভাষা আন্দোলনের মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদান, বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে মিছিল মিটিংয়ে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রেও নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালনা করতে অর্থ সংগ্রহের জন্য মেয়েরা বিভিন্ন স্থানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রচারণায়ও নারীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তারা পোস্টার এবং লিফলেট লেখা, লাগানো এই কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কোনো কোনো অঞ্চলে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগ্রাম কমিটিতেও যুক্ত ছিলেন কেউ কেউ। শুধু ১৯৫২ সালের আন্দোলনেই নয়, পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৫৩-১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায় পর্যন্ত চলমান আন্দোলনে প্রতি বছরই নারীরা অংশগ্রহণ করেন এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্রমে মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনের কালপর্ব থেকে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংকট নিরসনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় সংস্কৃতিকর্মীদের নানামাত্রিক সংস্কৃতি চর্চার অনবদ্য প্রয়াস। এই প্রয়াস থেকেই ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতি মজলিস। এই সংগঠনটি ভাষা আন্দোলনের আবহে গড়ে ওঠা পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করতে ভূমিকা রাখে। ফাতেমা খায়ের, ফরিদা মীর্জা, ছালেহা খাতুনসহ অনেক নারীই প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংগঠনটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে প্রগতি মজলিসের উদ্যোগে কুমিল্লায় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা থেকে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, লিলি খান, নুরজাহান মোর্শেদ, রওশন জামিল প্রমুখ। সম্মেলনে সাহিত্য অধিবেশনে কাব্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন সুফিয়া কামাল। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির যে নতুন জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল, যে নতুন চেতনার জন্ম হয়েছিল সেই বিষয়টি তার বক্তব্যে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষ যে একটি আলাদা সংস্কৃতির ধারক এবং তাদের যে নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে, এই চেতনা বিস্তারে সম্মেলনটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চার ধারাবাহিকতাতেই ১৯৫২ সালে ঢাকায় প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রথম ও প্রধান সংগঠন হিসেবে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল পাক্ষিক সাহিত্য সভা, বিশেষ সাহিত্য সভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জয়ন্তী উৎসব, বাংলা নববর্ষ পালন, বিভিন্ন বিদগ্ধ

ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা এবং নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি। এই সংসদের কার্যক্রম স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও এটি প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এবং বিকাশে এক অনবদ্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল যেখানে সুফিয়া কামাল, শামসুন নাহার মাহমুদ, হোসনে আরা, লায়লা সামাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অবদান রয়েছে। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের আত্মপ্রকাশের কিছুকাল পরেই ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে বেগম ক্লাব। বেগম ক্লাব ছিল দেশের নারী লেখক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মীদের মিলনস্থল। কূপমণ্ডুক, পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা ও ধর্মীয় নিষেধের বেড়াজালে নারী সমাজকে শৃঙ্খলিত রাখার পদক্ষেপকে প্রতিহত করতে *বেগম* পত্রিকা ও বেগম ক্লাব তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় এ দেশের নারীসমাজের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধনার বিকাশে বিশেষ করে নারী সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার সুযোগ সৃষ্টিতে এর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও শের-ই-বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সংস্কৃতি অঙ্গনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে ১৯৫৪ সালের ২৩-২৬ এপ্রিল ঢাকার কার্জন হলে এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে নারীরা এই সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সাহিত্য সভায় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারীগণ এই সম্মেলন সফল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে আয়োজিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ছিল সময়োপযোগী একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

১৯৫৫ সালে উপমহাদেশের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর অসামান্য প্রতিভা চিরস্মরণীয় করে রাখতে প্রতিষ্ঠিত হয় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী। এই একাডেমী প্রতিষ্ঠায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এখানে শিক্ষক হিসেবেও নারীরা যোগদান করেছিলেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির দাপ্তরিক কাজ থেকে শুরু করে শিল্পী সম্মেলন, রবীন্দ্র-নজরুল-বুলবুল চৌধুরী-আব্বাসউদ্দীন-জয়নুল আবেদিন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক, শিল্পীদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন, বর্ষবরণ, বসন্ত উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি পালন, বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল পাঠানো এই সকল ক্ষেত্রেই নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর অবদান অনস্বীকার্য। আর এই একাডেমীর প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল অনুষ্ঠানেই নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'ডাকসু'র প্রমোদ সম্পাদক মীর মকসুদুস সালেহীনের উদ্যোগে নাটককে জীবনমুখী করে তোলার প্রয়াস নিয়ে গঠিত হয় ড্রামা সার্কল। এই গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য ছিল পেশাদার মঞ্চরীতির বাইরে নতুন ধারার নাটক মঞ্চায়ন করা। ভাষা আন্দোলন-উত্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মতো নাট্যচর্চাও অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ, আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। আর এই উদ্দেশ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী এবং ডাকসু নাট্যদল গঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনসমূহ যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শমণ্ডিত প্রতিবাদী নাট্যচর্চার ধারা গড়ে তোলে, তা সমগ্র দেশের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীকে উৎসাহিত করে। ক্রমশ নাটক হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শক্তিশালী মাধ্যম। যেখানে সকল সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের নাট্যচর্চায় ইডেন কলেজ ছাত্রী ইউনিয়ন, মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল ইউনিয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ, বিদ্যার্থিনী ভবন ছাত্রীবৃন্দ, মহিলা নাট্য সংগঠন, ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদ শুধু নারীর অংশগ্রহণ ও

উদ্যোগে অনিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চায়ন করে। এসব নাটকে নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রেই নারীরা অভিনয় করতেন।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইল জেলার কাগমারীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আহূত দুই দিনব্যাপী পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন নামে পরিচিত। কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পূর্বে এত ব্যাপকভিত্তিক আর কোনো সাংস্কৃতিক সম্মেলন পূর্ব বাংলায় হয়নি। তাই পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এই সম্মেলন খুবই উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনে সে যুগের তুলনায় নারীদের যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষণীয়। সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা, প্রবন্ধ পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকল ক্ষেত্রেই নারীর উপস্থিতি ছিল। সম্মেলনে প্রগতিশীল ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালি নারীদের এক আলোকিত সমাবেশ ঘটেছিল।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক শাসন জারি হলে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত আরো প্রকট হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান এক ধর্ম, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি ও অভিন্ন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি জাতি গঠনের প্রয়াস চালান। স্বৈরশাসনের মাধ্যমে সরকার পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং নানাভাবে বিকৃতির অপচেষ্টা চালায়। বাংলা হরফের পরিবর্তে আরবি ও রোমান হরফ প্রবর্তন এবং জাতীয় ভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানের পরিকল্পনাবিদগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কার করেন। কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল' এর 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান'-এ আংশিক পরিবর্তন করে মহাশ্মশানের স্থলে গোরস্তান করা হয়। তবে এসব পদক্ষেপ বিপরীত ফল বয়ে আনে এবং এ ধরনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। অন্যান্য সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মতো এই ক্ষেত্রেও নারীরা অংশগ্রহণ করেন। সুফিয়া কামাল, লায়লা সামাদ এবং নূরজাহান বেগম বাংলা ভাষার সংস্কার প্রয়াসের বিরুদ্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎসব শুরু হয়। বিশ্বজুড়ে বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের আয়োজন চলতে থাকে। আর পাকিস্তানে চলে এর বিপরীত প্রয়াস। ঢাকার শিল্পী, সাহিত্যিক মহলে ভয়, ভীতি ও হুমকি দেবার মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকায় মোট তিনটি কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে গঠিত কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এবং ঢাকা প্রেসক্লাবের অপেক্ষাকৃত তরুণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত কমিটি। এই তিনটি কমিটি আলোচনার মাধ্যমে একত্র হয়ে ২৪-২৭ বৈশাখ চারদিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে গঠিত কমিটি ১১ ও ১২ বৈশাখ দুটি সভার আয়োজন করে। এই সকল অনুষ্ঠানেই নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয়ভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক নীলিমা ইব্রাহিম। এছাড়া রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সুফিয়া কামাল, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং শান্তি নন্দী। এই আয়োজনে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি ও নাটকের সাথেও নারীরা সম্পৃক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, হুসনা বানু খানম, সন্‌জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, বিলকিস নাসিরউদ্দীন, জাহানারা ইসলাম, নাসরীন চৌধুরী, মাহবুব আরা, আখতার জাহান, হুসনে আরা, বেলা রায়, লতিফা হক, হোসনে আরা লাইজু, মন্দিরা নন্দী, লায়লা হাসান, রোজী, ডালিয়া, ফরিদা মজিদ,

শীলা, জিনাত গণি, সেলিমা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, ফাহমিদা মজিদ প্রমুখ। ঢাকার বাইরে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হয় চট্টগ্রাম শহরে। চট্টগ্রামে এই অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সুফিয়া কামাল, ফিরোজা বারী, জওশন আরা চৌধুরী, বেগম সানোয়ার আলী, বেগম জি. এ. হক, বেগম জেবুউন্নেসা জামাল, বেগম হোসনে আরা চৌধুরী, প্রণতি সেন প্রমুখ। এছাড়া ময়মনসিংহে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে অংশ নেন সুমিতা নাহা। সামরিক শাসনকালে দেশে এক ধরনের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা দেখা গিয়েছিল। এর মধ্যে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অঙ্গন আলোড়িত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জয়যাত্রার সূচনা করেছিল আর এই নতুন জয়যাত্রায় নারীরা ছিলেন সমান অংশীদার।

১৯৬১ সালে সংস্কৃতিচর্চায় দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমুখী হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। দেশব্যাপী প্রবল উৎসাহের সাথে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন সংস্কৃতি জগতে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এরই পরম্পরা হিসেবে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পেশার সাথে জড়িত সংস্কৃতিমনা কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের ফলেই গড়ে উঠেছিল ছায়ানট। ছায়ানট বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ভূমিকা রেখেছে। ছায়ানট যেহেতু সংস্কৃতি ও সংগীত চর্চায় এদেশীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলেছে সব সময়, সেহেতু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় এদেশীয় সংস্কৃতি, গান প্রভৃতি গণমানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে সংস্কৃতিও যে বড় ধরনের মাধ্যম তাও স্পষ্ট করেছে ছায়ানট। ছায়ানটের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নারীরা। সুফিয়া কামাল এবং সন্‌জীদা খাতুন ছিলেন এই সংগঠনটির অন্যতম প্রাণশক্তি। ছায়ানট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর এর প্রথম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুফিয়া কামাল। সম্পাদক ছিলেন ফরিদা হাসান। এছাড়া শামসুন্নাহার রহমান, সন্‌জীদা খাতুন, সায়েরা মহিউদ্দীন, হোসনে আরা, রোকেয়া রহমান কবীর, নুরুন্নাহার আবেদীন প্রমুখ এই সংগঠনের সাথে শুরু থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে যারা ছায়ানটের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইফফাত আরা দেওয়ান। এছাড়া ছায়ানটের প্রতিটি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথেই উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ। এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ বাঙালিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনে এটি একটি সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছেন, আলোচনা শুনেছেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। এই সাহিত্য সপ্তাহে বাঙালির আবহমান সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা প্রসারের চেষ্টা করা হয়েছিল, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল। এই আয়োজনে বাংলা বিভাগের শিক্ষক নীলিমা ইব্রাহিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন উপসংঘ (প্রদর্শনী, কবিতা পাঠ, গদ্যপাঠ, নাটক, সংগীত, প্রচার ও প্রকাশনা) এর সদস্য হিসেবে নারীরা দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও কবিতা ও গদ্য পাঠের আসর, নাটক থেকে পাঠ এবং বাংলা গানের আসরে উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল।

১৯৬৪ সালে (বাংলা ১৩৭১) বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ বৈশাখ নববর্ষ হিসেবে পালন করা হয়। পহেলা বৈশাখ বা বাংলা বর্ষবরণ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু পাকিস্তান আমলে এই উৎসবকে হিন্দুয়ানি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। বাঙালির অর্থনৈতিক বর্ষ ছিল বৈশাখ-চৈত্র,

কিন্তু এই ব্যবস্থাকে ভাঙার জন্য আইয়ুব খানের শাসনামলে একে নিয়ে যাওয়া হয় জুলাই-জুনে। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর আক্রমণের ফলে ষাটের দশকে বাংলা নববর্ষ এক নতুন মাত্রা পরিগ্রহ করে। তখন থেকেই প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি উপাদান হিসেবে নববর্ষ পালিত হতে থাকে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনেও এটি একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ১৯৬৩ সালে পহেলা বৈশাখ প্রভাতী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তনের উদ্বোধন হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে বিদ্যায়তনের বর্ষপূর্তিতে ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলের কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা বর্ষবরণের সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সন্‌জীদা খাতুন, তৈয়বা হক, ইফফাত আরা দেওয়ান এবং ছায়ানটের ছাত্র-ছাত্রীরা। একই দিনে ঐকতান শিল্পী গোষ্ঠী বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে। এছাড়া অন্যান্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনও বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ওই দিনে ঈদ-উল-আজহা থাকায় সে বছর আর কোনো বড় ধরনের অনুষ্ঠান হয়নি। তবে ঘরোয়াভাবে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৬৬ সালের পহেলা বৈশাখ ছায়ানটের প্রভাতী অনুষ্ঠান হয় ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলে এবং সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠান করে ঐকতান গোষ্ঠী। তবে ১৯৬৪ সালে ছায়ানটের উদ্যোগে রমনার বটমূলে বর্ষবরণের প্রভাতী অনুষ্ঠান হয়। বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠান ক্রমশ পূর্ব বাংলায় পহেলা বৈশাখের প্রধান অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নতুন রূপ ও গতি দিতে পহেলা বৈশাখ তথা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর বর্ষবরণের এই আয়োজনের সংগঠক এবং শিল্পী হিসেবে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রগতিশীল তরুণ কবি, গল্পকার ও ছড়াকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী। মার্কসবাদী লেখক সাহিত্যিকদের সংগঠন হলেও মূলত প্রতিবাদী নাটক চর্চার ক্ষেত্রেই এই শিল্পী গোষ্ঠী বেশি আগ্রহী ছিল। এই সংগঠনটি বাস্তবধর্মী নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও অবদান রেখেছে। আর সেই সকল সময়ে নারীরা সকল রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে এই আন্দোলনে অংশীদার হয়েছিলেন। সৃজনীর নাট্য আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন রওশন জামিল, গীতা দত্ত প্রমুখ। এছাড়া প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক কামাল লোহানীর উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী। মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এই সংগঠনটি গণসংগীত, নৃত্যনাট্য পরিবেশনার সাথে সাথে নাটকও মঞ্চায়ন করেছিল। এছাড়া এই সংগঠনটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পুরোনো গণসংগীতগুলোকে নতুন করে সংগ্রহ করেও চালু করেছিল এবং পূর্ব বাংলায় লিখিত গণসংগীতকে ব্যাপকভাবে গণজাগরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিল। রবীন্দ্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি গণআন্দোলনের দিনগুলোতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্রান্তি ছিল অন্যতম। ক্রান্তির এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামের প্রতিটা পর্যায়েই নারীর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। আন্দোলনমুখর দিনগুলোতে এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন আবেদা বেগম, দুলু, মিনি, জাহানারা, নিলুফার বেগম, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, কল্যাণী ঘোষ প্রমুখ।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে রাওয়াল পিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ক্রমান্বয়ে এই বিতর্ক জাতীয় পরিষদের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। ২০ জুন সরকারি দলের নেতা আব্দুস সবুর খানের বক্তব্য এবং ২৪ জুন *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় প্রকাশিত পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বক্তব্য বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্রনাথ

সম্পর্কে তার মন্তব্যের নিন্দা করে বুদ্ধিজীবীরা বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি প্রদানকারীদের মধ্যে সুফিয়া কামাল ও নীলিমা ইব্রাহিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম সরকারের রবীন্দ্রবিরোধী নীতির সমালোচনা করেন। বিবৃতিদানের পাশাপাশি প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন সুফিয়া কামাল। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন সুফিয়া কামাল ও লায়লা আর্জুমান্দ বানু। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। ঢাকার বাইরে খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেটে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীগণ প্রতিবাদ ও বিবৃতি প্রদান করেন। সিলেটে এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ। এভাবে সারা পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়। ৪ জুলাই খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে তার ঘোষণার গ্রহণযোগ্য বাখ্যা দিতে বাধ্য হন। তার পূর্বোক্ত বক্তব্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে এই আন্দোলন সমাপ্ত হয়। এই আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত চর্চা আরও বেগবান হয়। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশাল আঙ্গিকে রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকীর আয়োজন তারই সাক্ষ্য দেয়। এই উপলক্ষ্যে ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমীসহ ঢাকার অন্যান্য সংগঠনসমূহ সংঘবদ্ধভাবে তিন দিনব্যাপী আলোচনা, গান এবং নৃত্যনাট্যের আয়োজন করে। এই সকল অনুষ্ঠানেই নারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

১৯৬৮ সালের সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহাকবি স্মরণ উৎসব আয়োজন। ১৯৬২ সালে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল লেখক সম্প্রদায় সরকার নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ধারায় পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা নামে নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পাঁচ দিনব্যাপী মহাকবি স্মরণ উৎসব আয়োজন। ১৯৬৮ সালের ৫-৯ জুলাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মির্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহাকবি স্মরণ উৎসবের আলোচনা পর্ব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সুফিয়া কামাল, ফাহমিদা খাতুন, মালেকা আজিম, জাহানারা ইসলাম, ফিরোজা বেগম, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, রওশন আরা মাসুদ প্রমুখ।

১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী এবং নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর ঢাকায় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। উদীচী আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করার পরই বিভিন্ন স্থানে গণসংগীত পরিবেশন করার পাশাপাশি কিছু পথনাটক রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাকের উপর প্রদর্শন করা শুরু করে। ষাটের দশকের শেষ দিকে সামরিক শাসন বিরোধী বিক্ষোভে যখন উত্তাল বাংলার জনগণ সেই সময়ে মানুষকে জাগানোর জন্য এবং বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে কৃষক-শ্রমিকদের সভায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাকের উপর চেপে উদীচীর শিল্পীকর্মীরা পরিবেশন করতো গণসংগীত, প্রদর্শন করতো পথনাটক। মুক্তিযুদ্ধের সময় কখনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কখনো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে জনগণের হাতে হাত রেখে উদীচীর শিল্পীকর্মীরাও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর সাথে নারীরা সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রথম থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বা সহায়তা করেছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, সুফিয়া কামাল, অনিমা সিংহ, লায়লা হাসান, রাজিয়া বেগম, তাজিম সুলতানা, মনোরমা বসু, ফৌজিয়া বেগম, বুলা আহমেদ প্রমুখ। এছাড়া উদীচীর পথনাটক ও গণসংগীতের অনুষ্ঠানগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে নারীশিল্পীর অংশগ্রহণ ছিল। একই বছর সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ফজলে লোহানীর বাড়িতে আতাউর রহমান, জিয়া হায়দার প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্বের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়। বাঙালির

স্বাধিকার আন্দোলনের উত্তাল দিনে এই সংগঠনটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সাথে শুরু থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন সুলতানা কামাল এবং নাসিমা খান মজলিশ। পরবর্তীসময়ে আরও অনেক নারী এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই সংগঠনের নাট্যকর্মীরা নানাভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিরোধ চরমে পৌঁছে। পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ লেখকদের গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করার নীতি গ্রহণ করে সরকার। এই লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকার 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' জারি করে। এ সময় পূর্ব বাংলার লেখক-সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' প্রয়োগ করে আইয়ুব সরকার পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধীন চিন্তা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ প্রসারে সহায়ক এমন বেশ কিছু গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে। গ্রন্থগুলো হলো, কামরুদ্দীন আহমদের *The Social History of East Pakistan*, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর *জেলে ত্রিশ বছর*, বদরুদ্দীন উমরের *সংস্কৃতির সংকট* এবং *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, সত্যেন সেনের *আল বেরুনী*, আব্দুল মান্নান সৈয়দের *সত্যের মত বদমাশ* এবং মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক পুস্তিকা *ভোটের আগে ভাত চাই*। লেখক-বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সুপরিকল্পিত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে প্রায় বিশটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার ত্রিশজন শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক এক বিবৃতিতে সরকারের এই পদক্ষেপকে 'বিপজ্জনক' বলে বর্ণনা করে বইগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। এই বিবৃতি প্রদানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুফিয়া কামাল। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায়ও সভাপতিত্ব করেন তিনি। এছাড়া বায়তুল মোকাররমে লেখকদের এক পথসভায়ও বক্তৃতা করেন সুফিয়া কামাল। সভায় 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' বাতিলের দাবি জানানো হয়। এই সভায় অন্যান্যের সাথে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পী শবনম। ১৯৬৯ সালের ১৫ জানুয়ারি লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং আন্দোলনের সমর্থনে এক সভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। এ প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন সুফিয়া কামাল এবং মনোরমা বসু। পূর্ব বাংলার লেখক, বুদ্ধিজীবীদের গ্রন্থ বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র সংগঠন, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা একাত্মতা প্রকাশ করেন। এই আন্দোলনেও নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। আন্দোলনের চাপে সরকার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং ক্রমে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এর পর সিরাজুল ইসলাম রচিত *পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি* নামক গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় আর একটি বড় ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। দু'খণ্ডে রচিত উক্ত গ্রন্থটি ১৯৭০-১৯৭১ শিক্ষাবর্ষে পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক স্কুলসমূহে নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠ্য করা হয়। বইয়ের প্রথম খণ্ডে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি এবং পাকিস্তান অর্জনের মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানত পাকিস্তানি সংস্কৃতির ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভাষা, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যসূচি থেকে এই বই প্রত্যাহারের জন্য সম্মিলিতভাবে আন্দোলন শুরু করেন। বইটি প্রত্যাহারের জন্য দু'টি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়– এর একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে আর অপরটি ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এ দু'টি পরিষদ সংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু করে এবং ক্রমে এই দু'পরিষদের

আন্দোলনের সাথে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরাও সম্পৃক্ত হয়। ১৬জন বুদ্ধিজীবী বইটি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। ১৯৭০ সালের ২৯ আগস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতি দাতাদের নামের মধ্যে প্রথম নামটি ছিল সুফিয়া কামালের। এছাড়া এই আন্দোলনে চট্টগ্রামের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন তাসমিন আরা বেগম, গুলজার বেগম, প্রমুখ। ক্রমাগত আন্দোলনের মুখে সরকার বইটির দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ এবং প্রথম খণ্ড আংশিক বাতিলের ঘোষণা দেন। এভাবেই একের পর এক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন নারীরা।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অভিঘাতে বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট পশ্চাৎপদতার অবসানে প্রথমত ও প্রধানত সংস্কৃতিকর্মীরাই এগিয়ে এসেছিলেন। এই সংস্কৃতিকর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলেন নারী। ক্রমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলন গতিসঞ্চার লাভ করে এবং এক পর্যায়ে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয়। এর ফলে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন হলেও উত্থান ঘটে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের। ফলে স্বভাবতই ক্ষমতার এই পট পরিবর্তনে বাঙালির ক্ষোভ স্তিমিত হয়নি। যার প্রতিফলন দেখা যায় সভা-সামবেশ, মিছিল, কবিতা, নাটক ও গণসংগীতে। এই সময় প্রতিবাদের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম ছিল নাটক ও গণসংগীত। তখন শহিদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল কেন্দ্রস্বরূপ। শহিদ মিনারে মিছিল শুরু এবং শেষ করার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভা, গণসংগীত, নাটক এবং কবিতা পাঠের আসর। ১৯৭০ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক মহল থেকে সরাসরি স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হবার আগেই সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে তা বলা হয়ে গিয়েছিল গান, কবিতা, নাটকের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন পর্বে গঠিত হয়েছিল বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ। বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের গণসঙ্গীত দল ঢাকার শহিদ মিনার, প্রেসক্লাব, রাস্তায়, কখনো বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণসংগীত পরিবেশন করে। সে সময় সর্বত্রই রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সক্রিয়তায় বাঙালি অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করতে পেরেছিল। সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, যেখানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

নারী কবি-সাহিত্যিকরাও তাদের বিভিন্ন লেখনীতে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়কে চিত্রায়িত করেছেন। তারা অসির চেয়েও শাণিত মসি চালনা করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন। যে সকল নারী কবি-সাহিত্যিক ১৯৫২-১৯৭১ পর্বে তাদের লেখনীতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকসহ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম, সেলিনা পারভীন, জাহানারা আরজু এবং কবি মেহেরুন্নেসা। তাদের মননশীলতা এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্যে ত্বরান্বিত হয়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্বের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েই নারীর অংশগ্রহণ ছিল প্রবল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্রম-বর্ণনা উপস্থাপন করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা। এই বেতার কেন্দ্রটির সূচনালগ্ন থেকেই এর সাথে নারীর সম্পৃক্ততা ছিল। বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. মঞ্জুলা আনোয়ার, কাজী হোসনে আরা এবং বেগম মুশতারী শফী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠ, কথিকা রচনা ও পাঠ, নাটক, সংগীত, আবৃত্তি ও সাহিত্য আসর সকল ক্ষেত্রেই নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। তারা তাদের কণ্ঠ দিয়ে এদেশের আপামর

জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত করে রেখেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠ, প্রেরণার উৎস, বিক্ষুব্ধ চেতনার প্রতিচ্ছবি, যেখানে নারী শব্দ সৈনিকদের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা। এই শিল্পী সংস্থার সদস্যরা শুধু কলকাতায় নয়, বিভিন্ন সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গান শোনাতেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ পর্বে গঠিত বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী, ভ্রাম্যমাণ শিল্পী সংস্থা, স্বাধীনতা সঙ্গীত দল, কলম-তুলি-কণ্ঠ সংগ্রাম পরিষদ, স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘ, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থা, বাংলাদেশ গণমুক্তি শিল্পী সংস্থা, শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি, বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী গোষ্ঠী এই সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেই নারীরা যুক্ত ছিলেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যারিস্টার বাদল রশিদের নেতৃত্বে দীলিপ সোমের গীতি আলেখ্য পরিবেশনের জন্য ১৪জন সদস্যের একটি দল দিল্লি, বোম্বে, গোয়া, পুনা, কানপুর প্রভৃতি জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এই দলের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন নারীরা। তারা মুক্তিযুদ্ধকালে স্থানীয় জনগণ, মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির, যুব শিবির, মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা ও তহবিল সংগ্রহের জন্য গণসংগীত, জাগরণী গান, দেশের গান, মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, নাটক, নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তাঞ্চলে ও প্রবাসে বিশেষ করে কলকাতা কেন্দ্রিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে যেমন নারীরা যুক্ত ছিলেন তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং এই কালপর্বে গড়ে উঠা প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেই নারীরা ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। আলোচ্য কালপর্বে নারীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিত্র অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী নারীর মাত্র ১১.৩% শিক্ষিত এবং ৫.৩% অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ছিলেন। সমাজের অধিকাংশ নারীই বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা তখন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বিভাগীয় শহর, জেলা, মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নারীরাও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশক জুড়েই নারী শিক্ষার অগ্রগতি হলেও ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী শিক্ষার হার দাঁড়ায় ১৩.৭%। অর্থাৎ এই দুই দশকে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২.৪%। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তিতেও তেমন অগ্রগতি লক্ষ্যণীয় নয়। তা সত্ত্বেও ষাটের দশকের উত্তাল গণআন্দোলনের তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে যা মোটেই সহজ ছিল না।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে নারীদের জয় করতে হয়েছে সামাজিক রক্ষণশীলতাকে। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার। সামাজিক, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, ধর্মীয় বিভিন্ন দিক থেকেই প্রতিনিয়ত নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা। তখনকার রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে নারীদের আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হতো না। তখন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পর্দাঘেরা ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশায় নারীরা চলাফেরা করতেন। ঘরের মধ্যেও তাদেরকে এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হতো। ঢাকার বাইরে অন্য বিভাগীয় শহরগুলোতে অবস্থা ছিল আরও রক্ষণশীল। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীর বেশির ভাগকেই স্বদেশ কোনো মূল্য না দিলেও, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনেক মূল্য তাদের অনেককেই দিতে হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে চকরিচ্যুত হয়েছিলেন মমতাজ বেগম। শুধু তাই

নয় এই ঘটনার সূত্র ধরেই স্বামীর সাথেও তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। চুয়াডাঙ্গায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কুল ছাত্রী বেলার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই অপরাধে খুলনার ভাষাসংগ্রামী মাজেদা আলীকে হোস্টেল থেকে বের হয়ে যেতে হয়। তবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা এই সকল প্রতিবন্ধকতা সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন।

সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম যেমন নাটক, নৃত্য, সংগীত এই সব কিছুতেই তখন নারীদের স্বাধীনভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে বাধা ছিল। তাই দেখা যায় ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ আয়োজিত 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চায়নের সময় কলেজ ছাত্রী তালেয়া খান এই নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হলেও সামাজিক নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে বিপরীত চিত্রও ছিল। কারণ অনেক প্রগতিশীল, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব তাদের স্ত্রী, বোন, কন্যা বা পরিবারের নারী সদস্যদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের উৎসাহেই নারীরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে সহ অভিনয়ের ক্ষেত্রেও নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। যে সময়ে প্রয়োজনে কোনো সহপাঠীর সাথে কথা বলার জন্য প্রক্টরের অনুমতি নিতে হতো সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ছাত্রীদের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা মোটেও সহজ ছিল না। আবার পারিবারিক বা সামাজিক প্রতিকূলতা দূর করতে পারলেও অনেকেই পড়েছেন সরকারি রোষানলে। ছায়ানটের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য সন্‌জীদা খাতুনকে ঢাকা থেকে রংপুরে বদলি করা হয়েছিল।

সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতা, ভয়-ভীতিকে জয় করেই নারীরা সাংস্কৃতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পথটি মোটেই মসৃণ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই সাহসী ভূমিকার চরম মূল্যও তারা পরিশোধ করেছেন জীবন দিয়ে। এক্ষেত্রে শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন এবং শহিদ কবি মেহেরুন্নেসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের অধিকাংশ নারীরা যখন পশ্চাৎপদতা, অশিক্ষা, সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিকূলতার আবর্ত থেকে মুক্তির আশায় লড়াই করছেন সেই সময়ে এই আলোকিত নারীদের সাহসী প্রচেষ্টাই বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীগণ এই ত্যাগ, সাহসের উপযুক্ত মূল্য, যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছে কি? এই সহজ জিজ্ঞাসার উত্তরটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যে সকল নারী জড়িত ছিলেন তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্মাননাপত্র, সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, স্বীকৃতি পেয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন যাদের পারিবারিক ঐতিহ্য, পরিচিতি এবং আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় এবং যারা ঢাকাকেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, শাহীন সামাদ, সুফিয়া আহমদ, শরীফা খাতুন, হালিমা খাতুন, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, জোহরা কাজীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরের আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া গেলেও অবহেলিতই রয়েছেন বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও মফস্বলের নারীরা, যাদের নামও অনেকের কাছে এখনও অজানা। তাছাড়া বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ পর্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। সেই বিবেচনায় এই দুই ক্ষেত্রের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নারীরাই (ঢাকাকেন্দ্রিক) স্বীকৃতির দিক থেকে এগিয়ে। আর অন্তরালে রয়ে গিয়েছেন ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ মধ্যবর্তী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা। কিন্তু ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক

কর্মীরা বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষকে বাঙালিত্ববোধ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছেন। যা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাটাতন নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। আর নিঃসন্দেহে নারীরা এই আন্দোলন সংগ্রামের একটি বিরাট বড় অংশীদার। তাই **১৯৫২-১৯৭১** কালপর্বে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে শ্রেণি ও স্থান নির্বিশেষে সম্পৃক্ত সকল নারীর অবদানকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব নয়।

পরিশিষ্ট-১

১৯৪৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তার তালিকা:

ক্রম	আয়োজক	নাট্যকার/রচয়িতা	নাটক	সময়কাল
১.	ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ	বিধায়ক ভট্টাচার্য	বিশ বছর আগে	১৪ এপ্রিল ১৯৪৮
২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কালিন্দী	১-২ জুলাই ১৯৪৮
৩.	জগন্নাথ হল সংসদ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	দীপান্তর	১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষ
৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	A.G.Stock পরিচালিত	The Tragical History of Dr. Faustus	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯
৫.	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ	–	সিরাজের স্বপ্ন	১৯৪৯
৬.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	সৈয়দ মকসুদ আলী	ইউরেকা	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯
৭.	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ	ফররুখ আহমদ	রাজ-রাজড়া	১৬ জানুয়ারি ১৯৫১
৮.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	শেক্সপীয়ার	ওথেলো	১২ এপ্রিল ১৯৫০
৯.	সংস্কৃতি সংসদ	বিজন ভট্টাচার্য	জবানবন্দী	৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫১
১০.	সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ	আসকার ইবনে শাইখ	পদক্ষেপ	৮-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫২
১১.	ফজলুল হক হল ছাত্র ইউনিয়ন	বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৫২
১২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংসদ	নূরুল মোমেন	Is Law An Ass	১৯৫২
১৩.	সংস্কৃতি সংসদ	তুলসী লাহিড়ী	পথিক	২২-২৩ জানুয়ারি ১৯৫৩
১৪.	ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	একান্নবর্তী	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩
১৫.	ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিরকুমার সভা	২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩
১৬.	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্ধু	সেপ্টেম্বর ১৯৫৩
১৭.	চারুকলা সংসদ	কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস	স্মাগলার	জানুয়ারি ১৯৫৪
১৮.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ	বনফুল	কবয়ঃ	১৯৫৪
১৯.	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ	আসকার ইবনে শাইখ	মঞ্চে গ্রাম	২০ ডিসেম্বর ১৯৫৪
২০.	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্র সংসদ	আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫

২১.	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	দুই পুরুষ	৮-৯ অক্টোবর ১৯৫৪
২২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬
২৩.	ইকবাল হল ইউনিয়ন (ঢা.বি)	আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৫৬
২৪.	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ	আসকার ইবনে শাইখ	আগামী দিনের প্রতীক্ষা	আগস্ট ১৯৫৬
২৫.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	আনিস চৌধুরী	মানচিত্র	১৯৫৬
২৬.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	বনফুল	কবয়ঃ	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬
২৭.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	মুনীর চৌধুরী (অনুবাদ)	কেউ কিছু বলতে পারে না	২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬
২৮.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	প্রমথনাথ বিশী	পরিহাস বিজল্পিতম	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬
২৯.	ফজলুল হক মুসলিম হল	জলধর চট্টোপাধ্যায়	রীতিমত নাটক	১৯৫৬
৩০.	সলিমুল্লাহ হল নৈশ বিদ্যালয় ছাত্র দল	আব্দুল জব্বার খান	প্রতিজ্ঞা	সেপ্টেম্বর ১৯৫৬
৩১.	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (ছাত্র সংসদ)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	দীপান্তর	২ অক্টোবর ১৯৫৬
৩২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ	নূরুল মোমেন	আমরা সবাই ভাই ভাই	জানুয়ারী ১৯৫৭
৩৩.	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ	পরশুরাম	চিকিৎসা বিভ্রাট	১৯৫৭
৩৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল কর্মপরিষদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রক্তকরবী	নভেম্বর ১৯৫৭
৩৫.	ইকবাল হল ছাত্র ইউনিয়ন	আসকার ইবনে শাইখ	অগ্নিগিরি	নভেম্বর ১৯৫৭
৩৬.	সংস্কৃতি সংসদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন	১৯৫৮
৩৭.	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়ন	আসকার ইবনে শাইখ	শেষ অধ্যায়	১৯৫৮
৩৮.	ইকবাল হল ছাত্র হল ইউনিয়ন	আসকার ইবনে শাইখ	অনুবর্তন	১৯৫৮
৩৯.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ইউনিয়ন	বিধায়ক ভট্টাচার্য	তাইতো	১৯৫৯
৪১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ	মুনীর চৌধুরী (অনূদিত)	রূপার কৌটা	১৯৫৯
৪২.	কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	–	রূপান্তর	১৯৫৯
৪৩.	ফজলুল হক হল ইউনিয়ন	–	সয়লাব	১৯৬০
৪৪.	সলিমুল্লাহ হল ইউনিয়ন	–	কানাগলি	১৯৬২

৪৫.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	মুনীর চৌধুরী	দণ্ড ও দণ্ডধর	১৯৬৩
৪৬.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	–	মলুয়া	১৯৬৩
৪৭.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ	আলা উদ্দিন আল আজাদ	মায়াবী প্রহর	১৯৬৩
৪৮.	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ	আসকার ইবনে শাইখ	প্রচ্ছদ পট	১৯৬৪
৪৯.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী	১৯৬৪
৫০.	ফজলুল হক হল ইউনিয়ন	–	বিন্দু বিন্দু রং	১৯৬৫
৫১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল ইউনিয়ন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শোধবোধ মূল: কর্ম্মফল	১৯৬৫
৫২.	ছাত্র শিল্পী সংসদ	–	ব্লাক আউট	১৯৬৫
৫৩.	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ	–	কথা দাও	১৯৬৫
৫৪.	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ	কল্যাণ মিত্র	দায়ী কে	১৯৬৬
৫৫.	সংস্কৃতি সংসদ	কল্যাণ মিত্র	রাস্তার ছেলে	১৯৬৭
৫৬.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিভাগ কর্মচারীবৃন্দ	–	এবাড়ী ওবাড়ী	১৯৬৭
৫৭.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রবৃন্দ (২য় ও ৩য় বর্ষ)	আসকার ইবনে শাইখ	প্রচ্ছদ পট	১৯৬৭
৫৮.	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ	প্রসাদ বিশ্বাস	অবিচার	১৯৬৮
৫৯.	ইকবাল হল	কল্যাণ মিত্র	পাথরবাড়ী	১৯৬৯
৬০.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	আসকার ইবনে শাইখ	লালন ফকির	১৯৬৯
৬১.	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ	আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৭০
৬২.	সংস্কৃতি সংসদ	সমরেশ বসু	আবর্ত	১৯৭০
৬৩.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	নীলিমা ইব্রাহীম	দুয়ে দুয়ে চার	১৯৭০
৬৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	মাহবুবুর রহমান	যে পথের শেষ নাই	১৯৭১

(সূত্র: বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২১৪-১৬)

পরিশিষ্ট-২

চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বেগম সুফিয়া কামালের ভাষণ

সমবেত সুধীমুরুব্বিবৃন্দ ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভাই ভগ্নিগণ।

চট্টগ্রাম আমার ধ্যানের রাজ্য, আমার সব দেশ-। এর আগে চট্টগ্রামকে আমি যেনো চাক্ষুস দেখিনি সত্য, কিন্তু কল্পনাতে চট্টগ্রামের প্রতি ধূলিকণা আমি দেখেছি, অতুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার মনের দায় এঁকে দিয়েছে ছবির পর ছবি-অনুদিন সূত্রে অন্তরে অনুভব করেছি তার ছায়াঢাকা ও পাখীডাকা পথের হাতছানি, মর্ম্মে মর্ম্মে শুনেছি পর্ব্বত-দুহিতা কর্ণফুলীর কল কল ধ্বনি। চট্টগ্রামের মানুষকে আমি দেখেছি, আমাদের হৃদয়-ঔদার্য্য ও প্রাণের ঐশ্বর্য্যে আমি হয়েছি, বড় ভাল লেগেছে তাঁদের অনেককেই, ফলে অনেকের সঙ্গেই নানাভাবে উঠেছে আমার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধার কি। তাই বার আউলিয়ার পদ-রেণু মিশে পবিত্র এই ভূমি আমার কাছে শুধু মাটি দিয়ে তৈরী বা স্মৃতি দিয়ে ঘেরা নয়-দেশ আমার কাছে পবিত্র তীর্থভূমি! এতদিন নানা অনিবার্য্য কারণে তীর্থভূমি জেয়ারৎ করা আমার দ্বারা হয়ে ওঠেনি। তাই সেদিন যখন আপনাদের সমিতির সভাপতি গিয়ে বল্লেন, আপনাকে আমরা নিতে এসেছি-আমার মন বিচলিত হয়ে উঠল। 'নায়রের' নামে কোনো মেয়ের মন না চঞ্চল হয়ে ওঠে? নানা অসুখবিসুখ ও বিপদআপদে আমার পারিবারিক জীবন এখন বিপর্যস্ত- তখন মন চঞ্চল হয়ে উঠল 'নায়র' করার জন্যে, আমার ধ্যানের দেশের, আমার তীর্থ-ভূমির ধূলিকণা স্পর্শ লাভের জন্যে। আর আমি এসেছি পুণ্য সঞ্চয় করতে, বক্তৃতা দিতে নয়। কি বক্তৃতাই বা আমি দেব? আপনাদের মত সুখী ও জ্ঞানীদের কোনোাবার মত কী কথাই বা আমি জানি, কী যোগ্যতাই বা আমার আছে। মুসলমান শরীফ ঘরের মেয়ে, যখন শিখবার বয়স ছিল তখন ঘরের বা'র হওয়ার অনুমতি ছিল না- কোনোদিন কলেজে যাওয়া দূরে থাক, স্কুলে যাওয়ার সুযোগও তা জোটেনি। বর্ত্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন হচ্ছে ইংরেজি- সেই ইংরেজির সঙ্গে ঘটেনি আমার কেন পরিচয়। তাই আমার মত এক অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে সংস্কৃতি সম্মেলনে কোনো ভাষণ দেওয়ার চেষ্টা একটা দুশ্চেষ্টা নয় কি?

চাটগাঁয়ের আমি শুধু একমাত্র অতিথিই নয়, এখানের আত্মীয়াও আমি কিন্তু এখানে আসা এই প্রথম; তাই এ আরো বিস্ময়কর যে এই চাটগাঁ থেকে আমি আমার কবি জীবনের প্রথম অভিনন্দন পাই। শ্রদ্ধেয়...আলী আখন্দ সাহেবের কাছ থেকে তিনি সুদূর 'মগের মুল্লুক' থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন। আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ-পনর বছর আগে।... বন্ধুবর জনপ্রিয় সুলেখক আবুল ফজল সাহেব তার প্রীতিময় ব্যবহারে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলেন; এর পর মুসলমান বাঙলার যাদুকর লেখক শ্রদ্ধেয় মাহবুবউল আলম সাহেবের চিঠিপত্রে পরম স্নেহ লাভ করেছি। আমাদের সকলের মুরুব্বি শ্রদ্ধেয় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আমাকে মা বলে সম্বোধন করে আমাকে গৌরবান্বিতা করেছেন। এ কি কম সৌভাগ্য আমার উপস্থিত এখানে যারা সাহিত্যিক সুধীবৃন্দ আছেন, অনেকের কাছ থেকেই আমার জীবনের প্রীতিময় ব্যবহার পেয়ে আজ তাদের মাঝে এসে বসবার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছি। নয়ত আমার নিজস্ব যোগ্যতা কিছু নেই। এই চাটগাঁয়ের নদী ও যমুনা তীরে অরণ্যে ও পর্ব্বতে বাঙলার বুলবুল বিদ্রোহী কবি অগ্রজোপম শ্রদ্ধেয় নজরুল ইসলাম গান গেয়ে কথার মালা গেঁথে গেছেন। বহু সাহিত্যিকের সাহিত্য আলোচনায় এর আকাশবাতাস মুখরিত হয়েছে- এখানে আমার মতো ক্ষুদ্রার বলবার কি থাকতে পারে। তা ছাড়া আমি কবি-গানের পাখির মতো, ফুলের বিকাশের মতো আমার কবিতা আমার অন্তরের স্বতঃউৎসারিত বেদনা, আনন্দের প্রকাশ মাত্র। এখানে এক বিরাট জনগণ-সমবেত সভায় কিছু গুছিয়ে বলবার বিদ্যা আমার নেই। পত্র-পুষ্প-ফল-শূন্য শাখার উচ্চতা অনেক কিন্তু পত্র-পুষ্প-ফল ভারাবনত শাখা নতনমিত আপনাদেরই দেওয়া সম্মান, স্নেহপ্রীতির গৌরবভারে আজ সেই পূর্ণ শাখার মতোই আপনাদের কাছে আমার চিত্ত অবনমিত হয়ে আছে। বেশী কথা বলে সেই গৌরব সৌভাগ্যের ভার কমাতে আমি পারছি না।

বলেছি, আমি উচ্চ শিক্ষিতা নই, তাই আমার রচনায় বুদ্ধির চাকচিক্য ও পাণ্ডিত্যের দুরূহতা না দেখে আমার উচ্চশিক্ষিত পাঠকরা হয়তো হতাশও হয়েছেন। তবুও আমি আমার সীমানা ছাড়িয়ে যাইনি- অনধিকার চর্চা করিনি কোনোদিন। আমার বিশ্বাস, কৃত্রিমতার আয়ু; যাকে রবীন্দ্রনাথ 'ফ্যাশন' বলে ঠাট্টা করেছেন, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী-অন্ততঃ দীর্ঘস্থায়ী নয়, বাইরের রঙ করা সৌন্দর্য্যের কতটুকুই বা মূল্য আসল সৌন্দর্য্য তো নির্ভর করে স্বাস্থ্যের লাবণ্যের উপর। সাহিত্য ও শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। ভাষা ও ভাবের চাকচিক্য, বিদেশী সাহিত্যের ধার করা জৌলুস-যার সঙ্গে লেখকের অন্তরের পরিচয় ও পরিণয় ঘটেনি-বৃন্ত ছেঁড়া বাসি ফুলের মত তা ম্লান হয়ে যেতে কিছুমাত্র দেরী লাগে না। গত বিশ বছরের মধ্যে এমন বহু চকচকে ও ধারাল অথচ জাতীয় চিত্তের সঙ্গে যোগসূত্রহীন কৃত্রিম লেখাই পাঠকের স্মৃতি থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে। তাই আমাদের তরুণ সাহিত্যব্রতীদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি যা কিছু চকচকে তাই সোনা নয়। সোনা বলে ভুল করলে একদিন মনস্তাপের অন্ত থাকবে না। আজ বিশ্বসাহিত্য তথা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের কেউ আমাদের চিত্তেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, এই সবই ভাল কথা। বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা গোঁড়ামী দূর হবে, ফলে আমাদের সাহিত্যও হবে সুদূরপ্রসারী ও বহু বিস্তৃত। কিন্তু মানুষ ত 'ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে কূলে নেই'- একটা দেশের মাটিতে তার জন্ম হয়েছে, একটা পরিবেশের মধ্যে সে লালিত হয়েছে, তার দেহ ও মন খোরাক সংগ্রহ করেছে এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থান থেকে। কাজেই সেখানকার ভাষা, সেখানকার সাহিত্য, সেখানকার ঐতিহ্য, তার মনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে; তাই সেই সবকে বাদ দিয়ে তার মনের কখনো বিকাশ হতে পারে না, মনের ভাবের কোনো ফুল ফুটাতে পারে না। এ কে না জানে, মনের বিকাশ ও প্রকাশেই হচ্ছে সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি। তাই আগে দেশের ভাষ্যকে, দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে জানতে হবে, এক কথায় যে খোরাক গ্রহণ করে মন ও অন্তর বেড়ে উঠে তারি আবিস্কার করতে হবে সর্বাগ্রে। নিজের অন্তরকে যদি আবিষ্কার করতে পারেন, তবে আন্তর্জাতিক হতে আনার এতটুকু বেগ পেতে হবে না। নিজেকে না জেনে, নিজের মনকে না জেনে হঠাৎ আন্তর্জাতিক হতে যাওয়া, লম্ফ দিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘনেরই মত হাস্যস্পদ কাণ্ড নয় কি? মানুষ বিচিত্র কিন্তু তার মন এক-এদেশে বিদেশে, কণ্টিণেন্টে সর্বত্রই মানুষের চিরন্তন মনই সৃষ্টি করেছে সাহিত্য ও শিল্প। ঘরকে আগে জানুন, তারপর বাহির আপনার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। নিজের দেশের দিকে তাকান, দেশের প্রকৃতির দিকে তাকান। দেশের প্রকৃতির দিকে, দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেশবাসীর সুখ দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হউন, তাদের ভালবাসুন-তবেই তাদের হাসি-অশ্রুময় জীবন আপনার লেখনী-মুখে ধরা দেবে। সৃষ্টির জন্যে ভালবাসার চেয়ে যাদুমন্ত্র আর নেই! ঘৃণা করে, বিদ্বেষ করে, হিংসা পোষণ করে-তা দিয়ে সাহিত্য বা শিল্প কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। ভালবাসার সহস্র স্রোত বেয়ে সাহিত্য ও শিল্পের সহস্র পথ আপনার চোখের সামনে খুলে যাবে। তাই, ফের বলছি-ভালবাসুন, দেশকে ভালবাসুন, দেশের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালবাসুন। আজকের দিনে, আমার মতে সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক এক কথায় বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবাদীদের এই ভালবাসার মন্ত্র ছাড়া কোনো মন্ত্র নেই, এই ভালবাসার আদর্শ ছাড়া আর কোনো আদর্শ নেই, এই ভালাবাসার শপথ ছাড়া কোনো আদর্শ নেই। দেশের মানুষকে যে ভালবাসতে পারে, একমাত্র সেই বিদেশের মানুষকেও ভালবাসাতে পারে- বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্বে মানুষের ভ্রাতৃত্ব একমাত্র তার মুখেই শোভা পায়। নদী যদি একবার তার গতি পথের সন্ধান পায়, তবে তার সাগরে গিয়ে পড়তে বেশী আর দেরী লাগে না। জীবনকে যে ভালবাসতে পারে, মানুষকে যে ভালবাসে, একমাত্র সেই ফুল ফুটাতে পারে, যে ফুলের পারিভাষিক নাম হচ্ছে, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও বহুবিদ সংস্কৃতি। এই ফুল ফুটাবার সাধনা আপনারা গ্রহণ করুন।

বহু বৎসর আগে আমার 'সাঁঝের মায়া' নামক কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলাম:

সাঙ্গ হলে সব কর্ম্ম কোলাহল

হবে অবসান

দীপ-নাহি জ্বালা গৃহে এমনি সন্ধ্যায় যেন

তোমার আহ্বান

গোধূলি-লিপিতে আসে।

নিঃশব্দ নীরব গানে গানে,

পরবীর সুরে সুরে, অনুভবি

তারে প্রাণে প্রাণে

মুক্তি লভে বন্দী আত্মা-

সুন্দরের স্বপ্নে আয়োজনে

নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক

পুষ্প-বিকাশের প্রয়োজনে।

এই পুষ্প বিকাশের সাধনা কঠিনের সাধনা। কিন্তু মানুষের ভাগ্য-লিপিতো আল্লাহ কুসুমাস্তীর্ণ করে রচনা করেননি। জীবনের দুর্গম পথেই মানুষের জয়যাত্রা। তাই কঠিনের কক্ষটি দেখে আমাদের ভয় পেলে তো চলবে না। হুল সকলে ফুটাতে পারে, কিন্তু ফুল ফুটাতে পারে না। আপনারা এই সম্মেলনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ফুল ফোটাবার আয়োজন করেছেন। আপনাদের আয়োজন সার্থক হোক, সফল হোক।

সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হলেও, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলার সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়েছেন। এই জন্য সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্মেলনের কাজে আমি আর বাধা হয়ে থাকতে চাই না।

এইবার সম্মেলনের কার্যসূচী যথারীতি আরম্ভ হউক।

(সূত্রঃ *সাপ্তাহিক বেগম*, ৪র্থ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১ এপ্রিল ১৯৫১)

পরিশিষ্ট-৩

কাব্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

সুফিয়া কামাল

বাদ তসলীম! শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, অগ্রজ, অনুজ, মায়েরা, বোনেরা! আপনাদের সাদর আহ্বান পাঠিয়েছেন আমাকে, সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আমি পারিনি। যদি সে আহ্বানে আমি সাড়া না দিতাম, সে হত আমার ধৃষ্টতা, মূঢ়তা। মানুষ মানুষকে ডাক দেয় সাথী হবার জন্যে, সমবেত হবার জন্য- প্রীতি মধুর স্নেহ মমতার এই সুষ্ঠু মধুর প্রকাশেই জনে জনে আসে দলে দলে, গড়ে ওঠে সমবেত সম্মিলন। মিলিত মনের অকুণ্ঠ সংলাপে দূরের জন নিকট হয়, পর হয় বন্ধু, বেড়ে যায় মানুষের মনের আত্মীয়তা; তখন উৎসবে, আনন্দে, দুঃখে, সুখের সময় ডাক পড়ে তাঁর।

আমাকে আপনারা ডেকে এনেছেন আরও বৃহত্তর মহত্তর উন্মুক্ত মিলন ক্ষেত্রে এই সমবেত জনগণ সভায় আমাকে দিয়েছেন বিশিষ্ট ও মর্যাদাময় আসন। এই সংস্কৃতি সম্মিলনীর কাব্য শাখার ভার আমাকে দিয়েছেন আমার অযোগ্যতার বিচার না করেই। আমি সামান্য! কিন্তু আপনাদের দান অসামান্য। আপনারা হয়ত জানেন না, আমার শিক্ষা, আমার বিদ্যা কত সামান্য, কত অকিঞ্চিৎকর। শৈশব জীবনে হেরেম লালিতা, পরদার অন্তরালে বর্দ্ধিতা শরীফ খান্দানী মুসলিম ঘরের মেয়ে আমি, শিক্ষা বলতে যে কী বিরাট কী বিপুল কত গভীর অসীম বিস্তার সাগর, তার রূপ আমি চোখে দেখিনি, কাজেই আমার কাছে মূল্যবান চিন্তাশীল কাব্য ব্যাখ্যা যদি আশা করেন, যে আপনাদের ভুল হবে। আমার সে অক্ষমতার অপরাধ আপনারা মার্জ্জনা করবেন। আমি এসেছি আপনাদের মধ্যে, আপনাদের সঙ্গ লাভ করব, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব, লাভ করব জ্ঞানের আলো, আনন্দের সওগাত, উৎসবের স্মৃতি। আমাকে দিয়েছেন যে গুরুভার আপনাদের স্নেহ দৃষ্টি তলে, সে ভার বইবার চেষ্টা আমি করব এই ভেবে, যত ভুল যত ত্রুটী আমার হোক না কেন, আপনারাই তো রয়েছেন। লজ্জা আমি করব না, কুণ্ঠা আমার কেটে গেছে; কেন না আমার যা পরিচয়- যার জন্য আপনারা আমাকে সম্মান ও স্নেহের আসন দিয়েছেন, আমার সেই লেখা কবিতা-সাজানো বাগানের ফুল নয়, গুণে গুণে কোনোটীর পর কোনোটীর কথা আমি মালীর হাতের তৈরি ফুলের তোড়ার মতো সাজাইনি, ও বিদ্যা আমার নেই। আমি বন্য, আমি অরণ্য, নামহীন। অ-জানা কত ফুলের বিকাশ অরণ্যের তরু শাখায়, আপনার মনে সে ফোটে, সে ঝরে, নানা রংয়ের নানা গন্ধের সমারোহে সে ঘন, প্রচুর! সে চায়নি কখন, জানেও না কখনও কেউ এ ফুলের সমারোহের সংবাদ পাবে। নিজের প্রাণ প্রাচুর্য্যে তারা ফোটে আপন মনে। আমারও নিজের মনের তাগিদে আমার কবিতা লেখা। কদর করলেন আপনারা, সে গুণ আমার নয়, সে রসবোধ আপনাদের, সেই আপনাদের রসবোধ আমাকে এনেছে প্রকাশ্যে উন্মুক্ত আকাশ তলের জন সমাগমের মাঝে। যদি আমাকে এনে আপনারা খুশি হয়ে থাকেন, আমার সমস্ত অক্ষমতা, সমস্ত অযোগ্যতা ছাপিয়ে উঠবে সেই আনন্দ, গৌরবময় আনন্দ। আমি তুচ্ছ ক্ষুদ্র! আপনারা তা নন! আপনাদের দেওয়া গৌরব, মান এও তুচ্ছ নয়। তাই আমি নত শিরে প্রণত অন্তরে আপনাদের দান গ্রহণ করে ধন্য হয়ে এসে দাঁড়ালাম আপনাদের মধ্যে।

কুমিল্লা ইতিহাস উপেক্ষিত নগরী নয়। এর ঐতিহাসিক মানও আছে, আর আপনাদের এই সম্মিলনীও এ-কে আবার নতুন করে দেশ বিদেশের সুধীজন সভায় সুষ্ঠু পরিচয় দেবে। এই বাংলাদেশে এ কুমিল্লাও আমার পক্ষে বিদেশ ছিল। কেননা সংসার গণ্ডির বাইরে পা বাড়ানো আমার মতো একটি অখ্যাতার আর হয়ে ওঠে না। নদী মাতৃক এই বাংলা দেশ আমার দেশ, এর বহু স্থান আমি দেখবার সুযোগ পাইনি। এবারের ভরা বর্ষার পরিপূর্ণ পল্লীরূপ আমি দেখতে পেলাম, কত ভাগ্য আমার। আমার শৈশবের জন্মভূমির এই রূপ বহুকাল পরে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে আমাকে দেখালেন;

এর জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে সত্যই ইচ্ছা করে। হয়ত আপনারা জানেন না, কুমিল্লা তথা ত্রিপুরা আমার পিতৃভূমি। এখানে এসে আমার মন আনন্দে ও বেদনায় ভরে উঠেছে, দুলে উঠেছে আমার মন অ-দেখা পিতা ও পিতৃভূমির জন্য।

আমি এলাম কুমিল্লায়, এরই আগে ভেঙ্গেছে গোমতীর বাঁধ, ভেসে গেছে ঘর বাড়ি, মানুষের হয়েছে দুরন্ত দুর্দ্দিন। প্রাণ কেঁদে উঠছে অসহায় আর্ত্তদের জন্য, কিন্তু তারও চেয়ে অসহায় আমি। আমার সাধ্য নাই, শক্তি নাই কোনো বিপন্নকে সাহায্য করতে। আমরা দরিদ্র দেশের বাসিন্দা নই, কিন্তু দরিদ্র হয়ে আছি অবস্থা বৈগুণ্যে। হাত পা চোখ কান থাকতে আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আল্লাহকে ডাকি মদদ করতে। সেই ডাক কি আল্লাহ শুনেন? শুনেন না বলেইত আসে দুর্দ্দিন, গরদেশ। বাংলার চাষীদের মতো খাটে না অন্য দেশের চাষী; তবু তাদের দুঃখ ঘোচে না। বছরে ছয় মাস হয়ত খায় টেনেটুনে, কিন্তু বাকি ছ' মাস খাবার ভাত, পরবার কাপড় তারা আর জোটাতে পারে না। রোগের অষুধ পথ্য তো দূরের কথা কেন এই অবস্থা! তারা ধানের পাটের ফলন কম করে তো ফলায় না। রবি শস্যও কম হয় না। তবুও এ দুর্দশা তাদের ঘোচে না, ঘুচবেও না, যতদিন না তারা পরের মুখ চেয়ে কাটাবার কারণ দূর না করতে পারে। পাটের মণ পাঁচ টাকার বেশি বেচতে পারছে না, অথচ খরচা ও মেহনত তাদের ক-টাকার হয়েছে সে হিসেব তারা নিজেরাই জানে না, এর কারণ বার বার নতুন করে বলা হচ্ছে-অশিক্ষা। শিক্ষার দৈন্যের সাথে সাথে মানুষের আত্মারও দৈন্য শুরু হয়ে যায়। এই চাষীরা আগে গোলা ভরত ধানে, ঘরে থাকত চাউল, মাঠে খাটত মনের আনন্দে। আমার দেশের চাষীরা, মাঝিরা 'জারি' গানে 'সারি' গানে গাঙ্গের পানি মাঠের আকাশ ভরে দিত। শিশু বেলায় প্রাসাদ কক্ষে শুয়ে বসে সে গানের সুর আমার কানে আসত, প্রাণে লাগত। তাই বুঝি হয়েছিলাম আমি কবি। কিন্তু আজ! আজ আমরা কোনো পর্যায় নেমে এসেছি। আমাদের মাঠের সোনারঙা ফসল, গাছের পাকা ফল, নদীর মাছ, ঘরের চাউল কোথায় গেল!

বড়লোকের ডিনার টেবিল, মোটরের পেট্রল, ইলেকট্রিক আলো, পাখা, ক্লাবের মজলিস তো এখনও পুরোদমে চলছে। আমরা স্বাধীন হয়েও আপন হাত পা গুটিয়ে বসে দুবেলার খাবার ভাবনা ভাবি। আর দুবেলা কোনো রকমে খাই। পাকিস্তান আজাদ দেশ। পূর্ব্ববঙ্গ সমৃদ্ধিশালী শস্যশালিনী, এর সম্পদ অফুরন্ত, এর থেকে নিয়ে অন্যজনেরা ফেঁপে ফুলে উঠল কতবার কিন্তু এখনও আমাদের এ দৈন্য ঘুচল না কেন? পাকিস্তান কি ছেলের হাতের মোয়া, না কল্পতরু? এক কামড়ে খাওয়ারও নয়। নাড়া দিয়ে যা দরকার তাও পাওয়ার নয়। এ কে গড়তে হবে আমাদের। আমাদের দেশ অন্যদের হাতে ছিল, বহু প্রাণের বদলায় আবার আমরা ফিরে পেয়েছি। একে আমাদের মতো করে গড়ে নোবো আমরাই। আমাদের খাওয়া পরা, শিক্ষা, দীক্ষা, ভাষা, আশা সব আমাদের মনের মতন করে আমরা ফুলিয়ে তুলব, ভরিয়ে তুলব। বহুকাল পরে আবার শ্যামল বাংলার শ্রীতে সরস হয়ে উঠবে বাংলার ছেলে মেয়েদের শরীর, স্বাস্থ্য, মন ও জীবন। সরকার ও সমাজের মিলিত যত্নে দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লিতে পল্লিতে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী, অবস্থা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে যৌথভূমি, শিক্ষালয়, স্বাস্থ্য চর্চার স্থান, স্বাস্থ্য রক্ষার আবাস। মেয়েরা পুরুষেরা মিলে এগিয়ে আসতে হবে; মিলিত শক্তিকে সাহায্য করে আল্লাহ। অলসকে তিনি ক্ষমা করেন না। বাংলার চাষী, বাংলার শিক্ষক, বাংলার মেয়েরা এখন চরম দুর্দ্দশার মধ্যে কালযাপন করছে। প্রত্যেক গ্রামের সমাজপতিরা এ বিষয়ে এখনও অবহিত না হলে পাকিস্তান পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়বে বাধ্য হয়ে, অন্য দেশের উন্নতির প্রগতির সাথে।

দেশ ও সমাজ উন্নত না হলে সৃষ্টি হয় না কেনো উন্নততর সাহিত্য ও কাব্যের। অভাব ও অভিযোগ, অশ্রু ও আর্ত্তস্বরে ব্যাহত হয় মানুষের মনের গতি, সূক্ষ্ম অনুভূতি। বাধা পায় তার সাহিত্য ও কাব্যচর্চ্চা। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে রুক্ষ হয় মাটি, অরণ্য, পচন ধরে মাটির ফসলে অরণ্যের ফুলে;

দেশ ও সমাজের উন্নত ও অবনত গতিতেও বিপর্যয় ঘটে ঘরে ও বাইরে, সংসারে ও সমাজে। আত্মার দীপ্তি হয়ে আসে মেঘান। আজ কাব্যশাখার ফুল ফোটাতে এসে ব্যথার হুল ফুটিয়ে আমার মনকে রক্তাক্ত করে এনেছে এই সামাজিক বিপর্যয়। আমরা যে সুস্থ নই, স্বাভাবিক সহজ সরল নই, সেটারই অভিব্যক্তি এই কথা, সকলেরই মনে বর্ত্তমান কালের এই মেঘান ছায়া পড়েছে; জাগ্রত সরল দরদী মনকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই, আপনিই সে উদ্বেল হয়ে ওঠে সুখে দুঃখে আনন্দে ও বেদনায়।

অনেক কথা বল্লাম, জানি না এত সব কথা বলবার অধিকার আমার আছে কিনা। আমি তো বিদুষী নই, রাজনীতিজ্ঞাও নই, তবুও একট উৎসব মুখর দিনে দুঃস্থ দেশাত্মীয়দের ম্লান মুখ মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় নিজেদের সমাজের অভাব। বিশেষ করে আমার নিজের কথাই, যদি আমি লেখাপড়া জানতাম, কোনো কাজে লাগতাম দেশের ও দশের। বছর দুই আগে চাঁটগায়ের সাহিত্য সম্মেলনে আহুতা হয়ে গিয়েও আমি বলেছিলাম আমি উচ্চ শিক্ষিতা নই, তাই আমার রচনায় পাণ্ডিত্যের দুরূহতা ও বুদ্ধির চাকচিক্য না দেখে উপস্থিত উচ্চ শিক্ষিত অভ্যাগতেরা হয়ত হতাশ হবেন। আগেও বলেছি এখনও বলছি, আমি যে এখানে এসে দাঁড়ালাম সে আমার যোগ্যতার জন্য নয় বরং অযোগ্যতার জন্যই স্নেহের অভিষিক্ত আমার স্বজনদের দৃষ্টিতলে স্নেহধন্য হয়ে। তাই ইংরেজি আমি জানি না বলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, বোরকাটী খুলে রেখে তুমি আমার সাথে একবার চলো য়ুরোপ ঘুরে আসবে, আর হাতে কলমে ইংরেজি তোমার শিখে নিতে হবে না, বিদেশী সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডার তোমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, দেখবে তোমার লেখা কী সম্পদে ভরে ওঠে। কিন্তু তার সস্নেহ সাদর আহ্বানে সে দিন বোরখা ফেলে তার সাথে য়ুরোপ ঘুরে আসতে পারিনি, ইংরেজিও শেখা আমার আর হলো না, তার জন্য আমার দুঃখ বা লজ্জাও নেই; কেননা আমার ভাষাকেই আমি এত ভালবাসি যে, এরই মধ্যে কোনো কিছুর অভাব আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার ভাষাই কি কম সাহিত্য কাব্য রচনা করল। কত যুগ আগে বিদেশের উচ্ছেদকারকদের হাত থেকে আমাদের দেশের সাহিত্য কাব্য কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে আজও বেঁচে আছে জাগিয়ে রেখে বাংলার ঐতিহ্যকে। আমার ভাষা! অমর ভাষা! কতজনকে অমর করে রেখেছে এই ভাষা! আলাওয়াল, দৌলত কাজী থেকে শুরু করে রাবীন্দ্রিক যুগ ও যুদ্ধোত্তর নজরুল থেকে যত কবি বাংলা ভাষার চর্চা আজ পর্যন্ত করে চলেছে তারা কি কম সম্পদ দিল বাংলা সাহিত্যে? কাব্যে? গানে? সংস্কৃতিতে? বর্ত্তমান যুগ বস্তুতান্ত্রিক যুগ। শক্তিশালী লেখকের কলমে কাব্য তাতে ও ব্যাহত হতে হতেও বেঁচে গিয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কাব্যের ভেতর দিয়ে, যুগে যুগে কবিরাই তো দিয়েছে প্রেরণা। উৎস মূল রয়েছে কবির অন্তরে। তাকে ব্যাপ্ত করেছে প্রবহমান প্রাণচাঞ্চল্য। আধুনিক যুগের অতি আধুনিক কবিতা কোনো স্থায়ী কাব্যে হিসাবে স্থান পাবে কিনা জানি না। যে সব লেখকরা এখন হাতে কলম ধরে আছেন তাদের মধ্যে এমন শক্তিশালী লেখক আছেন, যে তাদের লেখা পড়লে মনে হয়, আহা! এমন সুন্দর মেয়েটার অমন কুৎসিত লোকের সাথে বিয়ে হল! এদের লেখাও অতি প্রাণবান ও ভাষা নব নব বাক্যে রচনায় সমৃদ্ধ, বিদেশী অনুবাদ সাহিত্যের ছবি দেশী ছাঁচে ঢেলে বড়ই বীভৎস আকারে আঁকা হয়। এটা দুঃখের কথা। তবে আশা করে থাকব বাংলার শ্যামল রূপ তার ধাঁধানো চোখে এনে দেবে আবার শ্যামশ্রীর স্নিগ্ধতা।

কাব্যের প্রাণ হচ্ছে মানুষের আত্মার বাণীর অকপট প্রকাশ। সে সুখের হোক দুঃখের হোক অভাব অভিযোগের হোক। তার যা কর্কশ, কাঠিন্য, অমার্জ্জিত তাকে সুন্দর মনোরম কোমলভাবে প্রাণের দুয়ারে নিবেদন করে যেন ফুলের আঘাতে ব্যথা দেওয়া। নিজে ব্যথা পায় না কিন্তু ফুলের ব্যথা পাওয়া ভেবে সচেতন হয়ে ওঠে মন, একটী সুন্দর কবিতা ফুলের নম্রতা নিয়ে মনকে স্নিগ্ধ করে, একটী ব্যঙ্গ কবিতা হাসি ফুটায়। একটী গাঁথা মনকে নাড়া দেয়- একটা গান মানুষকে তৃপ্তি দেয়, সাহিত্যের সৃষ্টি হল মানুষের মনের সাথীহীনতা থেকে। একার জন্য যা চাওয়া হল, একে একে তারই ভাগ দিতে ডাক দিল বহুজনকে। মিলিত মানব মনকে আনন্দ দিয়ে কাছে আনে যেই সংলাপ, সেই

সাহিত্য। যুগে যুগে মানব মনের আবর্ত্তন বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন হয়েছে, সাথে সাথে পরিবর্ত্তন রূপায়ণ হয়েছে ভাষার ও সাহিত্যের। বহুযুগ আগে সোনাভানের পুঁথি ও আমীর হামজা বা হাতেম তাইর পুঁথি পড়ে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে আনন্দ রস, বিরহ রস, বীররসের স্বাদ পেতেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল শরৎচন্দ্র পড়ে আমারও তেমনি আনন্দ রস, আস্বাদ করেছি। সে সৃষ্টি আর এ সৃষ্টি এক নয়, তবুও সেও সাহিত্য এও সাহিত্য, এতে ভুল নেই, পার্থক্য রুচির, কালের বিবর্ত্তনের।

বেশী আমি বলতে পারি না। বোঝাতে পারি না আমি ভালো করে, কারণ বিদ্যা আমার নেই। আমি যে কাব্য ভালবাসি কবিতা লিখি সেটা আমার ধর্ম্ম! সে আমার আনন্দ। সে আনন্দের ব্যাখ্যা আমি করতে পারি না, ও অভ্যাসও আমার হবে না কোনো দিন। আমি আমার ঘর, আমার স্বজন, আমার শিশু সন্তান ও আমার ভাষা আমার কবিতাতে আমার মনের আগ্রহ দিয়ে সচেতন হয়ে রক্ষা করি একান্ত আমরাই বলে, দশের কাছে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। জন সাহিত্য কেমন চলছে তা আমার চেয়ে উপস্থিত জ্ঞানী সুধী জনের কাছে সুন্দর বর্ণনা পাবেন। দিনে দিনে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এতে সন্দেহ নেই। আমার শক্তি সামান্য, আমি যা স্বপ্ন দেখেছিলাম তাকে রূপ দিতে আমার সাধ্যে কুলায় নাই। আমার আগে যারা গান গেয়েছেন, দান করেছেন কাব্য সম্পদ, তাদের কাছ থেকে পেয়েছি প্রচুর, তবুও মন ভরেনি, আরও অনেক আশা করেছি আমার সমযুগের স্রষ্টাদের কাছে, আর চেয়ে আছি আমার পরবর্ত্তী নতুন সূর্যোদয়ের পথ পানে, আশা করে আছি, কল্পনায় দেখছি, আমার যা স্বপ্ন তা সত্য হবে এই নতুন দিনের আলোকে। সৃষ্টি হবে সেই সুন্দরের সৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া, যা শুধু আমি দেখলাম স্বপ্নে– এরা আনবে তা ছবিতে, রূপে রসে ফুটিয়ে তুলবে সেই ছন্দ, যা অন্তরের তন্ত্রীতে বেজে পথ পায়নি প্রকাশের চির যুগের ভাঙ্গা গড়া নব চেতনার নতুন আশার তাজা প্রাণের গান– মানবতার জয়ধ্বনি ভরা-অবসান করা কুৎসিত কৃত্রিমতাকে। বুকের রক্তে সেই সুর বাজুক যা জরা অবসাদকে তাড়িয়ে দিয়ে এনে দেবে সরল ঋজু মনের স্ফূরণ। এঁকে দেবে চোখের তারায় তারায় সুন্দরের সৃষ্টির মায়াকাজল, মানুষ মানুষকে করবে না অবিশ্বাস, থাকবে না বেঈমানী বিশ্বাসে, নির্ভরে ঐকান্তিকতায় একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে নব জীবনের সৃজন করবে। আমাদের লেখনীতে লিখবে সেই সে লেখা, রবি-কারোজ্জল প্রথম প্রভাত আকাশে যে ছোঁওয়া দ্যেয়, মানুষের মনে লাগুক সেই রঙিন ছোঁয়ার ছোঁয়াচ। আমি করেছি কল্পনা, দেখেছি স্বপ্ন- সেই স্বপ্ন সার্থক হয়ে সফল হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা আমার অন্তর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আমি বলছি-

আমার এ লেখা নয়, রেখাচিত্র অনন্ত যুগের-
কাল জয়ী এর পরে দৃষ্টি রহে সত্য সুন্দরের-
সে আঁখির আলো অনির্ব্বাণ
রহিবে সে অবিনাশী, দিতে সত্য পথের সন্ধান।
পশ্চাতে আসিছে যাঁরা অনাগত চারণের দল,
তাহাদের পথ হোক হোক আনন্দে উজল।
আমার আনন্দ আশাভরা অন্তরের অভিবাদন সকলে গ্রহণ করুন।

(সূত্র: মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৯৮-২০২)

পরিশিষ্ট-৪(ক)

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর
উদ্যোগে

পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন

স্থান ঃ—কাগমারী—সন্তোষ

৮ই হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী

মূল সভাপতি ঃ— ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন

কর্ম্ম সূচী

প্রবন্ধ পাঠ ঃ— আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মনীষিবৃন্দের
বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ— কবিগান, জারিগান, ভাটিয়ালী, মারফতী, মুর্শেদী, বিচ্ছেদ,
ধুয়া, গণ সংগীত, পল্লীগীতি, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।

অংশ গ্রহণ করিবেন ঃ—

রমেশ শীল, তসের আলী, মোছলেম, রামসিং, মজিদ মিয়া,
সুখেন্দু চক্রবর্তী ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলার
এবং
পশ্চিম পাকিস্তানের লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭, শুক্রবার

বিকাল ঃ—

৩-০০…: কোরান তেলওয়াত
৩-০৫……অভ্যর্থনা—মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
৩-১৫…. মূল সভাপতির ভাষণ—
ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন
৩-৫৫……সমাপ্তি সংগীত

সন্ধ্যা ঃ—
৬-৩০ হইতে……

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
(বিস্তারিত বিবরণ যথা সময়ে
ঘোষণা করা হইবে।)

কাগমারী সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি

কাগমারী সম্মেলন ● ৮৭

(সূত্র: সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৮, পৃ. ৮৭)

পরিশিষ্ট-৪(খ)

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭, শনিবার

সকালের অধিবেশন ঃ—প্রবন্ধ পাঠ

১০-০০টা হইতে ১-০০টা পর্যন্ত

১। ডাঃ মুহম্মদ শহীদউল্লাহ—"পাকিস্তানের ভাষা।"
২। ডাঃ মাহ্‌মুদ হোসেন—"The concept of Islamic Culture."
৩। ডাঃ এনামুল হক্—"বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব।"
৪। ডাঃ এ, বি, হালিম—(To be annouced)
৫। মওলানা আবদুল কাদের—"Postu Literature."
৬। ডাঃ চার্লস জে, এডামস্—"On Iqbal"
৭। বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লা—"The role of women in the modern Society."
৮। ডাঃ হাসান হাবাসী—"on Ibn Hajar Al Asqalani."
৯। ডাঃ এফ, এইচ, কওসন—"on the cultural life of Great Britain."

বিকালের অধিবেশন ঃ—

৩-০০ টা হইতে ৫-০০ টা পর্যন্ত

১। জনাব আবদুল হাকিম—"পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা।"
২। জনাব ওসমান গণি—"পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম।"
৩। জনাব আখ্‌লাকুর রহমান—"Thoughts on the Financial aspect of the Development of Agriculture in Pakistan."
৪। ডাঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা—"পূর্ব পাকিস্তানের রাসায়নিক শিল্পের ভবিষ্যত উন্নতি।
৫। ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব—"পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব।"

সন্ধ্যা ঃ—

৬-৩০ মিঃ হইতে—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— বিস্তারিত বিবরণ যথা সময়ে ঘোষণা করা হইবে।)

কাগমারী সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি

৮৮ ● কাগমারী সম্মেলন

(সূত্রঃ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, ঢাকাঃ প্রথমা, ২০১৮, পৃ. ৮৮)

পরিশিষ্ট-৪(গ)

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭, রবিবার

সকালের অধিবেশন ঃ—প্রবন্ধ পাঠ

১। প্রফেসার হুমায়ুন কবীর—(to be announced)

২। জনাব শওকত ওসমান—আধুনিক বাংলা সাহিত্য

৩। জাপানের সাংস্কৃতিক জীবন— (to be announced)

৪। মাদাম আজুরী—'on the Art of Dance"

৫। ডাঃ এস, হেদায়েতউল্লাহ—"উন্নত ধরণের কৃষির জন্য সরকারী ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবহার।"

৬। ডাঃ মুহম্মদ ওস্‌মান গণি—"বিকল্প খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা ও পন্থা।"

৭। জনাব আবদুর রাজ্জাক—(to be announced)

৮। ডাঃ নুরুল হুদা—"পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি ব্যবস্থা।"

৯। ডাঃ নুরুল ইসলাম—"পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন।"

১০। জনাব বি, এম, আব্বাস—"পূর্ব পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রন।"

১১। ডাঃ শামসুদ্দীন আহমদ—"on Heart Disease."

১২। ডাঃ এম, এন, নন্দী—পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে মেডিকেল এসোসিয়েসনের ভূমিকা "

১৩। মিসেস কুলসুম হুদা—"পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।"

বৈকাল ঃ—দৃশ্য পরিদর্শন

***সন্ধ্যা* ঃ—৬—৩০ মিঃ হইতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান** (বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে ঘোষণা করা হইবে)

পাইওনিয়ার প্রেস—ঢাকা।

কাগমারী সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি

(সূত্র: সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ৮৯)

পরিশিষ্ট-৫

চট্টগ্রাম কৃষ্টিকেন্দ্রে উদ্বোধনী ভাষণ

সুফিয়া কামাল

চট্টগ্রাম কৃষ্টি কেন্দ্রের উদ্যোক্তাগণের সাদর আহ্বানে এবার নিয়ে দু'বার চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেবার সৌভাগ্য হলো আমার। দু'বারেই শ্রদ্ধেয় সুধীজন আমার মত অজ্ঞজনকে মর্যাদার আসন দান করলেন। আমি অযোগ্যা, তাঁদের এই দানকে সসম্মানে মাথা পেতে গ্রহণ করে ধন্যা হলাম। পূর্ণ হলাম তাদেরই দানে- যাঁরা আমার সকল অযোগ্যতা ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করে এই মর্যাদা দিলেন। সশ্রদ্ধ তসলিম তাঁদেরকে এ উপস্থিত সভাজনকে। প্রথমবারের সম্মেলন থেকে আজকের সম্মেলন কালের ব্যবধানে, আগের দিনের অনেককে আমরা হারিয়েছি, আবার নতুন করে কাছে পেলামও। কিন্তু কিছুদিন মাত্র আগে আমরা যাকে হারালাম সেই সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরীর কথা উল্লেখ না করলে আজকের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি আমার আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশী করেছিলেন মানুষ ও আমার সহকর্মী। সাহিত্যিক গোষ্ঠী বললে যে একটি সাহিত্যিক মণ্ডলী বুঝায়, তিনি ছিলেন তারই মতো শুভ্র একটি জ্যোতিষ্ক। তাঁর সংযত স্বভাব, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, মৃদুভাষণ ও স্মিত হাসির মধ্যে ছিল মানসিক দৃঢ়তার পরিচয়। তাঁর লেখার পরিচয় নতুন করে দিতে গেলে আমার বিদ্যায় কুলোবে না। উপস্থিত সুধী ও সাহিত্যিকগণ তাঁর কাব্য ও প্রবন্ধের সংযত এবং সুখ পাঠ্য বর্ণনা ভঙ্গির গুণগ্রাহী- একথা বহুজন স্বীকার্য। আজ তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর বিষয়ে আলোচনা করে এ সম্মেলন যথার্থ সাহিত্যিকের মর্যাদাই রক্ষা করবে। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে সভার কার্য আরম্ভ করব।

এখনে সম্মেলনের কথায় আসা যাক। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেসা করেছেন, দেশের এই দুর্দিনে অনেক শহরে ও রাজধানীতে ও নানা রকম আনন্দ আয়োজন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য সম্মেলন করার প্রয়োজন কি? তাদের বলেছি এবং এখানেও আমি বলব, খাওয়া-পরা ঘুমানোর প্রয়োজনের মত আনন্দ অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন রয়েছে বই কি। নিরবিচ্ছিন্ন রাত্রি কিম্বা দিন কোনোটাই বাঞ্ছনীয় বা সহনীয় নয়। হরিষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য পাশাপাশি থাকবেই, একটি আর একটির মূল্য দান করে। মানুষের সমাজ ও সংসারে এগুলির আগমন নির্গমন অত্যন্ত বাস্তব। মানুষের দেহের মতো সমাজ ও সংবাদদেহও নৈতিক ও মানসিক বহু আঘাতে বেদনা সহ্য করে সবল ঋজু হয়ে আবার যখন উঠে দাঁড়াতে চায়, উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সেই সহজাত মনন শক্তি জেগে ওঠে। সংগ্রাম, দারিদ্র্য, অভাব মানুষকে হীন করে তোলে, ব্যক্তিত্বও যেন হতচেতন হয়ে পড়ে, পথ খুঁজে পথের দিশা করতে পারে না, তখন আসে চারণের কণ্ঠে গাথা, কবির কাব্য প্রেরণা, সাহিত্যিকের সত্যসন্ধ মনের আলেখ্য, শিল্পীর তুলিতে জীবন্ত চিত্র-এঁদের সঙ্গে জেগে উঠে সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতি। মানুষকে বেঁচে থাকার, সুষ্ঠু জীবন যাপন করবার সকল দীনতা হীনতাকে তুচ্ছ করে আবার মানুষ হয়ে দাঁড়াবার কথা শুনাবার জন্য, একত্র সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য, একের সাথে অন্যের মিলিত ভাবধারার আদান-প্রদানের জন্য সাহিত্য অনুষ্ঠানের অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন রয়েছে। অবচেতন মন, অবসন্ন স্নায়ু, উদ্যমহীন জীবনে আনন্দের আভাস পেলে আবার নতুন করে জেগে উঠতে পারে ও কর্মক্ষম প্রাণাবেগ লাভ করে। যে কোনো দেশে যে কোনো জাতি উন্নত হয়েছে, ধ্বংসের পরে আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে, সেখানেই প্রথমে জেগেছে চারণ কবি, সাহিত্যিকের দল। অতীতের গাথা, বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে ফুটিয়ে তুলেছে চারণ, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের সংগ্রামী সাধনা, দুঃখ বিষাদ আনন্দের প্রেরণায় আবার মানুষের মন জেগে উঠেছে, গড়ে তুলেছে জাতি, ফিরিয়ে এনেছে ঐতিহ্য অতীত ও নবীনের সমন্বয়ে, এগিয়ে এসেছে যুগের পরিবেশে। আমাদের দেশ এখন নিদারুণ দীনতা, হীনতা ও অসাধুতার কালিমায় আচ্ছন্ন। মানুষ চোখে দেখতে শুনতে পায়

না বা চায় না, পেটের ক্ষুধায় মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে এনেছে, পশু খিদের সময় শুধু নিজের পেটের ক্ষুধা শান্ত করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু মানুষ তার নিজের সন্তান, মা-বাপ, এমনটি আত্মীয়স্বজনের পেটের ক্ষুধার জ্বালা মিটাবার জন্যও অন্ধ হয়ে ওঠে। এই ক্ষুধা আল্লাহর দেওয়া। কিন্তু মানুষের ক্ষুধার গ্রাস আবার যে মানুষেরা কেড়ে খায় তাদের কী আখ্যা দেওয়া যায়। সেই হীন হিংস্র পশুদের হাত থেকে মানুষের মনুষত্বকে রক্ষা করতেই এগিয়ে আসে শিল্পী-চারণ-কবি-সাহিত্যিকদের দল। তাই দুঃখ যতই ঘনিয়ে আসুক না যার মন্বন্তর যতই থাকুক, আনন্দ-বেদনার আঘাত দিয়ে সমাজ ও জাতিকে জাগিয়ে তোলবার আয়োজন করার জন্য এই রকম সম্মেলনের প্রয়োজন অবশ্য আছে। তবে অপাত্রে বা অকালের কিছুই ফলপ্রসূ হয় না। উপযুক্ত জনের হাতে পড়লে, প্রয়োজনবোধে প্রয়োগ করতে পাড়লে বিষই অমৃত হয়ে মৃত্যুকে দূর করে দেয়। আমরা আশা করব, সুধী সজ্জন সমবেত মণ্ডলী মানুষের মনের দুয়ারে আনন্দের আঘাত দিয়ে আত্মচেতনার আবাহন জানিয়ে দিয়ে সুষ্ঠু সুন্দর করে মানব জীবনকে মহত্তর, কল্যাণকর পথের সন্ধান দান করে এ অনুষ্ঠান সার্থক সফল করে তুলবেন। ধন্য হব আমরা, পূর্ণ হবে আমাদের সমস্ত শূণ্যতা। এই আনন্দ সুগভীর তৃপ্তিতে আজ আর বেশী কিছু বলা অবান্তর। সকলে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনে হয়ত অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। সকলকে আমার আনন্দপ্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে এবার সভাপতি সাহেবকে তাঁর সভার কাজ শুরু করবার অনুরোধ জানিয়ে আমি জানাই আদাব-আরজ। আমাকে একজন কবি হিসাবেই এ কৃষ্টি কেন্দ্রে আপনারা আহ্বান করে এনেছেন। আমার সানন্দমনের ভাব এই কবিতাটুকুতে আপনাদের কাছে নিবেদন করে আমি ধন্যবাদ জানাই।-

খোলো দ্বার খোলো দ্বার
মুক্ত আনন্দের পারাপার
রাত্রির তিমির ভোর
কানন প্রান্তর...
পত্রে পুষ্পে সোনার ফসল ভারে ভারে
নিত্য নব নব উপহার
ধরণী ভরিছে তার ...
অনিবার্ণ আনন্দের দীপ শিখা জ্বালি,
ডাক দিয়া যায় বার বার
খোলা দ্বার খোলা দ্বার।

যে ঢেকেছে সংশয়ের আঁধারেতে আঁখি
দুয়ার দিয়েছে যারা বাহিরেতে রাখি
মূক জীবে দুর্যোগের রাতে
তাহাদের নিশীথ-প্রভাতে
দুর্ভাগ্যের করাঘাত হানি
ফিরে গেল সাফল্যের বাণী
তাহাদের ডাক বার বার

খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।

অগণিত জনতার স্রোতে
যে ব্যথিত লভে কোনো মতে
হারানো প্রশান্তিটুকু তার
সেই খুলে দেয় সেই দ্বার
সেই সে আনন্দ লোক।
সেখানে ডাকিছে বার বার
মুক্ত আনন্দের পারাপার।
উন্মুক্ত হউক দ্বার পশি আমি সে শান্তি প্রাঙ্গণে
মিলিত আনন্দ ধ্বনি ব্যাপ্ত হোক ভুবনে গগনে।

(সূত্র: সাপ্তাহিক *বেগম*, ৯ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৫৬)

পরিশিষ্ট-৬

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্য বুদ্ধিজীবী সমিতি তাদের সমিতির প্যাডে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের একটি সনদপত্র প্রদান করেন। তার ভাষা ছিল নিম্নরূপ-

সনদপত্রের নমুনা

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি

ঠিকানা: ১৪৪ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

টেলিফোন: ২৪-৩৯৩০

৭ই ডিসেম্বর

শ্রী/শ্রীমতী............................

পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার আক্রমণে বাঙলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সহায়ক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তার জন্য শ্রীমতী সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে আমরা একটি গানের স্কোয়াড তৈরি করি। পরে বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' শ্রী ওয়াহিদুল হককে এই স্কোয়াড পরিচালনায় নিয়োগ করেন ও এই স্কোয়াড 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম শিল্পী সংস্থা' নামে অভিহিত হয়। এই গানের স্কোয়াড 'বাঙলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' ও 'বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি'র যুগ্ম উদ্যোগে বাঙলাদেশের মুক্তাঞ্চলে, শরণার্থী শিবিরে, কলকাতায়, এই রাজ্যের ও বিভিন্ন অঞ্চলে ও দিল্লিতে 'রূপান্তরের গান'সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনমত সংগঠন করে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

শ্রী/শ্রীমতী..............................এই গানের স্কোয়াডে অংশ নিয়েছেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

(সূত্র: কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৮৭)

পরিশিষ্ট-৭

বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী

০১.	কল্যাণী ঘোষ	সম্পাদিকা	পরিচালনা পরিষদ
০২.	প্রবাল চৌধুরী	কার্যকরী সদস্য	পরিচালনা পরিষদ
০৩.	কাদেরী কিবরিয়া	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
০৪.	রথীন্দ্র নাথ রায়	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
০৫.	বিপুল ভট্টাচার্য	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
০৬.	এম এ মান্নান	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
০৭.	রফিকুল আলম	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
০৮.	সুকুমার বিশ্বাস	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
০৯.	আবু নওশের	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১০.	অরূপ রতন চৌধুরী	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১১.	মোশাদ আলী	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১২.	চিত্তরঞ্জন ভূইয়া	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১৩.	আবু তালেব	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১৪.	মিতালী মুখার্জী	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১৫.	পূর্ণিমা দাশ চৌধুরী	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১৬.	উমা চৌধুরী	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১৭.	জয়ন্তী লালা (ভূইয়া)	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১৮.	মৃণাল ভট্টাচার্য	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
১৯.	সুজিত রায়	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
২০.	শেখর নাথ	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
২১.	দেবী চৌধুরী	সদস্য	কণ্ঠশিল্পী
২২.	দেবব্রত চৌধুরী	বাদ্যযন্ত্রী	তবলা বাদক
২৩.	দীপক মুখার্জী	বাদ্যযন্ত্রী	তবলা বাদক
২৪.	মিলন ভট্টাচার্য	বাদ্যযন্ত্রী	তবলা বাদক
২৫.	বাবুল দত্ত	বাদ্যযন্ত্রী	তবলা বাদক

(সূত্রঃ কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৯০)

পরিশিষ্ট-৮

বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী

১.	এএইচএম কামরুজ্জামান	প্রধান উপদেষ্টা
২.	অধ্যাপক ইউসুফ আলী	সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ
৩.	শামসুল হক	সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ
৪.	আব্দুল হামিদ	সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ
৫.	নুরজাহান মুরশীদ	সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ
৬.	কেএম ওবায়দুর রহমান	সভাপতি, কার্যকরী পরিষদ
৭.	আব্দুল জব্বার	সাধারণ সম্পাদক
৮.	আপেল মাহমুদ	কোষাধ্যক্ষ, কার্যকরী পরিষদ
৯.	ব্যারিস্টার বাদল রশিদ	প্রধান সমন্বয়কারী কার্যকরী ও উপদেষ্টা পরিষদ
১০.	মঞ্জুর আহমেদ	সদস্য শিল্পী
১১.	সরদার আলাউদ্দিন	সদস্য শিল্পী
১২.	শহিদুল ইসলাম	সদস্য শিল্পী
১৩.	দিলীপ সোম	সদস্য শিল্পী
১৪.	রথীন্দ্র নাথ রায়	সদস্য শিল্পী
১৫.	মান্না হক	সদস্য শিল্পী
১৬.	কাদেরী কিবরিয়া	সদস্য শিল্পী
১৭.	স্বপ্না রায়	সদস্য শিল্পী
১৮.	রমা ভৌমিক	সদস্য শিল্পী
১৯.	নমিতা ঘোষ	সদস্য শিল্পী
২০.	মাধুরী আচার্যী	সদস্য শিল্পী
২১.	অরুনা সাহা	সদস্য শিল্পী
২২.	সুমিতা দেবী	সদস্য শিল্পী
২৩.	অবিনাশ চন্দ্র শীল	যন্ত্রশীল
২৪.	মাযহারুল ইসলাম তপন	অনুষ্ঠান ঘোষক

(সূত্রঃ কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৯১)

পরিশিষ্ট-৯

স্বাধীনতা সংগীত দল

শিল্পীদের নাম

০১.	ওস্তাদ কুলেন্দু দাস	গীতিকার/সুরকার/কণ্ঠশিল্পী
০২.	কল্যাণ দাস	কণ্ঠশিল্পী
০৩.	কণিকা দাস	কণ্ঠশিল্পী
০৪.	বেবী দাস	কণ্ঠশিল্পী
০৫.	কৃষ্ণ দাস	কণ্ঠশিল্পী
০৬.	লিপিকা দাস	কণ্ঠশিল্পী
০৭.	হেনা	কণ্ঠশিল্পী
০৮.	দীপালি রায়	কণ্ঠশিল্পী
০৯.	উমা	কণ্ঠশিল্পী
১০.	শান্তি	কণ্ঠশিল্পী
১১.	মুরারী সাহা	ক্লারিওনেট কণ্ঠশিল্পী
১২.	মিসেস মুরারী সাহা	তবলা বাদক
১৩.	শেফাল রায়	তবলা বাদক

(সূত্রঃ মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষ্য*, ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৭, পৃ. ১১৮-২০)

পরিশিষ্ট-১০

স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘ

সদস্যদের নাম

১.	ক্যাপ্টেন সুজাত আলী	উপদেষ্টা
২.	আব্দুল্লা আল হারুণ	উপদেষ্টা
৩.	আব্দুল্লা আল নোমান	উপদেষ্টা
৪.	আব্দুল মালেক উকিল	উপদেষ্টা
৫.	এ বি এম তালেব আলী	উপদেষ্টা
৬.	শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার কচি	উপদেষ্টা
৭.	সুখেন্দু চক্রবর্তী	সভাপতি
৮.	নৃপেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী	সহ-সভাপতি
৯.	মাহবুব চৌধুরী	সাধারণ সম্পাদক
১০.	অভিজিৎ সাহা পিনাক	সদস্য
১১.	জোৎস্না রাণী ভৌমিক	সদস্য
১২.	মায়া সাহা	সদস্য
১৩.	শাকিলা চৌধুরী	সদস্য
১৪.	শর্মিষ্ঠা চৌধুরী	সদস্য
১৫.	মলয় কর	সদস্য
১৬.	অজয় চক্রবর্তী	সদস্য
১৭.	দেবাশীষ চৌধুরী	সদস্য
১৮.	প্রদোৎ পাল	সদস্য
১৯.	সুকুমার সাহা	সদস্য
২০.	নীলিমা সাহা	সদস্য
২১.	রত্না বিশ্বাস	সদস্য

(সূত্রঃ কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৯৫)

পরিশিষ্ট- ১১

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থা

শিল্পীদের নাম

১. এ কে এম কাইজুল্লাহ
২. এস. এম মহসীন
৩. সরদার আলাউদ্দিন
৪. হরি প্রসন্ন পাল
৫. অমল দত্ত
৬. সৈয়দ মামুনুর রশিদ
৭. চিত্তরঞ্জন ভূইয়া
৮. এস. এম. সেলিম
৯. সুধেন্দু চক্রবর্তী
১০. মৃনাল কান্তি দত্ত
১১. রবীন্দ্র লাল পোদ্দার
১২. কামাল উদ্দিন আহমেদ
১৩. এস. এম. শাহজাদা
১৪. হাফিজুল কবীর লেলিন
১৫. মহিউদ্দিন খোকা
১৬. সৈয়দ জহির হোসেন
১৭. ছালাম কবীর
১৮. বেণু চক্রবর্তী
১৯. অরূপ রতন চৌধুরী
২০. দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
২১. ফিরোজ আহমেদ
২২. সুজিত আরেং
২৩. আজিজুল হক চৌধুরী
২৪. এ. কে. এম. হারুনুর রশিদ
২৫. আশিষ চৌধুরী
২৬. অমল কৃষ্ণ মজুমদার
২৭. ছায়া রায়

২৮. জয়ন্তী ভূইয়া

২৯. নিয়তি ভূইয়া

৩০. সুমিত্রা ভট্টাচার্য

৩১. গীতশ্রী চৌধুরী

৩২. জয়শ্রী চৌধুরী

৩৩. দিলারা বেগম

৩৪. শ্যামল কৃষ্ণ মজুমদার

৩৫. শিথি কর

৩৬. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

৩৭. উমেশ চন্দ্র রায়

৩৮. আমিনুল হক

৩৯. আব্দুল মঈন

৪০. সিদ্দিক মিয়া

৪১. নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ

৪২. মেরাজ উদ্দিন আহমেদ

৪৩. মো. মোতাহার হোসেন খান

৪৪. মো. ওবায়দুল হক

৪৫. মো. হুমায়ুন কবীর

৪৬. মো. আব্দুস শহীদ

৪৭. মো. মফিজুল ইসলাম

৪৮. জসিম উদ্দিন আহমেদ

৪৯. সাহাবুদ্দিন আহমেদ

৫০. মুক্তা চক্রবর্তী

৫১. এ. কে. এম. আজিজুল্লাহ্

৫২. আব্দুস কুদ্দুস মাখন

(সূত্র: মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষ্য*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৭, পৃ. ১০৬-১১৪)

পরিশিষ্ট-১২

শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

০১.	জনাব কেএম ওবায়দুর রহমান, এমএনএ	উপদেষ্টা, সমাজ সেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আওয়ামী লীগ
০২.	জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, এমপিএ	উপদেষ্টা, সদস্য, কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তর
০৩.	ডা. আসহাবুল হক এমপিএ	উপদেষ্টা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি
০৪.	জনাব এম. এ জলিল	উপদেষ্টা, সম্পাদক, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, নওগাঁ
০৫.	সৈয়দ হাসান ইমাম	উপদেষ্টা, সম্পাদক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সমিতি
০৬.	খোন্দকার আব্দুল হান্নান	সভাপতি, কার্যকরী পরিষদ
০৭.	সুব্রত বড়ুয়া	সহ-সভাপতি
০৮.	তৃপ্তি রায় চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৯.	সবুক্তগীন মাহমুদ	সাংগঠনিক সম্পাদক
১০.	শেখ মুহম্মদ কাইয়ুম	সাংগঠনিক সম্পাদক
১১.	শরিফ উন নাহার	যুগ্ম-সম্পাদক
১২.	বেগম এ এ জলিল	কোষাধ্যক্ষ
১৩.	একেএম জালালউদ্দীন সেলিম	সদস্য
১৪.	মোহাম্মদ জিনাত আলী	সদস্য
১৫.	ফকির আব্দুর রাজ্জাক	সদস্য
১৬.	মামুনাল চৌধুরী	সদস্য
১৭.	এস এম জাহাঙ্গীর	সদস্য
১৮.	মোহাম্মদ সেলিম	সদস্য
১৯.	এস. এম. এ কে আজাদ	সদস্য
২০.	বিপ্লব দাশ	নৃত্যনাট্য রচনা
২১.	মামুনাল চৌধুরী	অনুষ্ঠান পরিচালনা
২২.	রফিকুল আলম	সংগীত পরিচালনা

২৩.	পীযুষ পাল	নৃত্য পরিচালনা
২৪.	আশরাফুল আলম	ধারা বর্ণনা
২৫.	দেবদাস রায়	শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ অঙ্কন
২৬.	পীযুষ পাল	নৃত্য পরিচালনা
২৭.	কমল সরকার	নৃত্যশিল্পী
২৮.	সশান্ত সরকার	নৃত্যশিল্পী
২৯.	নারায়ণ দেব	নৃত্যশিল্পী
৩০.	অনামিকা চাকলাদার	নৃত্যশিল্পী
৩১.	শিখা দাশ	নৃত্যশিল্পী
৩২.	রেখা দাশ	নৃত্যশিল্পী
৩৩.	দিপা দাশ	নৃত্যশিল্পী
৩৪.	শুক্লা সরকার	নৃত্যশিল্পী
৩৫.	সুনন্দা চাকলাদার	নৃত্যশিল্পী
৩৬.	বিপ্লব দাশ	নৃত্যশিল্পী
৩৭.	আজাদ	নৃত্যশিল্পী
৩৮.	রফিকুল আলম	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৩৯.	মামুনাল চৌধুরী	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪০.	অনুপ ভট্টাচার্য	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪১.	তিমির নন্দী	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪২.	বিপুল ভট্টাচার্য	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪৩.	মমতাজ বেগম	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪৪.	আফরোজা মামুন	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪৫.	শ্যামলী মুখার্জী	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪৬.	মিতালী মুখার্জী	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪৭.	দীপক মুখার্জী	কণ্ঠ সংগীতশিল্পী
৪৮.	পবিত্র দে	যন্ত্র সংগীতশিল্পী

৪৯.	ফকীর আলমগীর	যন্ত্র সংগীতশিল্পী
৫০.	তৃপ্তি রায় চৌধুরী	অভ্যর্থনা
৫১.	জিনাত চৌধুরী	অভ্যর্থনা
৫২.	নির্মল নাথ	অভ্যর্থনা
৫৩.	হীরেন বোস	অভ্যর্থনা
৫৪.	খোন্দকার আব্দুল হান্নান	অভ্যর্থনা
৫৫.	সবুক্তগীন মাহমুদ	অভ্যর্থনা
৫৬.	এস. এম জাহাঙ্গীর	অভ্যর্থনা
৫৭.	এস. এ সাদেক	অভ্যর্থনা
৫৮.	এস. এম. এ. কে আজাদ	অভ্যর্থনা
৫৯.	সরোজ সাহা	স্বেচ্ছাসেবক
৬০.	বিপ্লব চক্রবর্তী	স্বেচ্ছাসেবক
৬১.	চঞ্চল কুণ্ডু	স্বেচ্ছাসেবক
৬২.	জ্যোতি দাশ	স্বেচ্ছাসেবক
৬৩.	মীরা রায়	স্বেচ্ছাসেবক
৬৪.	আনিসুল ইসলাম (বাবলু)	স্বেচ্ছাসেবক
৬৫.	মোহাম্মদ আব্দুল মতিন মোনার্কি	স্বেচ্ছাসেবক
৬৬.	জয়ন্ত কুমার দত্ত (খোকন)	স্বেচ্ছাসেবক
৬৭.	রফিক নওশাদ	স্মারকপত্র সম্পাদনা
৬৮.	দেবদাস রায়	শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ অঙ্কন

(সূত্রঃ কামাল লোহানী, *মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকাঃ দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৮৮-৮৯)

পরিশিষ্ট-১৩

বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিষদ

০১.	এম. আবিদ আলী এমপিএ, পাটগ্রাম-হাতীবান্দা থানা	সভাপতি
০২.	তফিজউদ্দীন আহমেদ	সহ-সভাপতি
০৩.	মোশাররফ হোসেন মশু	সম্পাদক (কণ্ঠশিল্পী)
০৪.	এ. আনোয়ারুল ইসলাম	প্রচার সম্পাদক (ধারাবর্ণনা)
০৫.	মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন	পরিচালক (কণ্ঠশিল্পী)
০৬.	মোহাম্মদ আয়ুব প্রধান	ধারা বর্ণনা
০৭.	বদরুন্নাহার তানি	কণ্ঠশিল্পী
০৮.	মো. শাহজাহান	তবলা বাদক
০৯.	মো. শাহাজামাল (তোতা)	কণ্ঠশিল্পী
১০.	রতন লাল সাহা	কণ্ঠশিল্পী
১১.	আবু বকর সিদ্দিক প্রধান	বাঁশি বাদক
১২.	শমশের আলী প্রধান	কণ্ঠশিল্পী
১৩.	কে কে সিদ্দিক	কণ্ঠশিল্পী
১৪.	মোজাম্মেল হক	কণ্ঠশিল্পী
১৫.	শামীম আরা (বিউটি)	কণ্ঠশিল্পী
১৬.	সাজেদা খাতুন (মনান)	কণ্ঠশিল্পী
১৭.	আলম আরা ইকবাল বানু (হেলেন)	কণ্ঠশিল্পী
১৮.	খামেরুল ইসলাম	কণ্ঠশিল্পী
১৯.	ধীরেন্দ্র নাথ নমদাশ	কণ্ঠশিল্পী

(সূত্রঃ কামাল লোহানী, *মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকাঃ দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৯২)

পরিশিষ্ট-১৪

*শিলালিপি*র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়

শিলালিপি

প্রথম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ’৬৯

সম্পাদিকা: সেলিনা পারভীন

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাহিত্য একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাহিত্যকে বাদ দিয়ে কোনো জাতির ইতিহাস রচিত হয়েছে-এমন নজীর বিরল। বিশেষত: জাতির সভ্যতার ইতিহাস সাহিত্যেরই ক্রমোন্নতির ইতিহাস।

ফুলের সৌরভ, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর রূপ বর্ণনার সাহিত্যকে বাদ দিয়ে যেদিন মানুষ নিজের মর্ম বেদনা, সূক্ষ্ম বিবেক দংশন, বিচিত্র অনুভূতি আর বেদনার কাহিনী নিয়ে প্রথম সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলো-বলতে গেলে সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চারের ক্রান্তি লগ্ন সেদিন থেকেই।

আজকের লুনা কিংবা এ্যাপোলোর সমানব চন্দ্রে গমনের বাস্তবতার যুগে মানুষের দৃষ্টিপাত হচ্ছে ভিন্নতর। চাঁদকে প্রেয়সীর কাছে সংবাদ প্রেরণের দূত কিংবা দুঃখ রাত্রির সঙ্গিনী হিসাবে কল্পনা করতে আজকের যান্ত্রিক যুগের প্লাষ্টিক হৃদয়ের মানুষ আদৌ রাজী নন। রূপালী চাঁদ আজ ‘ঝলসানো রুটি’ কিংবা গ্রহান্তরে গমনের একটি ‘হল্টিং ষ্টেশন’ মাত্র।

এদিনে বিরাটকায় সাহিত্য সংকলন অপেক্ষা টেলিভিশনে চন্দ্রাবতরণ দর্শন বেশী উপভোগ্য এবং অনায়াস জ্ঞানার্জনের উপায়।

কিন্তু পাঠক যে আদৌ নেই তা স্বীকার করতে আপত্তি আছে যথেষ্ট। সহস্রাধিক স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মুদ্রা খরচে দীর্ঘকাল সংরক্ষণের উপযোগী সাহিত্য সংকলন সর্বসমক্ষে পেশ করার তাই এ দুঃসাহস অনেককে আশান্বিত করলে বাধিত হবো, নিশ্চয়ই।

সমস্যা যেখানে প্রচুর-হৃদয় যেখানে প্লাষ্টিকের তৈরী এবং হৃদয়স্পন্দন যেখানে ব্যাটারী শেলের কারসাজি সেখানে কারো কারো সহানুভূতি এবং অকৃত্রিম হৃদয়তা আয়াসহীন মুগ্ধতা আনতে সক্ষম।

এই সঙ্কলনে সিনেমা সাপ্তাহিক ‘পূর্বাণী’ সম্পাদক এবং ইত্তেফাক প্রকাশনা সংস্থার সরবরাহ বিভাগীয় প্রধান অনুজপ্রতিম খন্দকার শাহাদাৎ হোসেনের অনুপ্রেরণা, সাহায্য ও সহৃদয়তা তাই আমাকে ঋণভারে নত করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে ‘শিলালিপি’ কোনো সফল সংযোজন একথা দাবী করা মুর্খতা নিঃসন্দেহে। তবুও, শিলালিপি আপনাদের নিছক সামান্যতম আনন্দ দানের দুঃসাহস নিয়েই মুদ্রিত। আশা করি সংকলনটি আপনাদের ভাল লাগবে।

(সূত্রঃ সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ১৯৬)

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস

১.১ দলিলপত্র, আদমশুমারি রিপোর্ট ও অন্যান্য

মাহমুদউল্লাহ (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১)*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১)*, তিন খণ্ড, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১২।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৩য় ও ৫ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯।

A. Rashid (ed.), *Census of Pakistan Population 1961, Volume 1,* Goverment of Pakistan, Karachi.

Bangladesh Census of Population 1974, Bulletin 1, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.

H. H. Nomani (ed.), *Census of Pakistan Population 1951, Volume 3 & 8,* Goverment of Pakistan, Karachi.

Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly, 22nd February 1952, Vol. vii

National Assembly of Pakistan Debates, Official Report, 4th July 1967

University of Dhaka, Annual Report for 1947-48 to 1970-71.

১.২ সংবাদপত্র (দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক)

দৈনিক আজাদ

১ জানুয়ারি ১৯৪৯
১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
১ মার্চ ১৯৫২
২২ এপ্রিল ১৯৫৪
২৩ এপ্রিল ১৯৫৪
২৪ এপ্রিল ১৯৫৪
২৫ এপ্রিল ১৯৫৪
২৭ এপ্রিল ১৯৫৪

২৯ মার্চ ১৯৫৭
৩১ মার্চ ১৯৫৭

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
১৭ এপ্রিল ১৯৫৮
২৩ এপ্রিল ১৯৬১
১৩ জানুয়ারি ১৯৬৪
১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫
৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬
২৬ মার্চ ১৯৯৭
২৩ মার্চ ১৯৯৯
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

দৈনিক ইত্তেহাদ
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

দৈনিক ইনকিলাব
৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫
১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬
৯ মে ১৯৯৭
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৩ মার্চ ২০১৫

দৈনিক পাকিস্তান
২৪ জুন ১৯৬৭
২৭ জুন ১৯৬৭
২৯ জুন ১৯৬৭
৭ মার্চ ১৯৭১
১৫ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক প্রথম আলো
১৬ ডিসেম্বর ২০০৫
১৫ এপ্রিল ২০১৮
২৯ আগস্ট ২০১৯

দৈনিক ভোরের কাগজ
৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

১৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯
২৫ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯
২৯ মার্চ ২০১৯

দৈনিক মিল্লাত
১৬ এপ্রিল ১৯৫৪

দৈনিক যুগান্তর
২৬ মার্চ ২০০৫
৭ অক্টোবর ২০০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

দৈনিক সংবাদ
৬ জুন ১৯৬৯
৫ নভেম্বর ১৯৭০
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৬ মার্চ ১৯৭১
১৬ মার্চ ১৯৭১
২৩ মার্চ ১৯৭১
৭ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৮২
৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬

Pakistan Observer
৯ মে ১৯৬১
২৩ জুন ১৯৬৭

Statesman
৩ মার্চ ১৯৫২

সাপ্তাহিক বেগম
২৭ জুলাই ১৯৪৭
২৩ আগস্ট ১৯৪৭
৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
১৪ মার্চ ১৯৭১
২৬ মার্চ ১৯৭২

সাপ্তাহিক সৈনিক
৯ জানুয়ারি ১৯৪৯

মাসিক মাহে নও
অক্টোবর ১৯৬৮

১.৩ আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা

আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩।

আফরোজা বুলবুল, *সুন্দর এই পৃথিবী আমার*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৫।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *বহে জলবতী ধারা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: সময়, ২০১১।

আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি* (অখণ্ড সংস্করণ), ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।

আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৫।

উমরতুল ফজল, *স্মৃতিকথা প্রিয়দিনের স্মৃতি*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৭।

কলিম শরাফী, *ভরা থাক স্মৃতি সুধায়*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৯।

কলিম শরাফী, *স্মৃতি অমৃত*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

খান সারওয়ার মুরশিদ, *কালের কথা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১।

জওশন আরা রহমান, *স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫।

জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, ২০১৭।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *আমার চলার পথে*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২।

নির্মলেন্দু গুণ, *মহাজীবনের কাব্য*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৩।

ফেরদৌসী মজুমদার, *অভিনয়জীবন আমার*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৯।

ফেরদৌসী মজুমদার, *মনে পড়ে*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪।

ফেরদৌসী মজুমদার, *যা ইচ্ছা তাই*, ঢাকা: জার্নিম্যান বুকস, ২০১৮।

বাসন্তী গুহঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১।

বুলবুল মহলানবীশ, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি ও স্মৃতি'৭১*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৬।

বেগম মাজেদা আলী, *শিউলি ঝরা দিনগুলো*, খুলনা: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৯।

বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, ঢাকা: মূর্ধন্য, ২০১১।

মতিয়া চৌধুরী, *দেয়াল দিয়ে ঘেরা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

মন্দিরা ভট্টাচার্য, *ঢাকার স্মৃতি ও ডাক্তার নন্দী*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৮।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *স্মৃতির সন্ধানে*, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৮।

মাহমুদ নূরুল হুদা, *আমার জীবনস্মৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি পূর্বখণ্ড*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৫।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি উত্তরখণ্ড*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭।

সন্‌জীদা খাতুন, *সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩।

সরদার ফজলুল করিম, *আমি সরদার বলছি*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৩।

সেলিনা বাহার জামান, *পথে চলে যেতে যেতে*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৬।

সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা: মালেকা বেগম, ১৯৮৯।

হেনা দাস, *একাত্তরের স্মৃতি*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।

১.৪ সাক্ষাৎকার

ক. গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার

আনিসুজ্জামান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ নভেম্বর ২০১৯।

কাজী রোজী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বনানী, ঢাকা, ২৮ আগস্ট ২০১৯।

কামাল লোহানী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, ঢাকা, ২৯ অক্টোবর ২০১৭।

ডালিয়া নওশীন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন), শাহবাগ, ঢাকা, ৫ জুলাই ২০১৯।

নাসরীন আহমাদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপ-উপাচার্য কার্যালয় (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬।

ফেরদৌসী মজুমদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মহিলা সমিতি মিলনায়তন, বেইলী রোড, ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

বুলবুল মহলানবীশ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মহাখালী, ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ২০১৭।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১১ মার্চ ২০১৭।

মন্দিরা ভট্টাচার্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: গুলশান, ঢাকা, ২১ নভেম্বর ২০১৫।

মালেকা বেগম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, ২০ নভেম্বর ২০১৯।

মুনতাসীর মামুন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ৬৩/বি, গিয়াসউদ্দিন আবাসিক এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬।

রওশন আরা বাচ্চু, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ভাষা শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি যাদুঘর ও সংগ্রহশালা, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

রফিকুল ইসলাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর ২০১৯।

রামেন্দু মজুমদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মহিলা সমিতি মিলনায়তন, বেইলী রোড, ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

লুবনা মরিয়ম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মহাখালী, ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ২০১৭।

শরিফা খাতুন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাড়ি ৩৯ (চিরন্তনী), রোড ১২/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

শাহীন সামাদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ২৮ মার্চ ২০১৭।

শীলা মোমেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ৪/বি, শহীদ আবুল খায়ের ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

সুফিয়া আহমেদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ভাষা শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি যাদুঘর ও সংগ্রহশালা, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

হাশেম খান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা, ১৭ জুলাই ২০১৯।

খ. অন্যদের গৃহীত সাক্ষাৎকার

আব্দুর রাজ্জাক (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮)।

ওয়াহিদুল হক (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ (নির্মিত), *মুক্তির গান*, ঢাকা: লেজার ভিশন, ১৯৯৫)।

জুলেখা হক, (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*)।

নমিতা ঘোষ ('শব্দ সৈনিক নমিতা ঘোষ', Youtube, Channel 24youtube, https://www.youtube.com/watch?v=shaDIEghPKU), সংগ্রহের তারিখ, ১১ জানুয়ারি ২০২০।

নূরজাহান বেগম ('Nurjahan Begum, Editor of Begum',Youtube, Ranjan Mallik , https://www.youtube.com/watch?v=-wRg-y2I1qM), সংগ্রহের তারিখ , ৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

প্রতিভা মুৎসুদ্দি, (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*)।

ফাতেমা চৌধুরী (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭)।

বেলাল মোহাম্মদ ('Belal Mohammad Interview', Youtube, Maasranga TV, https://www.youtube.com/watch?v=BlO-y3g4Kkw), প্রবেশের তারিখ, ৭ জুলাই ২০১৯;('Interview:BelalMohammadvideo',bdnews24.com,https://www.youtube.com/watch?v=HtsOelGv21Y), সংগ্রহের তারিখ , ২০ এপ্রিল ২০১৯।

মাজেদা আলী, (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*)।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, ঐ)।

মাহমুদুর রহমান বেণু (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ (নির্মিত), *প্রাগুক্ত*)।

মোস্তফা মনোয়ার (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, ঐ)।

রাণী ভট্টাচার্য, (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*)।

রোকেয়া মাহবুব শিরি, (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, ঐ)।

লায়লা খান (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত, তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ (নির্মিত), *প্রাগুক্ত*)।

সন্‌জীদা খাতুন ('Interview, Sanjeeda Khatun', Youtube, bdnews24.com, https://www.youtube.com/watch?v=DiSBiBk6z0Y, প্রবেশের তারিখ, ২৩ এপ্রিল ২০১৯; 'Interview of chhayanaut's Shanjeeda khatun', Youtube, bdnews24.com; https://www.youtube.com/watch?v=quo-Ov0b07c, প্রবেশের তারিখ , ২৪ এপ্রিল ২০১৯)।

হালিমা খাতুন ('Dr. Halima Khatun, Writer & Activist', Youtube, Faces of Bangladesh, https://www.youtube.com/watch?v=grWs_1r1xDc, প্রবেশের তারিখ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।

১.৫ অডিও, ভিডিও, চলচ্চিত্র

জাগরণের গান: গণসঙ্গীত, ঢাকা: জাগরণ সংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র, (ভলিউম-১, ২০০৯; ভলিউম-২ ও ৩, ২০১০)।

তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ (নির্মিত), *মুক্তির গান*, ঢাকা: লেজার ভিশন, ১৯৯৫।

শাহীন সামাদ ও এনামুল হক (পরিবেশিত), *রূপান্তরের গান*, ঢাকা: লেজার ভিশন, ২০০৭।

২.দ্বৈতয়িক উৎস

২.১ অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. ও এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

আফরোজা বুলবুল, *'বেগম' পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম নারীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭০)*, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

এ. কে. এম মাহবুবুল হক, *আবুল ফজল, আবদুল হক, আহমদ শরীফ ও আহমদ ছফার প্রবন্ধ: সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ভাবনা*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।

এটিএম কাউছার হোসেন, *গণসঙ্গীত ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ*, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

বীণা রানী দাস, *বাঙালী জাতীয়বাদী আন্দোলনে নারী (১৯৪৭-১৯৭১)*, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

মোছা. তাহমিনা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা, *ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের কবিতা (১৯৬১-১৯৭০)*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।

রেজিনা বেগম, *বেগম পত্রিকা ও পূর্ব বাংলার নারী সমাজ (১৯৪৭-৫৮)*, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪-৯৫।

২.২ কোষ গ্রন্থ

জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮।

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ১৪ খণ্ড ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২য় সংস্করণ, ২০১২ এবং অনলাইন সংস্করণ।

২.৩ বাংলা গ্রন্থ

অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামী: ঐতিহ্যের অনুসন্ধান*, ঢাকা: স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৭।

অমলেন্দু দে, *সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৮১।

অরূপ রতন চৌধুরী, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: আগামী, ২০১৮।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলকাতা: শরৎ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৭।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ, ২০১১।

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ, ১৯৯০।

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *মুক্তির সংগ্রাম*, ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমী, ২০১২।

আনিসুজ্জামান, *সেলিনা বাহার জামান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি, ২০০৫।

আনু মাহ্মুদ, *মহীয়সী নারী সুফিয়া কামাল*, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০১৫।

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, *শামসুননাহার মাহমুদ ১৯০৮-১৯৬৪*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।

আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।

আবদুল হক (সম্পা.), *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।

আবদুশ শাকুর, *বাঙ্গালির মুক্তির গান*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।

আবু জাফর শামসুদ্দীন, *চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য*, ঢাকা: কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম, ১৯৬৪।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: ১৯৯৭।

আবুল আহসান চৌধুরী, *সুফিয়া কামাল: অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১১।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজকথা*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৮।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পা.), *গৌরবের চল্লিশ বছর ১৯৫২-৯২*, ঢাকা: ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৯৩।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে*, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাইভেট) লিমিটেড, ২০০২।

আবুল ফজল, *একুশ মানে মাথা নত না করা*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আবুল ফজল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ-সংকলন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮১।

আবুল ফজল, *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮।

আবুল ফজল, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা*, ঢাকাঃ ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬১।

আবুল ফজল, *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন*, চট্টগ্রামঃ বইঘর, ১৯৬৮।

আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংস্কৃতির স্বরূপ*, ঢাকাঃ অনন্যা, ২০০৭।

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫।

আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৭।

আবুল মোমেন, *সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, ঢাকাঃ সন্দেশ, ১৯৯৬।

আবুল মোমেন, *বাংলা ও বাঙালির কথা*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২।

আবুল হাসনাত (সম্পা.), *আলোকের ঝরনাতলায়*, ঢাকাঃ ছায়ানট, ২০১৭।

আবুল হাসনাত (সম্পা.), *স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা*, ঢাকাঃ ছায়ানট, ২০১১।

আমানুল্লাহ কবীর, ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকাঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০০৬।

আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও উত্তরপ্রভাব*, ঢাকাঃ সময় প্রকাশন, ২০১৭।

আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন*, ঢাকাঃ প্রথমা, ২০০৯।

আহমদ রফিক, ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, ঢাকাঃ প্রথমা, ২০১৯।

আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

আহমদ রফিক, *শিল্প সংস্কৃতি জীবন*, ঢাকাঃ কোহিনূর লাইব্রেরী, ১৩৬৬।

আহমদ শরীফ, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা*, ঢাকাঃ চৌধুরী পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৮।

আহমদ শরীফ, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০।

আহমাদ মাযহার, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বিউটি বুক হাউজ, ২০০০।

ইসমাইল মোহাম্মদ, *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।

ইসরাইল খান, *পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৮-৭১*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬।

ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০০৬।

ইসরাইল খান, জওশন আরা রহমান (সম্পা.), *সীমান্ত সংগ্রহ ১৯৪৭-১৯৫২*, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৫।

ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.), *পরিবেশনা শিল্পকলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১২*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস*, ঢাকা: প্রতীক, ২০১৭।

এনামুল কবির ও আসাদ চৌধুরী (সম্পা.), *যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১।

এম আবদুল আলীম, *সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮।

এম আবদুল আলীম, *পাবনায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: রোদেলা, ২০১৩।

এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: শিখা, ১৯৯৯।

এম. আর. মাহবুব, কাজী গোলাম মাহবুব, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৫।

এম আর মাহবুব, *নরসিংদীতে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫।

এম. আর. মাহবুব (সম্পা.), *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১।

এম. আর. মাহবুব (সম্পা.), *সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন ১৯৪৭-৫৬*, ঢাকা: গৌরব, ২০১৭।

এমাজউদ্দীন আহমদ, হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩*, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

ওবায়দুল হক সরকার, *বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে ইতিহাস*, চট্টগ্রাম-ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০২।

ওবায়দুল হক সরকার, *সেকালে আমাদের নাট্যচর্চা*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫।

ওয়াহিদুল হক, *স্বদেশ সাধনা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৮।

কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৭৫।

কবীর চৌধুরী, *সংস্কৃতি ধর্ম সুশীল সমাজ*, প্রবন্ধ সমগ্র-৩, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬।

কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, কলকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন, ১৩৯৬।

কাজী মোতাহার হোসেন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬।

কাজী রোজী, শহীদ কবি মেহেরুননেসা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১১।

কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

কামাল লোহানী, মাহমুদ সেলিম ও অন্যান্য (সম্পা.), *উদীচী বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, ঢাকা: বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ২০১৯।

কামাল লোহানী, *লড়াইয়ের গান*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।

কামাল লোহানী, *সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নৃত্য শিল্পের বিস্তার*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০।

খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র*, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১।

খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্যসমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।

গুলশান আরা, *সুফিয়া কামাল-জননী সাহসিকা*, ঢাকা: হাতেখড়ি, ২০০৮।

গোপাল হালদার, *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১১।

গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রুপান্তর*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪।

গোলাম কিবরিয়া পিনু, *দৌলতননেছা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১।

গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাত বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা: অবসর, ২০০৬।

চিন্ময় চৌধুরী, *স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী*, কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ১৯৯৮।

জামিল আখতার বীনু, *ভাষা আন্দোলনে নারী*, ঢাকা: গণপ্রকাশনী, ২০১১।

জাহিদ হোসেন (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৫।

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

তরফদার মুহাম্মদ ইসমাঈল, *ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জ*, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৯।

তসিকুল ইসলাম, *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা সংগ্রামীদের কথা বৃহত্তর সিলেট*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭।

তারেক মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৩।

তিতাশ চৌধুরী, *কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮।

তুষার আবদুল্লাহ, *বাহান্নর ভাষাকন্যা*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭।

দীপংকর মোহান্ত, *আধুনিকতার অভিঘাত ও শ্রীভূমির নারী জাগরণ (১৮৭৬-১৯৪৭)*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৯।

নয়ন রহমান, *খোদেজা খাতুন (১৯১৭-১৯৯০)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

নাজিম সেলিম বুলবুল, *আমাদের মুক্তিসংগ্রামে গণ-সঙ্গীতের ভূমিকা*, ঢাকা: বুক সোসাইটি, ১৯৭৯।

নাসিম আখতার হোসাইন, পারভীন জলী (সম্পা.), *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারী*, ঢাকা: সংবেদ, ২০১৯।

নিগার চৌধুরী, *ঊনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলো*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

নিতাই দাস, *বাংলা সাহিত্যে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাব (১৯০৪-১৯৭১)*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, ঢাকা: প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯।

নীহাররঞ্জন রায়, *কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি*, কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯।

পারুল মাহবুব, *ভাষা সৈনিক শিক্ষাব্রতী সোফিয়া খাতুন*, ঢাকা: জনান্তিক, ২০১১।

পূরবী বসু, *আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার নারী*, ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৭।

প্রবীর ঘোষ, *সংস্কৃতি: সংঘর্ষ ও নির্মাণ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

ফকির আলমগীর, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৪।

ফজলুল আলম, *সংস্কৃতি সমগ্র*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১০।

ফজলুর রহমান, *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

ফরিদা আখতার (সম্পা.), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৪।

ফরিদা আখতার (সম্পা.), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৯।

ফরিদা ইয়াসমিন, *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ, ২০০৯।

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৫।

বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১১।

বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।

বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৩।

বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৩।

বাদল চৌধুরী, *মহীয়সী ভাষাসংগ্রামী*, ঢাকা: শব্দশৈলী, ২০১৪।

বাশার খান (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী ৫২ ও ৭১*, ঢাকা: ডেইলি স্টার বুকস, ২০১৮।

বশীর আলহেলাল, *বাংলা একাডেমির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮।

বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০১২।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও শব্দ সৈনিক*, ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১০।

বিলকিস রহমান, *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩।

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩।

বুলবন ওসমান, *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব*, ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশ, ২০১৭।

বেগম মুশতারী শফী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, ঢাকা: প্রিয়ম প্রকাশনী, ১৯৯২।

বেগম রাজিয়া হোসাইন, *জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৯)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২।

বেবী মওদুদ, *বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।

ভীষ্মদেব চৌধুরী, *সাহিত্য সাধনায় ঢাকার নারী*, ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১৮।

মফিদুল হক, *নারী মুক্তির পথিকৃৎ*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭।

মযহারুল ইসলাম, *সাহিত্য পথে*, ঢাকা: গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৬০।

মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, ঢাকা: সি ডি এল, ২০০৬।

মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫।

মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষ্য*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৭।

মামুন সিদ্দিকী, *ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২।

মামুন সিদ্দিকী (সম্পা.), *সেলিনা বানু: সংগ্রামী নারী*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০০৯।

মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬।

মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।

মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১১।

মালেকা বেগম (সম্পা.), *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০* (১-৩ খণ্ড), ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৬।

মালেকা বেগম (সম্পা.), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

মালেকা বেগম, *সুফিয়া কামাল*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৪।

মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১।

মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

মাহমুদ শামসুল হক, *বাঙালি নারী*, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০০।

মাহমুদ সেলিম ও অন্যান্য (সম্পা.), *সংগ্রামের চার দশক*, ঢাকা: উদীচী, ২০০৯।

মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫।

মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান*, ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯১।

মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ: বাঙালি মানস গঠন ও আধুনিকতা*, ঢাকা: সময়, ২০০৭।

মুনতাসীর মামুন, *সেই সব দিন*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৭।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশ: বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আবহমান বাংলা*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৯।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ১৯৮৪।

মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০২০।

মুহম্মদ আবদুল হাই, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৫।

মুহাম্মদ একরামুল হক, *রাজশাহী জেলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।

মো. আবদুল মান্নান, সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা: অবসর, ২০০৬।

মোঃ আখতারুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও ঘটনা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০০৯।

মোঃ খোসবর আলী, *নওগাঁ জেলায় ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৫।

মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৭।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সম্পা.), *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯।

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *নুরুল মোমেন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা: সওগাত প্রেস, ১৯৮৫।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), *আবদুল গণি হাজারী রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮।

মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৭।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪।

যতীন সরকার, *সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০১৫।

যতীন সরকার, *সংস্কৃতির সংগ্রাম*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

যোগশ চন্দ্র বাগল (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৯৫।

রণেশ দাশগুপ্ত, *শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে*, ঢাকা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭২।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *ভাষা আন্দোলন: দলিলপত্র*, ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশ, ১৯৯১।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ১৯২১-১৯৫২*, ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশন, ২০০৪।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ২০১৫।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩।

রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বছর ১৯২১-২০০১*, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৩।

রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

রফিকুল ইসলাম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৪।

রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০০৮।

রীতা ভৌমিক, *২৪ জন ভাষাসংগ্রামীর জীবন কথা*, ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১২।

রীতা ভৌমিক, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে দলিলপত্র (১৯৪৮-১৯৫২)*, ঢাকা: মীরা প্রকাশন, ২০০৯।

রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী, ১৯০৫-১৯৪৭*, ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৬।

রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০২।

রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহেদী (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১২।

রোজিনা কাদের, *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০৪।

শরীফ শমশির, *চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৩।

শামসুজ্জামান ও কল্যাণী ঘোষ, *গণসঙ্গীত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য (সম্পা.), *একুশের স্মারকগ্রন্থ' সাতাশি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।

শামসুর রাহমান ও অন্যান্য (সম্পা.), *একুশের কবিতা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

শামীমা নাসরীন, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ: পাঁচটি কেসস্টাডি ১৯৫২-১৯৯৪*, দিল্লী: নিউ দিল্লী পাবলিশার্স, ২০২০।

শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭।

শাহরিয়ার কবির, *জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৫।

শাহানারা হোসেন, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪।

শাহিদা পারভীন, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২।

শাহীদা আকতার, *বুলবুল চৌধুরী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯০।

শেখ আবদুস সালাম (সম্পা.), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-সহায়ক কর্মকাণ্ড: সেকাল একাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, ২০১৮।

শেখ গাউস মিয়া, *ভাষা আন্দোলন খুলনা ও বাগেরহাট জেলা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০।

শেখ মেহেদী হাসান, *নৃত্যচর্চায় ঢাকার নারী*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১২।

শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬।

সন্‌জীদা খাতুন (সম্পা.), *বাংলাদেশের হৃদয় হতে*, ঢাকা: ছায়ানট, ২০১০।

সন্‌জীদা খাতুন, *সংস্কৃতির বৃক্ষছায়ায়*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৩।

সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা: ভাষা আন্দোলন নববর্ষ, ছায়ানট, মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪।

সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ: অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এর আলাপচারিতা, ঢাকা:* সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪।

সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৮৩।

সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩।

সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)*, ঢাকা: অনন্যা, ২০০১।

সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসঙ্গীত: বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৯।

সাজেদ কামাল (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২।

সায়দিয়া গুলরুখ, মানস চৌধুরী (সম্পা.), *কর্তার সংসার*, ঢাকা: রূপান্তর প্রকাশন, ২০০০।

সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

সালেহা সুলতানা, *সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা: অয়ন প্রকাশন, ২০১৬।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা: বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩।

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন: কলকাতার সংবাদপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।

সুপা সাদিয়া, *৫২'র বায়ান্ন নারী*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১।

সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৭।

সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৬।

সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭।

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* (১ম খণ্ড), ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮।

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* (২য় খণ্ড), ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯।

সেলিনা চৌধুরী, *নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১১।

সেলিনা হোসেন, *ঊনসত্তরের গণআন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

সেলিনা হোসেন, *কথাশিল্পী লায়লা সামাদ*, ঢাকা: রূপসী বাংলা প্রকাশ, ২০১৫।

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *একুশের স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯।

সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।

সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, ঢাকা: নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ১৯৯৩।

সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১২।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *অরণ্য বেতার: স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মীদের প্রথম জবানবন্দী*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১১।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৭।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৬।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পা.), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।

সৈয়দ শামসুল হক (সম্পা.), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল: শেষ প্রণতি*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০০।

সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩।

সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২।

সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১০।

হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৭।

২.৪ বাংলা প্রবন্ধ

আবুল হোসেন খোকন, 'বগুড়া', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

আব্দুল মতিন, 'একুশের স্মৃতিচারণ', শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য (সম্পা.), *একুশের স্মারকগ্রন্থ' সাতাশি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।

আব্দুল মতিন, 'ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম: স্মৃতিতে অম্লান', এম. আর. মাহবুব (সম্পা.), *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১।

আমান-উজ-জামান খান, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি চর্চা', হোসনে আরা শাহেদ (সম্পা.), *স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,* ঢাকা: ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ২০০৬।

আহমদ শরীফ, 'আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান', *বিচিত চিন্তা*, ঢাকা: চৌধুরী পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৮।

আহমদ শরীফ, 'সাহিত্যে রূপপ্রতীক', *বিচিত চিন্তা*, ঢাকা: চৌধুরী পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৮।

ইফ্ফাত আরা দেওয়ান, 'নিজেকে জয় করবার সাধনা', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা*, ছায়ানট, ২০০৬।

ইসরাফিল শাহীন ও সুদীপ চক্রবর্তী, 'পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাট্যচর্চায় নারী', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।

এ. কে. এম. রিয়াজুল হাসান, 'শেরপুর', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

এম আর আখতার মুকুল, 'স্বাধীন বাংলা বেতারের ধ্বনি', সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১২।

এম. এ. মোহায়মেন, 'ভুলি নাই', সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭।

এম. আর. মাহবুব, 'ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম: জীবন ও কর্ম', এম. আর. মাহবুব (সম্পা), *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১১।

এম. এম. আলাউদ্দিন, 'চুয়াডাঙ্গা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

ওয়াহিদুল হক, 'কলম ছেড়ে গানে গানে', মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, সিডিএল, ঢাকা: ২০০৬।

ওয়াহিদুল হক, 'ছায়ানট: আরম্ভ কথা', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা*, ছায়ানট, ২০০৬।

ওয়াহিদুল হক, 'মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম', লোকবক্তৃতা মালা-৭, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

কবীর চৌধুরী, 'বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সংকট: কৃত্রিম সমস্যা', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা: ১৯৯৩।

কবীর চৌধুরী, 'সংস্কৃতি ধর্ম সুশিল সমাজ', *প্রবন্ধ সমগ্র*-৩, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬।

কল্যাণী ঘোষ, 'অস্ত্রের নাম সঙ্গীত', মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, সিডিএল, ঢাকা: ২০০৬।

কাজী তামান্না, 'বাংলা নাট্য আন্দোলনে থিয়েটার, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৯ মে ১৯৯৭।

কামরুল হুদা হেলাল, 'দিনাজপুর', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

কামাল লোহানী, 'ভাষা আন্দোলনের গান', ড. শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬।

কামাল লোহানী, 'আসুন আমরা পশুহত্যা করি', মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, সিডিএল, ঢাকা: ২০০৬।

কুন্তল বিশ্বাস, 'নেত্রকোনা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

ক্যাথরিন মাসুদ, 'মুক্তির গান: ২৫ বছর নির্মাণাধীন একটি ছবির নেপথ্য', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫।

গাজীউল হক, 'স্মৃতিচারণ', তসিকুল ইসলাম, *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

গোপাল বিশ্বাস, 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রেক্ষাপট চট্টগ্রাম', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

গোলাম মুরশিদ, 'বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, পৌষ, ১৩৮০।

গোলাম সাকলায়েন সাকী, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

চিরঞ্জীব শর্মা, 'সাংস্কৃতিক চর্চা, চট্টগ্রামে', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

জমির আহমদ, 'ফেনী', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

জাহানারা ইমাম, 'সংগ্রামী এক নারী সেলিনাকে ঘিরে', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: ১৯৯৬।

জি এম বাবর আলী, 'ভাষা আন্দোলনে বরিশালবাসীর ছিল উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভূমিকা', আমানুল্লাহ কবীর, ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১।

জিন্নাত গণি, 'আনোয়ারা বাহার সম্পর্কে', সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭।

জুলফিকার মতিন, 'বিকল্পহীন কাজ', সম্মেলন *স্মরণিকা*, উদীচী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ১৯৯৮।

তসিকুল ইসলাম. 'রাজশাহী', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

তাজুল মোহাম্মদ, 'সিলেট', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

তালেয়া রেহমান, 'নির্বাচন, জেল ও এক বালতি চা', সৈয়দ মঞ্জুর আলী (সম্পা.), *সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ২০১০।

দীননাথ সেন, 'পঞ্চাশের তরঙ্গ', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

নমিতা ঘোষ, 'আমি ও একাত্তর', জাহিদ হোসেন (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৫।

নাসরিন আহমাদ, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠ', জাহিদ হোসেন (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৫।

নীলিমা ইব্রাহিম, 'নিষ্ঠাবতী সাংবাদিক শহীদ সেলিনা পারভীন', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: ১৯৯৬।

নূরজাহান বেগম, 'নীলিমা ইব্রাহিম: বেগমকে করেছেন সমৃদ্ধ', রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩।

নূরজাহান বেগম, 'বাঙালি নারীর শতবর্ষের প্রান্তকথা', *অন্যদিন*, বৈশাখী সংখ্যা, ১৪১১।

নূরজাহান বেগম, 'মমতাজ বেগম: ত্যাগী ও সংগ্রামী নারী, এম. আর মাহবুব (সম্পা.), *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১।

নূরুল ইসলাম, 'রংপুরে ভাষা আন্দোলনের কিছু স্মৃতি কথা', *দৈনিক যুগের আলো* (রংপুর), একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৯৬।

পল্টু বাসার ও কল্যাণ ব্যানার্জী, 'সাতক্ষীরা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

প্রতিভা মুৎসুদ্দি, 'স্মৃতিতে কবি-জননী সাহসিকা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, ২০১১।

প্রদীপ কুমার রায়, 'মানিকগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, 'নড়াইল', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

প্রিয়াঙ্কা রশ্মি হাজরা, 'পাকিস্তান আমলে প্রথম দশকে নারী সমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা', নাসিম আখতার হোসাইন এবং পারভীন জলী (সম্পা.), *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারী*, ঢাকা: সংবেদ, ২০১৯।

ফয়েজউল্লাহ, 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫২ কুমিল্লা', *ভোরের পাখি*, কুমিল্লা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

ফিরোজ মান্না 'টাঙ্গাইল', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

বদরুদ্দীন উমর, 'ভাষা আন্দোলনের নেত্রী মমতাজ বেগম', এম. আর মাহবুব (সম্পা.), *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'নীলিমা ইব্রাহিম: জীবনকথা', রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩।

বুলবুল মহলানবীশ, 'স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব এবং স্মৃতি ৭১', জাহিদ হোসেন (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৫।

বেগজাদী মাহমুদা নাসির, 'আমি ও আমার সময়', নাজমা জেসমিন চৌধুরী ত্রয়োদশ স্মারক বক্তৃতা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০০২।

বেগম ফিরোজা, 'বরিশাল', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

বেগম মুশতারী শফী, 'মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় রণাঙ্গন-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র', সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১২।

বেগম মুশতারী শফী, 'স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্মকথা', মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, ঢাকা: সিডিএল, ২০০৬।

বেলাল চৌধুরী, 'জীবনের আশ্চর্য ফাল্গুন', *জনকণ্ঠ*, ঈদ সংখ্যা, ২০০২।

বেলাল মোহাম্মদ, 'কালুরঘাট থেকে মুজিবনগর', মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, সিডিএল, ঢাকা: ২০০৬।

বেলাল মোহাম্মদ, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম দিন', সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১২।

ভুবন রায় নিখিল, 'ভাষা আন্দোলনে নীলফামারী: জনতার সংগ্রাম', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১।

মকবুলা মনজুর, 'স্মৃতি থেকে নেয়া', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: ১৯৯৬।

মফিজুর রহমান লিমন, 'শহীদ বরকতের রক্তাক্ত শার্টের এক টুকরো কাপড় দেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া টগবগিয়ে উঠেছিল', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১।

মফিদুল হক, 'সাংস্কৃতিক জাগরণে মুক্তির পথ', *দৈনিক যুগান্তর* (সাহিত্য সাময়িকী), ৭ অক্টোবর, ২০০৫।

মযহারুল ইসলাম, 'পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা', *সাহিত্য পথে*, ঢাকা: গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৬০।

মহসিন শস্ত্রপাণি, 'কাগমারী সম্মেলন: পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্য', মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.), *কাগমারী সম্মেলনের স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: কাগমারী সম্মেলনে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি কমিটি, ২০১১।

মামুন সিদ্দিকী, 'সুফিয়া কামালের একটি দুষ্পাপ্য অভিভাষণ', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, ২০১১।

মালেকা বেগম, 'রাজনীতি: অন্দরমহল রাজপথ ও সংসদ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

মাহবুব হাসান, 'নোয়াখালী', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

মাহমুদ সেলিম ও অমিত রঞ্জন দে, 'উদীচী: বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার', কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.), *উদীচী বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তারাধিকার*, ঢাকা: বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ২০০৯।

মাহমুদ হাসান, 'সংস্কৃতি সংসদ: একটি ঐতিহ্য একটি আন্দোলন', *দৈনিক সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭০।

মুনতাসীর মামুন, 'মুক্তির যে গান', *দৈনিক জনকণ্ঠ* (প্রাক বিজয় দিবস সংখ্যা), ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

মৃদুল রায়, 'ময়মনসিংহ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

মেঘনা গুহঠাকুরতা ও মাহমুদা ইসলাম, 'সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী' আধুনিক যুগ, এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

মোঃ এমরান জাহান, 'বাঙালি মুসলমান নারীদের জাগরণে সওগাত পত্রিকার ভূমিকা', নাসিম আখতার হোসাইন ও পারভীন জলী (সম্পা.), *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নারী*, ঢাকা: সংবেদ, ২০১৯।

মোতাহার আখন্দ, 'বাংলাদেশে নারী আন্দোলন: সহমর্মিতা থেকে স্বাতন্ত্র্য', নাসিম আখতার হোসাইন এবং পারভীন জলী (সম্পা.), *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নারী*, ঢাকা: সংবেদ, ২০১৯।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, 'ভাষা ও সংস্কৃতি', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২।

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম: রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট' *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৪০২।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, 'সিরাজগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

রওশন আরা ফিরোজ, অধ্যাপক সালমা আখতার, ফরিদা প্রধান, 'রোকেয়া হল: অতীত ও বর্তমান', *আনন্দধারা* (স্মরণিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশেন, ২০১২।

রওশন আরা বাচ্চু, 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬।

রংগলাল সেন, 'ভাষা আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬।

রণেশ দাশগুপ্ত, 'সাহিত্যের বৈপ্লবিক গতিধারা', *শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে*, ঢাকা: প্রকাশ ভবন, ১৯৬৬।

রথীন্দ্রনাথ রায়, 'একজন শব্দ সৈনিক এর কথা', মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর*, ঢাকা: সিডিএল, ২০০৬।

রফিকুল আলম খান, 'সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের সময় মাইক না থাকায় টিনের চোঙ্গা ব্যবহার করা হয়েছিল', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১।

রফিকুল ইসলাম, 'অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম: এক অনন্য সাধারণ অকুতোভয় বিদুষী', রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩।

রফিকুল ইসলাম, 'পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন', হোসনে আরা শাহেদ (সম্পা.), *স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

রফিকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৭৬।

রফিকুল ইসলাম, 'সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধ', *দৈনিক ইত্তেফাক* (স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা), ২৬ মার্চ ১৯৯৭।

রুমন রেজা, 'নারায়ণগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

রাবেয়া খাতুন তালুকদার, 'আনোয়ারা বাহার চৌধুরী', সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭।

রাহমান চৌধুরী, 'বাংলাদেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের নাট্যচর্চা', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২।

লায়লা সামাদ, 'হাসান হাফিজুর রহমান', খালেদ খালেদুর রহমান (সম্পা.), *হাসান হাফিজুর রহমান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: জুন, ১৯৮৩।

শওকত ওসমান, 'স্মৃতিখণ্ড: চট্টগ্রাম', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

শংকর দাশ গুপ্ত, 'পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সাংস্কৃতিক চর্চা: প্রসঙ্গ নৃত্য', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

শফিক জামান, 'জামালপুর', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

শরিফুজ্জামান পিন্টু, 'বাগেরহাট', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

শামসুর রাহমান, 'সেলিনা পারভীন স্মরণে', সুফিয়া কামাল (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: ১৯৯৬।

শাহ আরিফ নিশির, 'কুষ্টিয়া', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

শাহাবুল শাহীন তোতা, 'গাইবান্ধা', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

শুভ রহমান, 'শহীদ মিনারের প্রথম নাটক', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, অমর একুশে বিশেষ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

শেখ মুহাঃ শাখাওয়াৎ রেজা সেলিম, 'ঝিনাইদহ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

শেলী শাহাবউদ্দিন, 'শহীদ সেলিনা পারভীন ও শিলালিপি', *ভোরের কাগজ*, ২৯ মার্চ ২০১৯।

শ্যামল চন্দ্র সরকার, 'ঝালকাঠি', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

সঞ্চারী রায় মুখার্জী, 'নারীবাদী আন্দোলন', রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, কলকাতা, উর্বী প্রকাশ, ২০০৮।

সন্‌জীদা খাতুন 'ছায়ানট', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা*, ছায়ানট, ২০০৬।

সন্‌জীদা খাতুন 'ছায়ানটের পহেলা বৈশাখ', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *আলোকের ঝরণাতলায়*, ঢাকা: ছায়ানট, ২০১৭।

সন্‌জীদা খাতুন, 'বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম আর সংস্কৃতিসাধনা', ঢাকা: *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ডিসেম্বর, ২০০৬।

সাইফুল হক মোল্লা দুলু, 'কিশোরগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

সাঈদ-উর রহমান, 'আইউব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৭৪।

সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, 'জনবিরল পঞ্চগড়েও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১।

সাদিয়া আফরিন মল্লিক, 'আলোয় ভুবন ভরা', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা*, ছায়ানট, ২০০৬।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের সংস্কৃতি', *একুশের প্রবন্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯০।

সিরাজুল ইসলাম, 'পঞ্চাশ দশকের শুরু: প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন', মাহবুব হাসান (সম্পা.), *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, ১৯৯১।

সালমা খান, 'অর্থনীতিতে নারী: হস্তশিল্প থেকে করপোরেট ব্যবস্থাপনা', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।

সুজন হাজারী, 'জয়পুরহাট', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

সুফিয়া আহমেদ, 'একুশের স্মৃতিচারণ', শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য (সম্পা.), *একুশের স্মারকগ্রন্থ' সাতাশি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।

সুমি খান, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম', *সাপ্তাহিক ২০০০*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১।

সুশান্ত ভৌমিক, 'ভাষা আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না রংপুর', আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১।

সেলিনা হোসেন, 'আমাদের সংস্কৃতিতে অমর একুশে একটি অবিস্মরণীয় বাঁক বদল', শেখ মেহেদী হাসান (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬।

সোনিয়া নিশাত আমিন, 'নারী ও সমাজ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৭, পৃ. ৬০৯।

সৈয়দ ইকবাল, 'ফরিদা বারী বীথি; রবীন্দ্রময় যার সত্তা', মুক্তমঞ্চ, *সমকাল*, নভেম্বর ২৭, ২০১২।

সৈয়দ জামিল আহম্মেদ, 'নাটক ও নাট্যকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৪৭* (৩য় খণ্ড), ঢাকা: ১৯৯৩।

হাবিবা খাতুন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও আমাদের পরিবার', এম আর মাহবুব, *নরসিংদীতে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫।

হালিমা খাতুন, 'মণিময় সেই দিনগুলোর কথা', *আনন্দধারা* (স্মরণিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ২০১২।

হাজেরা খাতুন, 'সুনামগঞ্জ', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

হাসান আজিজুল হক, 'বায়ান্নের একুশ-ঢাকার বাইরে ', *একুশের স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, 'ড্রামা সার্কেল: প্রসঙ্গকথা এবং একক বজলুল করিম', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১৭।

২.৫ ইংরেজি গ্রন্থ

A F. Salahuddin Ahmed, Bazlul M. Chowdhuary (Ed.), *Bangladesh National Culture and Heritage*, Dhaka: Independent University Bangladesh, 2004.

A F. Salahuddin Ahmed, *Bengali Nationalism and Emergence of Bangladesh*, Dhaka: UPL, 1994.

A. K. Choudhury, *The Independence of Bangladesh A Historical Process*, Dhaka: Jatiyo Grantha kendra, 1984.

A. M. A. Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation*, Dacca: The University Press Limited, 1978.

A. M. A. Muhith, *State Language Movement in East Bengal 1947-1956,* Dhaka: The University Press Limited, 2008.

Anup Taneja, *Gandhi, Women and the National Movement 1920-47*, Delhi: Har-Anand Publications, 2005.

Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memories of an American Diplomat*, Dhaka: UPL, 2002.

Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh: Explorations into Dynamics of a Hidden Nation*, Dhaka: UPL, 1996.

Alamgir Kabir, *This was Radio Bangladesh*, Dhaka: Bangla Academy, 1984.

Anthony Mascarenhas, *Bangladesh: A Legacy of Blood*, United Kingdom: Hodder & Stoughton, 1986.

Anwar Dil, Afia Dil, *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh,* Dhaka: Adorn Publication, 2011.

Anisuzzaman, Syed Monjurul Islam (ed.), *Bangladesh: Six Decades (1947-2007),* Dhaka: Nymphea Publication, 2010.

Anirudh Gupta, *Forms of Struggle: Bangladesh-A-struggle for Nationhood,* Delhi: Vikas, 1971.

Badruddin Umar, *Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh,* Dacca: Mawla Brothers, 1973.

Dr. T. Hossain, *Involvement in Bangladesh's Struggle for Freddom,* Dhaka: Center for Humanist Activities, 2001.

Deidre Beddoe, *Discovering Women's History*, London: Pandora Press, 1983.

E. B. Tylor, *Primitive Culture*, volume I, London: John Murray, Albemarle Street, 1879.

Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy*, NewYork: Oxford University Press, 1986.

Gerealdine Forbes, *Woman in Modern India*, New York: Cambridge University Press, 1998.

H. C. Triandis, *Culture and Social Behavior*, New York: McGrow Hill, 1994.

Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan, The Rise and Realization of Bengali Nationalism*, Dhaka: UPL, 1994.

Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia* (Revised and Expanded Edition), New Delhi: Rowat Publications, 2008.

Joan Kelly, *Women, History and Theory: The Essays of Joan Kelly*, Chicago: University of Chicago Press, 1986.

Joan Wallach Scott, *Feminism and History,* Oxford University Press, 1996.

Jyoti Sen Gupta, *History of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973*, Calcutta: Naya Prokash, 1974.

K. Avruch, *Culture and Conflict Resolution*, Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1998.

Kamruddin Ahmed, *A Social History of East Pakistan*, Dacca: Crescent Book Store, 1967.

M. A. Barnik, *A Short History of the Language Movement*, Dhaka: Bhashandolan Museum, 2009.

Meredith Borthwick, *The Changing Role of Woman in Bengal: 1849-1905*, Princeton: Princeton University Press, 1984.

Nurul Islam, *Making of A Nation, Bangladesh, An Economists Tale*, Dhaka, UPL: 2003.

Nehal Karim, *The Emergence of Nationalism in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1992.

R. M. MacIver, *Society: Its Structure and Changes*, New York: Ray Long and Richard Smith, 1931.

Rosalind Miles, *The Women's History of the World*, London: Paladin Grafton Books, 1989.

Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*, Boulder, Westview Press, 1989.

Raunaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, New York: Columbia University Press, 1972.

Rahmatullah, *A Struggle for Nationhood*, Delhi: Vikas, 1971.

Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, New Delhi: People's Pub. House, 1973.

Srinath Raghavan, *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*, England: Harvard University Press, 2013.

Saadullah Khan (Brig), *East Pakistan to Bangladesh*, Lahore: Lahore Law Times Publication, 1975.

Safar Ali Akanda, *Language Movement and the Making of Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited (UPL), 2013.

Shireen Hasan Osmany, *Evolution of Bangladesh*, Dhaka: A H Development Publication House, 2014.

Shaikh Maqsood Ali, *From East Bengal to Bangladesh: Dynamics and Perspectives*, Dhaka: UPL, 2009.

Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh 1704-1971*, Vol. 1-3, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2007.

Syed Manzoorul Islam, *Essays on Ekushey the Language Movement 1952*, Dhaka: Bangla Academy, 2016.

Talukder Moniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath,* Dhaka: Bangladesh Books International Ltd, 1980.

Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, New Jersey: Princeton University Press, 1970.

W. D. Wallis, *Culture and Progress,* New York: Whittlesey House, McGrow-Hill, 1930.

Willem Van Schendel, *A History of Bangladesh*, New Delhi: Cambridge University Press, 2009.

Yatindra Bhatnagar, *Bangladesh Birth of a Nation,* New Delhi: Indian School Supply Depot, 1971.

২.৬ ইংরেজি প্রবন্ধ

Joan Kelly, 'The Social Relation of the Sexes: Metheodological Implications of Women's History', *Women, History and Theory, The Essays of Joan Kelly,* Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986.

Khan Sarwar Murshid, 'Twentyfirst February', Dr. SK Mehedi Hasan (ed.), *Vasha Andoloner Purbapor,* Dhaka: Annesha Prokashon, 2016.

M. S. A Rao, 'Conceptual Problem in the Study of Social Movements', M. S. A Rao (ed.), *Social Movements in India,* vol. 1, New Delhi: 1978.

Partha Chatterjee, 'The Nationalist Resolution of the Women's Question', Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (ed.), *Recasting Women: Essays in Indian Colonial History*, New Brunswick: Rutgers University Press, 1990.

Rudolf Heberle, 'Types and Functions of Social Movements', IESS, vol. xiii & xiv.

Sirajul Islam Choudhury, 'The Language Movement: Its Political and Cultural Significance', Dr. SK Mehedi Hasan (ed.), *Vasha Andoloner Purbapor*, Dhaka: Annesha Prokashon, 2016.

Zahrat Ara Power Clare, 'My Reminscences', Syed Manjur Elahi (ed), *Sourabhay Gourabay Dhaka Biswabiddalaya*, Dhaka: Dhaka University Alumni Assosiation, 2010.